একতেশ্বর

সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির : বহুলাড়া

দল-মাদল কামান : বিষ্ণুপুর

ধর্মরাজের মন্দির ঃ বৈতাল

শ্যামরায়ের মন্দির : বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়া পরিক্রমা

বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট। লিঃ
২ রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯
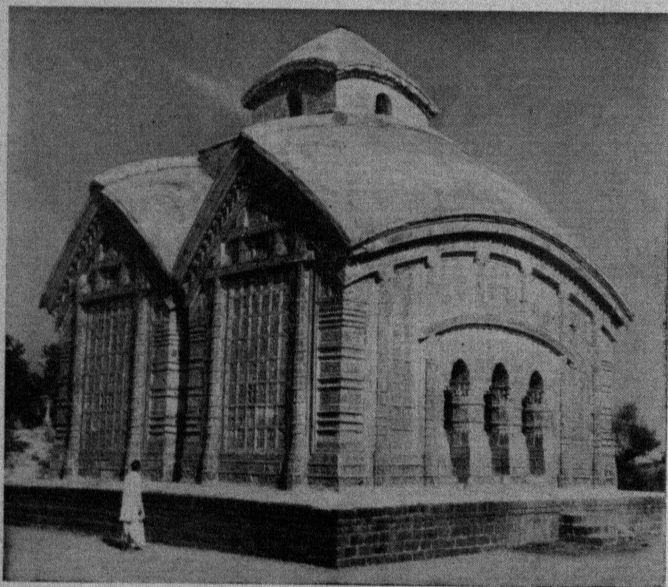
জোড়বাংলা মন্দির : বিষ্ণুপুর

পাঁচমুড়া-মৃৎশিল্প

বাঁকুড়া পরিক্রমা

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"
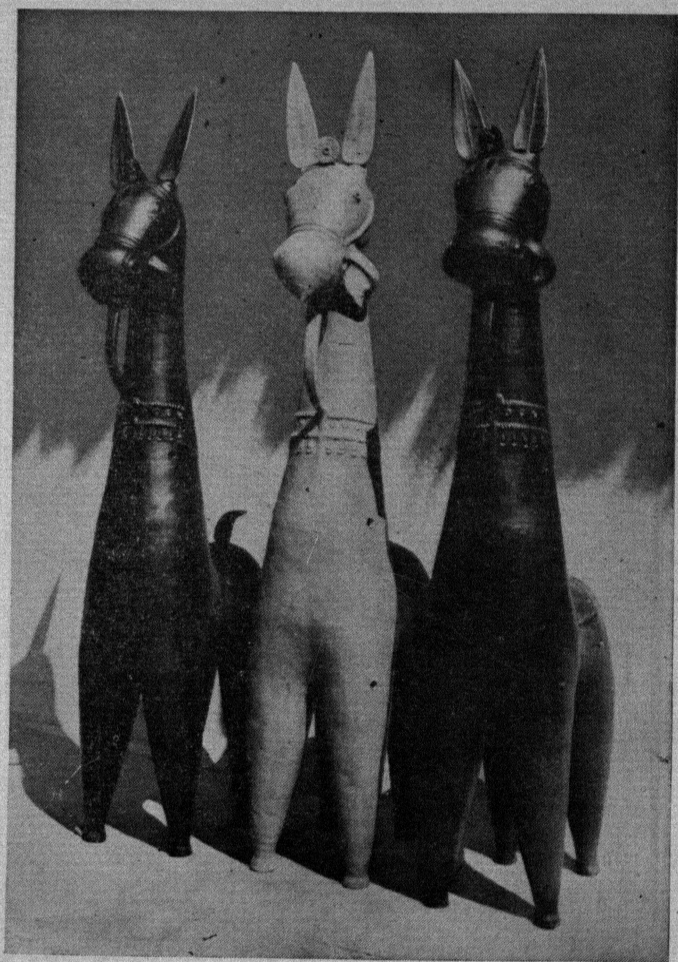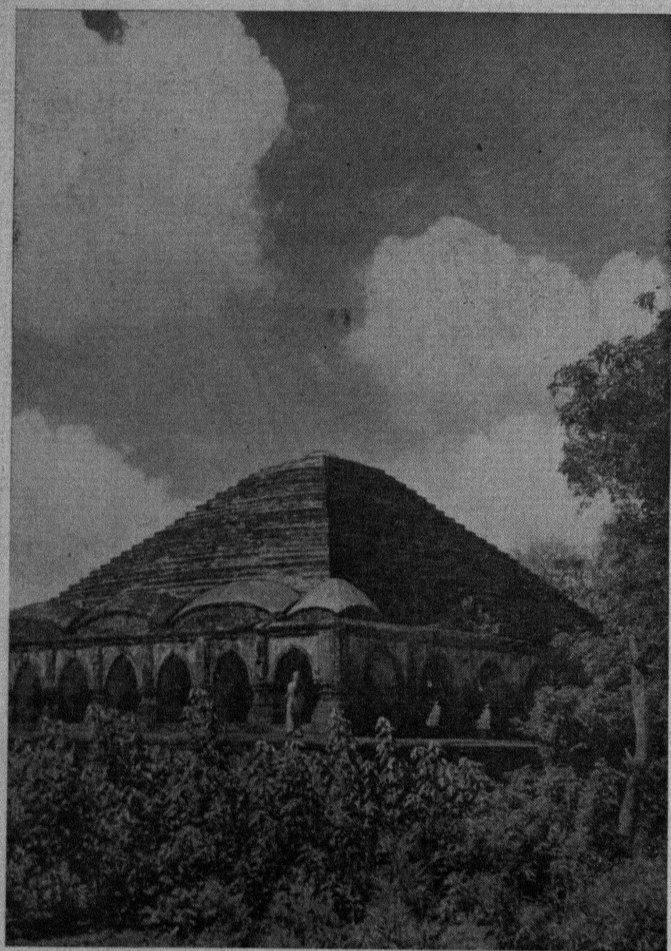
রাসমঞ্চ : বিষ্ণুপুর

নিবেদন

বাঁকুড়ার সহিত আমার প্রথম পরিচয় বহুদিন পূর্বে, ইং ১৯২৯ সালে, কর্ম-জীবনের প্রারম্ভে। নিয়োগ-পত্রে যে বিশেষ উৎসাহ বোধ করি নাই ইহার পিছনে ছিল গ্রাণ্ট সাহেবের—কোম্পানির আমলের সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট—সেই উক্তি "অসভ্য চোয়াড়দের দেশ, কোম্পানির শাসন কায়েম হইবার পূর্বে যাহা ছিল দস্যু-তস্করের বাসভূমি।" যে বিরূপ মনোভাব লইয়া বাঁকুড়ায় আসি তাহা অবশ্য ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হইয়া পড়ে কিন্তু ইহার সহিত আত্ম-প্রকাশ করে বিচিত্র এক অনুভূতি—অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পট-ভূমিকায় চিরস্থায়ী দারিদ্র্য ও গ্লানিদায়ক ব্যাধির একত্র সমাবেশ। তারপর কর্মজীবনের সায়াহ্নে বাঁকুড়ার সহিত সুদীর্ঘ নিবিড় পরিচয়ের সৌভাগ্য যখন হয়, মনে হইল —এই বাহ্য, বাঁকুড়াকে পূর্বে চিনিতে পারি নাই। দারিদ্র্য-দৈন্যের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইল এক মহিমময় রূপশ্রী—দূর পঞ্চকোট শৈলচূড়ার ন্যায়ই উন্নত, দীপ্ত, গর্বশির। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-মহিমায় মণ্ডিত এই রূপ আমাকে আকৃষ্ট করিল, মুগ্ধ করিল। ভাব ও চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইলাম, বিস্মৃত হইলাম কবির সতর্ক বাণী—

"অতীতের স্মৃতি, তারই স্বপ্ন নিতি
গভীর ঘুমের আয়োজন।"

বাঁকুড়া সম্বন্ধে কিছু লিখিবার প্রথম অনুপ্রেরণা পাই স্বর্গতঃ সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়ের নিকট হইতে। তারপর বহু শুভানুধ্যায়ীর উৎসাহ লাভ করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হই; তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঁকুড়ার সুসন্তান দেশপ্রেমিক স্বর্গতঃ রামনলিনী চক্রবর্তীকে। "বাঁকুড়ার মন্দির" লেখক বন্ধুবর শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে মাত্র উৎসাহই দেন নাই; গ্রন্থে সন্নিবেশিত মন্দিরাদির চিত্র তাঁহার শুভেচ্ছারও প্রতীক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহে ও জিলার অভ্যন্তর পরিভ্রমণে আমার প্রধান সহায়ক ছিলেন স্নেহভাজন শ্রীত্রিবেদিকান্ত দাশগুপ্ত। কলিকাতা

বুক সিণ্ডিকেটের কর্ণধার সুহৃৎবর শ্রীজ্যোতির্ময় গুহ মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে চিন্তাপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

যে বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ রচিত, তাহার পরিধি বহু-বিস্তৃত অথচ মৎ-সদৃশ লেখকের শক্তি সীমিত। "কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বিঃ" বাক্যে মহাকবি যে গর্ব-মিশ্রিত আশা পোষণ করিয়াছেন তাহাতে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা বা অধিকার আমার নাই। আবার রত্নখচিত মাল্যে মাতৃভাষার "কম" কলেবর অলঙ্কৃত করিতে পারি এরূপ দুঃসাহসও আমি করি না। তবে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বাঁকুড়াবাসী আমার এই রচনাকে যদি নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, যদি তাঁহাদের অন্তরের কোণে একটু স্থান দেন, তবেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। কবির ভাষায়

"মক্ষিকাও গলেনাকো পড়িলে অমৃত হ্রদে।"

"কত কী যে আসে কত কী যে যায়
বাহিয়া চেতনা বাহিনী !
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত—
ছিন্নসূত্র বাহি শতশত
তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !"

দ্বিতীয় পর্ব

ইতিহাসের পাতায় বাঁকুড়া

"বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণি-পূর্ণ খনি !

... ...

কোন পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে
দোলাইব মাতৃ-ভাষা-কম কলেবরে—"

—নবীন সেন

ভূমিকা

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশে বর্তমান বাঁকুড়া জিলার যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তা সম্যক বিশ্লেষণ ক'রে দেখা হ'য়েছে, তা' বলা যায় না। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে সে সম্পর্কে কিছু কিছু যা' আলোচনা হ'য়েছে, তার ভিতর থেকে তার সামগ্রিক চিত্রটি সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হ'য়ে 'বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়র' নামক যে তথ্যবহুল গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'য়েছে, তাও ইংরেজি ভাষায় রচিত ব'লে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের এমন বিষয়ও আছে যা' যথাযথভাবে ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করা যেতে পারে না। কেবলমাত্র বাংলাভাষার মাধ্যমেই তার যথার্থ রূপটি প্রকাশ পায়। সেইজন্য শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সেন মহাশয় রচিত 'বাঁকুড়া পরিক্রমা' গ্রন্থটিকে সকল শ্রেণীর পাঠকই অভিনন্দন সহকারে গ্রহণ করবেন। তিনি সরকারী কার্য উপলক্ষে বাঁকুড়া জিলার সর্বত্র ব্যাপক-ভাবে ভ্রমণ করেছেন; কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থে কেবলমাত্র তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করেননি; বরং সুগভীর অধ্যয়নের ভিত্তিতে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে সুদৃঢ় ক'রে নিয়ে তারই উপলব্ধি এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। কারণ, বাঁকুড়া জিলার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন, এত প্রাচীন যে তখনও বাংলাদেশের ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাতও হয় নি; সুতরাং কেবলমাত্র বাইরে থেকে কোন বিষয় চোখে দেখে তার সম্পর্কে কিছুই জান্‌বার উপায় নেই। সেইজন্য সেই অঞ্চলের মনুষ্য-বসতির ইতিহাস জান্‌বার জন্য সুগভীর অধ্যয়নের আবশ্যক। কিন্তু ইতিহাসের তা' এক অলিখিত অধ্যায়, তার প্রামাণিক তথ্য পাওয়া কঠিন; কেবলমাত্র গবেষণার ভিতর দিয়ে তা' উদ্ধার করা সম্ভব। বর্তমান গ্রন্থকার অনেক ক্ষেত্রেই সেই গবেষণা-সুলভ দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে সেই তথ্য উদ্ধার করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাঁকুড়ার ইতিহাস যে কেবলমাত্র প্রাচীন, তাই নয়—তার মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই। কারণ, বাংলার অন্যত্র আদিম মানব-গোষ্ঠী প্রায় সর্বত্রই কোন-না-কোন বৃহত্তর ধর্মকে আশ্রয় ক'রে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যকে

বিসর্জন দিয়েছে। অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব কিংবা নাথ ধর্মকে অবলম্বন ক'রে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের জনসমাজ নিজের আদিম সম্প্রদায়গত পরিচয়কে বিস্মৃত হ'য়েছে। কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় তা' হয় নি। বাঁকুড়া জেলায়ও হিন্দু, মুসলমান কিংবা বৈষ্ণবধর্ম বিস্তারলাভ ক'রেছে সত্য, কিন্তু সেখানে তা' দ্বারা আদিম ধর্মসংস্কারগুলো বাইরের দিক থেকে কিছু কিছু প্রভাবিত হ'য়েছে মাত্র, কিন্তু বহিরাগত এই সকল অভিজাত ধর্মের যূপকাষ্ঠে সম্পূর্ণভাবে বলিপ্রদত্ত হয়নি। হিন্দু, মুসলমান কিংবা বৈষ্ণবধর্মের বহিরাগত সংস্কার সেখানকার সমাজ-মানসে শিকড় গাড়তে পারে নি, কেবলমাত্র বহিরাঙ্গে তার প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। সুতরাং বাংলার আদিম মানব-গোষ্ঠীর ধর্ম এবং সমাজ জীবনের রূপ, যতই অস্পষ্ট হোক না কেন, এখনও সে অঞ্চলে তা' প্রত্যক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের অন্য কোন অঞ্চলে সে সুযোগ পাওয়া যায় না।

বাগ্‌দি, বাউরী এবং ডোম এই তিনটি জাতিই বর্তমান বাঁকুড়া জিলার জন-সমাজের মৌলিক (basic) ভিত্তি রচনা ক'রেছে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজের নিকট তারা আজ যতই অধঃপতিত বিবেচিত হোক না কেন, তারাই এইদেশে একদিন সকল সামাজিক মর্যাদায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা' বুঝতে পারা যায়। কোন জাতিরই বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে তা'র বহুপূর্ববর্তী অবস্থা কল্পনা করা যায় না। নানা পারিপার্শ্বিক কারণে এক একটি সম্প্রদায় সমাজের নিকট অস্পৃশ্য হ'য়ে গিয়ে অধঃপতিত হ'তে পারে। তার কারণ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব রকমেরই হ'তে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যখনই যে জাতির সামাজিক একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের আবশ্যকতা দূর হ'য়ে যায়, তখনই সেই সম্প্রদায়টি সমাজে অস্পৃশ্য ব'লে গণ্য হয়; তা থেকেই তার অধঃপতনেরও সূত্রপাত হয়। বাঁকুড়া জিলার ডোম জাতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচীনযুগের বৌদ্ধগান ও দোঁহার মধ্যে দেখা যায় ডোমজাতির নরনারী নানা জটিল অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছে; তারপর মধ্যযুগের সাহিত্যেও দেখা যায়, বাঁকুড়ার বীর ডোমজাতির শৌর্যবীর্যের কীর্তিগানে বাংলার লোক-সাহিত্য মুখর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পরই তাদের যে সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্য ছিল অর্থাৎ সামন্তরাজগণের পদাতিক সৈন্যরূপে তারা যে দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন ক'রত, তা' দূর হয়ে গেল। সমাজের মধ্যে আর নূতন কোন দায়িত্ব পালনের পথ তাদের সামনে খোলা হ'লো না। তখন থেকেই তারা অস্পৃশ্য হয়ে পড়ল,

ক্রমে ইংরেজ সরকার তা'দের অপরাধপ্রবণ জাতি (criminal tribe) ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলেন; তখন থেকেই তারা বৃত্তিহীন হ'লো, তারপর অর্থনৈতিক দুর্গতির সম্মুখীন হ'য়ে ক্রমাগত এক দুর্ভাগ্য থেকে আর এক দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগ্‌ল। তা'দের সামাজিক সংহতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। এমন কি, তা'দের পূজিত ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের পূজা মন্দিরে যে স্থান পেয়েছে, সে কথাও কেউ তলিয়ে দেখেন না।

বাগ্‌দি এবং বাউরী সম্পর্কেও সেই একই কথা। এ'দের উত্থান এবং পতন উভয়ই বাঁকুড়া জিলার রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের উত্থান পতনের সঙ্গে জড়িত। কবে থেকে কিভাবে যে তাদের সম্পর্ক এ'দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, এবং কিভাবেই যে তা' কখন তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, তা' আজ অনুমান ক'রেও বলা কঠিন।

মনে রাখ্‌তে হবে যে বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি বাঁকুড়া জিলার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ হ'য়েছিল; তা' ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত। খৃষ্টীয় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীতে সিদ্ধ কিংবা সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা ব'লে চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর ভক্ত চন্দ্রবর্মা নামক একজন রাজা এই লিপি খোদিত করেছিলেন। এই চন্দ্রবর্মার নাম দিল্লীর কুতবমিনারের পার্শ্ববর্তী মেরৌলী লৌহস্তম্ভে এবং এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত আছে। এই চন্দ্রবর্মা পশ্চিম রাজপুতনায় খৃষ্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে যে এক বর্মন রাজবংশ রাজত্ব করত, তারই একজন রাজা ব'লে অনুমান করা হ'য়েছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে খোদিত শিলালিপিতে যে চন্দ্রবর্মাকে পুষ্কর্ণার রাজা ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে, তা' পশ্চিম যোধপুরের পোখরণ নামক স্থানটিরই পূর্ববর্তী নাম ব'লে মনে করা হয়। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাঁকুড়া জিলাতেও পোখন্না নামে এখনও একটি স্থান আছে। স্থানটি বাঁকুড়া সদর মহকুমার অন্তর্গত। বাংলাদেশের ছড়ায় এই পোখন্না নামটির উল্লেখ দেখা যায়, যেমন,

পুষালু গো রাই।
আমরা ছোপড়ি পিঠ্যা খাই॥
ছোপড়ি লোপড়ি, গাজ সিনাতে যাই।

গাঙের জল রাঁধি-বাড়ি, ঝারির জল খাই ॥
চারমাস বরষা আমরা পোখন্না যাই ॥

ছড়াটি সাঁওতাল পরগণা জিলা থেকে সংগৃহীত। সুতরাং শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে খোদিত লিপিতে চন্দ্রবর্মাকে যে পুষ্কর্ণার রাজা ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে, তা' এই পোখন্না ব্যতীত আর কিছুই নয়, রাজপুতনার অন্তর্গত পশ্চিম যোধপুরের পোখরণ নামক স্থানটির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদি তাই হয়, অর্থাৎ চন্দ্রবর্মা যদি বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান পোখন্নারই রাজা হ'য়ে থাকেন, তবে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত শুশুনিয়া পর্বতগাত্রের এই লিপি দেখে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতেই বাঁকুড়ার পোখন্না অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল এবং তার রাজ্যে সংস্কৃত চর্চা হ'তো; সাধারণ লোকও সংস্কৃত জান্‌ত, তা' নইলে সংস্কৃতে এই অঞ্চলে লিপি খোদিত করবার কোন সার্থকতা ছিল না। তারপর কালচক্রের পরিবর্তনে সেই রাজ্য বিধ্বস্ত হ'য়েছে, তার অধিবাসীরা হয়ত কোন অরণ্যচারী আদিবাসী জাতির আক্রমণের সাম্‌নে তা'দের সাংস্কৃতিক গৌরব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছে। তথাপি তাদের রক্তধারা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে।

বাঁকুড়া জিলার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে খোদিত লিপিতেই বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলার আর্য-সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাসে এই বিষয়টির বিশেষ একটি গুরুত্ব আছে। তার সুগভীর তাৎপর্য অনেক সময়ই আমরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌বার অবকাশ পাইনে।

বাঁকুড়া জিলার যে কয়টি নদনদী এখন মরণোন্মুখ, তাদের পূর্বরূপ যে কি ছিল, তা' আজ আমরা অনুমানও ক'রতে পারব না। এই সকল নদনদীর দুই তীরে যে মন্দিরগুলো আজ জীর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হ'য়ে আছে, সেগুলো একদিন জন সমাগমে মুখরিত হ'য়েছিল, একথা অনুমান করা কঠিন নয়। আজ মধ্যপ্রদেশের ভূপালের নিকটবর্তী সাঁচী স্তূপ, কিংবা বিহারের বুদ্ধগয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলে একথা কেউ অনুমান করতে পারবেন না যে একদিন এই সকল স্থান জনাকীর্ণ ছিল। বাঁকুড়া জিলার পরিত্যক্ত মন্দিরগুলোরও সেই অবস্থাই হ'য়েছে। একদিন যখন এই সকল নদনদীর পথে নৌকারোহণে দেশ দেশান্তরে যাতায়াত চ'লত, তখন তাদের তীরে তীরে এই সকল মন্দির গড়ে

উঠেছিল। নতুবা জলহীন শুষ্ক বালুকারাশির কিনারে মন্দির নির্মাণের কোন সার্থকতা ছিল না। এই সকল মন্দিরের উপর দিয়ে স্তরে স্তরে সংস্কৃতির বিচিত্র তরঙ্গ প্রবাহিত হ'য়ে গিয়েছে—জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু তা' ছাড়াও কত অজানিত ধর্ম-সম্প্রদায় তাদের স্বাক্ষর রেখে দিয়ে গেছে, তার তথ্য আজ আমরা গবেষণা করেও উদ্ধার করতে পারব না। বাঁকুড়া জিলার সেই অলিখিত ইতিহাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-সঙ্গত পদ্ধতিতে কোন দিনই লিখিত হ'তে পারবে না। কেবল মাত্র তার মানুষের আচার আচরণ, সাহিত্য এবং শিল্পরূপ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে মাত্র। বর্তমান গ্রন্থকার তারই পরিচয় তাঁর গ্রন্থে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। তার কারণ, মানুষকে তিনি খুব নিকটে গিয়ে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেবলমাত্র পাঠ্যগ্রন্থ থেকেই তা'দের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন নি।

বাঁকুড়া জিলার ধর্মাচারের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজা একটি বিস্ময়কর বিষয়। সমগ্র বাংলাদেশে তার অনুরূপ নিদর্শন আর পাওয়া যায় না। তার প্রধান বিশেষত্ব এই যে একটি আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাস বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অভিজাত ধর্মের প্রভাবকে স্বীকার করেও আধুনিকতম কাল পর্যন্ত নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে অগ্রসর হয়ে এসেছে। সুবৃহৎ হিন্দু-সমাজ নিজের বলিষ্ঠ আদর্শের সর্বময় কর্তৃত্ব তার উপর স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে; বরং তার পরিবর্তে তার আদর্শের কাছেই নতি স্বীকার করেছে। হিন্দুধর্ম দেশজ ধর্মের সঙ্গে সর্বত্রই সামঞ্জস্য বিধান ক'রে নিয়েছে সত্য, কিন্তু এখানে সামঞ্জস্যের বিষয়ই শুধু নয়, বরং তারও বেশী কিছু সম্ভব হয়েছে; অর্থাৎ সমন্বয়ের মধ্য দিয়েও আদিম ধর্মাচার নিজের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থকার এই বিষয়টির প্রতি তাঁর পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি যথার্থভাবেই আকর্ষণ করেছেন।

আদিবাসীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ বাঁকুড়া জিলার আর একটি বিস্ময়কর বিষয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ আদিবাসী মাল বা মল্লবংশোদ্ভূত; কিন্তু তাঁরা যখন আকস্মিকভাবে মধ্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন তখন তার প্রভাব কেবলমাত্র তাঁরা রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না, সমগ্র আদিবাসী প্রজাদের মধ্যেও তা' বিস্তৃত করেছিলেন। তার এক অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কারণ, আদিবাসীর জীবনাচারের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের জীবনাদর্শের কোন সম্পর্ক ত নাইই, বরং সুস্পষ্ট

বিরোধ আছে। এই বিরোধের মধ্যদিয়ে ক্রমে কি ভাবে যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হ'লো, তা' মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক অভাবনীয় বিষয়। পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী অরণ্য এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী আদিবাসীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমে হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে কি ভাবে বিস্তার লাভ ক'রে তা' ক্রমে বৃহত্তর বাঙ্গালীর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলো, বাঁকুড়া জিলার প্রধানতঃ কাঁসাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান গ্রন্থকার বাঁকুড়ায় "বৈষ্ণব অনুশাসনের পুর্বে" এবং "বৈষ্ণবযুগ এবং পরবর্তীকাল" এই দুটি অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বৈষ্ণব আচার পালন করবার বিষয়ে কোন কোন মল্লরাজ একটু বাড়াবাড়ি করেছেন বলে যে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। মল্লরাজের আদিবাসী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণ স্বভাবতঃই বৈষ্ণব জীবনাদর্শে বিমুখ ছিল। কারণ, হিংসাই তাদের আচার, তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকটি তারা কিছুতেই পরিপুর্ণভাবে জীবনে স্বীকার করতে পারে নি। সেইজন্য মল্লরাজগণ ধর্মের আচারগুলোকে কঠিনতর ভাবে নিজেরা পালন করে তাঁদের প্রজাদের সামনে একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং সে কার্যে তাঁরা সফল হয়েছিলেন। মহারাজ অশোক যেমন কেবলমাত্র শিলালিপির মাধ্যমে অহিংসা প্রচার না করে নিজের পরিবারের মধ্যেই অহিংসার আচার গ্রহণ করেছিলেন, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণও তাঁদের প্রজাদের সামনে আদর্শ স্থাপন করবার জন্য নিজেরাও জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের আচারগুলোকে কঠিনতর ভাবে পালন করতেন। এমন কি, প্রজাদের উপরও তা পালন করবার জন্য কঠিন আদেশ দিয়েছিলেন। "গোপাল সিংহের বেগার" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থকার তার বিষয় উল্লেখ করেছেন।

বাঁকুড়া জিলায় লোক-সংস্কৃতি এখনও যে ভাবে জীবন্ত আছে, বাংলাদেশের একমাত্র পুরুলিয়া জিলা ব্যতীত আর কোন অঞ্চলেই তা নেই। গ্রন্থকার যথাযথ গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়েরও আলোচনা করেছেন।

বাঁকুড়া জিলা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের (cultural fusion) এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার মধ্যে কোন সংস্কৃতিই একমুখী অভিযান করে নি, অর্থাৎ কোন প্রবলতর সংস্কৃতি ক্ষুদ্রতর সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে পারে নি ; বরং উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করে কি ভাবে উভয়ের বৈশিষ্ট্য দ্বারাই যে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক রূপ প্রকাশ করা সম্ভব, তারই নিদর্শন স্থাপন করেছে।

বাঁকুড়া জিলার বন, নদনদী, পাহাড়, তরঙ্গায়িত উচ্চ নীচ নীরস অনুর্বর প্রস্তরভূমি মানুষের সাধনার মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিয়েছে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আরাম নেই, বরং সংগ্রাম আছে ; সংগ্রামশীল মানুষের বিচিত্র সাংস্কৃতিক রূপ সেখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। "বাঁকুড়া পরিক্রমা"য় গ্রন্থকার আমাদের সেই দেশ এবং সেই দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছেন। সেজন্য তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

বিষয়সূচী

বিষয় | | | পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব—

প্রাথমিক প্রসঙ্গ ... ... ১—১৩

দ্বিতীয় পর্ব—

ইতিহাসের পাতায়

প্রথম স্তবক—প্রাক্ মল্লযুগ ... ... ১৭—৩৮

(১) পুরাতনী ১৯

(২) ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ২৭

দ্বিতীয় স্তবক—মল্লযুগ ... ... ৩৯—৭৯

(১) প্রথম প্রভাত ৪১

(২) ভাস্বর মহিমায় ৪৯

(৩) দিন শেষ—অপরাহ্ন ৬০

(৪) বাঁকুড়ায় সামন্তরাজ ৭৪

তৃতীয় স্তবক—ইংরেজ শাসন ... ... ৮১—১০৯

(১) অশান্ত দিগন্ত ৮৩

(২) ম্যয় ভূখা হুঁ ৯১

(৩) শেষ অঙ্ক ১০৪

তৃতীয় পর্ব—

সংস্কৃতির ধারা ... ... ১১১—১৫২

(১) বৈষ্ণব-অনুশাসনের পূর্বে ১১৩

(২) বৈষ্ণবযুগ ও পরবর্তী কাল ১৩৬

চতুর্থ পর্ব—

প্রকৃতি পরিবেশ ... ... ১৫৩—১৬৯

(১) প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ১৫৫

(২) নদ-নদী, অরণ্য ১৫৮

(৩) সংযোগ ব্যবস্থা ১৬৬

বিষয়			পৃষ্ঠা

পঞ্চম পর্ব—

লোক পরিচয়	...	...	১৭১—২১৮
(১) লোকসংখ্যা ও সম্প্রদায়	...	...	১৭৩
(২) বাঁকুড়ায় সাঁওতাল	...	...	১৮৪
(৩) জীবিকা ও নিয়োগ	...	...	১৯১
(৪) জীবনযাত্রার ধারা	...	...	১৯৭
(৫) জন-স্বাস্থ্য	...	...	২০৫
(৬) শিক্ষাক্ষেত্রে বাঁকুড়া	...	...	২১২

ষষ্ঠ পর্ব—

কৃষি ও শিল্প	...	...	২১৯
কৃষি ও প্রধান শস্য	...	....	২২১
শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ও ইহার প্রতিকার	...	...	২২৮
ভাগদারদের কথা	...	...	২৩৬
বাঁকুড়ার শিল্প	...	...	২৪২
প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র, হাট বাজার ও মেলা		...	২৪৭

পরিশিষ্ট (১)

প্রত্নতত্ত্ব পরিচয় ২৫১

পরিশিষ্ট (২)

বাঁকুড়ার কয়েকজন প্রখ্যাত মনীষী ২৬২

পরিশিষ্ট (৩)

কয়েকটি বিশিষ্ট হাট ও বাজার ২৬৮

পরিশিষ্ট (৪)

কয়েকটি বিশিষ্ট মেলার পরিচয় ২০০

পরিশিষ্ট (৫)

বাঁকুড়া—ভ্রমণ-বিলাসীর দৃষ্টিতে ২৭২

প্রথম পর্ব

প্রাথমিক প্রসঙ্গ

প্রাথমিক প্রসঙ্গ

(১)

জিলার প্রধান শহর বাঁকুড়া; প্রধান শহর হইতেই জিলার নামকরণ হইয়াছে "বাঁকুড়া"।

নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মত। কেহ কেহ মনে করেন যে বঙ্কু রায় নামে কোন সামন্ত নৃপতি যে নগর পত্তন করেন তাঁহার নাম হইতেই নগরটির পরিচয় হয় বাঁকুড়া। মল্লরাজ বীর হাম্বীরের পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন বীর বাঁকুড়া রায়। কাহিনীতে আছে যে বীর হাম্বীর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করার ফলে তরফ জয় বেলিয়া পড়ে বীর বাঁকুড়ার অংশে, আর তিনিই অরণ্য কাটিয়া যে বসতি স্থাপন করেন তাহাই পরিচিত হয় তাঁহার নামানুসারে। উপরের বঙ্কু রায় আর বীর বাঁকুড়া রায় একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। মতান্তরে স্থানীয় পাঁচটি কুণ্ড অর্থাৎ জলাশয় হইতে এখানকার নাম হয় বাণ কুণ্ডা—"বাণ" কথাটি "পঞ্চ বাণ"এর পাঁচ সংখ্যা নির্দেশক। এই "বাণকুণ্ডা" ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া "বান্‌কুঁড়া"—বাঁকুড়া কথায় দাঁড়ায়। বাণকুণ্ডা নামটি যে প্রাচীন তাহার প্রমাণ হিসাবে ও ম্যালি সাহেব তাঁহার ১৯০৮ সালের জিলা গেজেটিয়ারে পণ্ডিত এড়ুমিশ্রের (আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী) উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

"বাঁকুড়া" নামের উৎপত্তি

ধর্ম-ঠাকুরের পূজার উৎপত্তি ও ইহার প্রসারে এই অঞ্চল অতীতে এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই ধর্ম-ঠাকুর প্রাচীন কাল হইতে "বাঁকুড়া রায়" নামে জিলার বহু স্থানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল রচয়িতা মাণিকরাম গাঙ্গুলি তাঁহার কাব্যে এইরূপ বহু "বাঁকুড়া রায়" ধর্ম-ঠাকুরের পরিচয় দিয়াছেন ঃ

ধর্ম-ঠাকুর ও "বাঁকুড়া"

"বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি এক মনে
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে।
ফুল্লরের ফতে সিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়
শুদ্ধ ভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়।
সিয়াসের কালাচাঁদ শ্রিদাসের বাঁকুড়া রায়
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়।"

মধ্যযুগের আর একজন ধর্মমঙ্গল প্রণেতা রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে ধর্ম-ঠাকুরের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ধর্ম-ঠাকুর তাঁহার পরিচয় দিলেন—

"আমি ধর্ম-ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।"

এই "বাঁকুড়া রায়" নামীয় ধর্ম-ঠাকুর হইতে যে অঞ্চলের পরিচয় "বাঁকুড়া" হইয়াছে ইহা অনুমান করা অসমীচীন নহে। বহু শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম-ঠাকুর এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন। জনগণের প্রিয় দেবতা দেশের নামের উপর যে তাঁহার প্রভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিবেন তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। সম্প্রতি শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে জিলা গেজেটিয়ার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই মতই পোষণ করেন। সংস্কৃত বক্র কথাটির অপভ্রংশ হইল বঙ্কিম—বঙ্কু। কথাটি প্রিয় বা শোভন সূচক, যেমন শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম ভাব হইতে পরিচয় বঙ্কু রায়। ধর্ম-ঠাকুরের উপর "বঙ্কুরায়" নাম প্রয়োগ হয় এই আদরের ও শোভনীয় ভাব হইতে। বঙ্কু বা বাঙ্কু কথার সহিত যোগ হয় "ড়া", শ্রেষ্ঠ বা বিশালত্ব অর্থে। "ড়া" শব্দটি পল্লী বাংলার বহু স্থানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া স্থানটির এই অর্থই প্রকাশ করে। ধর্ম-ঠাকুর সম্বন্ধে বঙ্কু রায়=বাঙ্কুড়া বা বাঁকুড়ার অর্থ হইল যিনি সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আর্যেতর এই "ড়া" শব্দের অন্য অর্থ বহু গৃহের সমষ্টি।

মধ্যযুগের কয়েকজন সামন্ত নৃপতি যে বাঁকুড়া রায় নামে পরিচিত ছিলেন তাঁহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। চণ্ডী মঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম আর একজন বাঁকুড়া রায়ের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি ছিলেন শিলাই নদীতীরস্থ আড়রার ভূস্বামী :

"পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিণু নৃপমণি
পাঁচ আড়া মাপি দিল ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।"

সমগ্র জিলায় কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ ইংরেজযুগের পূর্বে ধারাবাহিক রূপে পাওয়া যায় না, কিন্তু মল্লভূম বা বিষ্ণুপুর রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই পাওয়া যায়। এক সময় মল্লভূম বলিতে বর্তমান বর্ধমান

বিভাগের প্রায় যাবতীয় পশ্চিম অংশ বুঝাইত। পরাক্রান্ত মল্লরাজগণের কঠোর অক্লান্ত জীবনধারা সম্বন্ধে উক্তি আছে।

"অয়ঃ পাত্রে পয়ঃপানম্ চিপিটকঞ্চ চর্বণম্
শয়নমশ্বপৃষ্ঠে চ মল্লরাজস্য লক্ষণম।"

লৌহ ঢাল পাত্রে বারি পান
চিপিটকে ক্ষুধা অবসান।
অশ্বপৃষ্ঠে ক্লান্তি দূর, সুখেতে শয়ন
অভিজ্ঞান—মল্লরাজগণ।

প্রাথমিক প্রসঙ্গ

(২)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসার অব্যবহিত পূর্বে প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য কারণে এই অঞ্চল প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত ছিল—জঙ্গল মহল ও বিষ্ণুপুর রাজ্য। ছাতনা, সুপুর, অম্বিকানগর, রায়পুর, ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা প্রভৃতি পরগনা সাধারণতঃ জঙ্গলমহল নামে পরিচিত থাকিয়া পূর্ব প্রান্তস্থিত বিষ্ণুপুর রাজ্য হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বর্তমান ছিল। পঞ্চকোট রাজ্যের অধিকারভুক্ত মহিসারা পরগনার বর্তমান মেজিয়া ও শালতোড়া থানাও পরিচিত ছিল জঙ্গলমহল নামে। বাদশাহ আকবরেব শাসন সময়ে জঙ্গলমহল ছিল সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত। নবাব মুরশেদকুলি খাঁ বা জাফর খাঁ-এর সময় জঙ্গলমহল চাকলা মেদিনিপুরেব সামিল হয়, বিষ্ণুপুর হয় চাকলা বর্ধমান ভুক্ত। কিন্তু মোগল শাসনকালে ইহাদের কোন অঞ্চলের উপর মোগল প্রভুত্ব বিস্তারের কোন বিশেষ প্রচেষ্টা হয় নাই, নিয়মিত ভাবে রাজস্ব আদায় তো দূরের কথা। ইং ১৭৬০ সালে চাকলা মেদিনিপুর ও চাকলা বর্ধমান কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বিষ্ণুপুর—তখন পরগনা বিষ্ণুপুব—যুক্ত হয় বর্ধমানের সহিত কিন্তু জঙ্গলমহলে কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য হয় নাই। ইং ১৭৬৭ সালে মেদিনিপুরস্থিত কোম্পানির রেসিডেন্টের নির্দেশে লেঃ ফার্গুসনকে পাঠান হয় জঙ্গলমহলের সামন্তরাজগণকে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে। ফার্গুসন সাহেব যে অভিযান চালাইলেন তাহার ফলে সুপুর, অম্বিকানগর ও ছাতনা বশ্যতা স্বীকার করে ও ইহাদিগকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় চাকলা মেদিনিপুরের। রায়পুর, ফুলকুসমা ও সিমলাপাল প্রভৃতির সামন্তগণও কোম্পানির প্রভুত্ব স্বীকার করে, ও এই সকল অঞ্চল চাকলা বর্ধমানের সামিল করা হয়। কোম্পানির শাসনের প্রথম ভাগে এই সকল প্রত্যন্ত প্রদেশের শাসনকার্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ইহার প্রতিরোধকল্পে ইং ১৭৮৭ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ বীরভূম ও

পরিচয়—কোম্পানির আমলের পূর্বে—জঙ্গল মহল ও বিষ্ণুপুর

কোম্পানির শাসনের প্রথমে

বিষ্ণুপুরকে একই জিলাভুক্ত করিয়া একজন ইংরেজ কলেক্টরের তত্ত্বাবধানে রাখেন। কলেক্টরের সদর অফিস হইল বিষ্ণুপুর। ইহার কিছুকাল পর সদর অফিস স্থানান্তরিত হইয়া সিউড়িতে যায়। পরে ইং ১৭৯৩ সালে বিষ্ণুপুর বর্ধমান কলেক্টরের এলাকাভুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে যে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়, ইতিহাসে তাহা 'চোয়াড় বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের ফলে এই সব অঞ্চলে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের সমস্যা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইং ১৮০৫ সালে কর্তৃপক্ষ একটি রেগুলেশন বা নির্দেশনামা প্রবর্তন করিয়া জঙ্গলমহল নামে নূতন এক জিলা সৃষ্টি করেন, ইহার সর্বময় কর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন একজন ইংরেজ শাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট। এই নূতন জিলা গঠিত হয় ২৩টি পরগনা বা মহল লইয়া; ইহাদের ১৫টি আসে পঞ্চকোট ও বীরভূম হইতে, ৩টি (সেনপাহাড়ি, সেরগড ও বিষ্ণুপুর) বর্ধমান হইতে এবং ছাতনা, সুপুর, অম্বিকানগর সহ অবশিষ্ট পাঁচটি মেদিনিপুর হইতে। জঙ্গলমহলের ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ সাহেবের সদর স্থাপিত হয় বাঁকুড়ায়। রাজস্ব ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য বাঁকুড়ায় একজন সহকারী কলেক্টর নিযুক্ত হন, রাজস্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন বর্ধমানের কলেক্টরের অধীন।

পাইক বা চোয়াড় বিদ্রোহ ও প্রশাসনিক পরিবর্তন

ইং ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জঙ্গলমহল জিলার অন্তর্গত থাকে। ইতিমধ্যে ইং ১৮৩২ সালে জঙ্গলমহলের ভূমিজ সম্প্রদায় ব্যাপক বিদ্রোহ করিয়া এক অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে ও ইহার ফলে শাসন ব্যবস্থার পুনরায় পরিবর্তন হয়। ইং ১৮৩৩ সালে প্রবর্তিত এক রেগুলেশন দ্বারা জঙ্গলমহল জিলার বিলোপ সাধন হয়, সেনপাহাড়ি, সেরগড ও বিষ্ণুপুর পরগনা বর্ধমানের সহিত, আর অবশিষ্ট পরগনা নবগঠিত মানভূম জিলার সহিত যুক্ত হয়। মানভূম জিলা রেগুলেশন বা প্রচলিত শাসন-বিধান বহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হয়; ইহার শাসনভার ন্যস্ত হয় একজন বিশেষ ইংরেজ রাজকর্মচারীর উপর, আর তিনি পরিচিত হন "দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বড়লাটের প্রতিনিধির প্রধান সহকারী" (Principal Assistant to the Agent to the Governor General for South-West Frontier) নামে। এই বিভাজনে [illegible] বর্তমান বাঁকুড়া জিলার সমগ্র পশ্চিমাংশ প্রকৃতপক্ষে মানভূমের

ভূমিজ বিদ্রোহ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনরায় পরিবর্তন

সামিল হয়। ইং ১৮৩৫-৩৬ সালে এই নূতন জিলার পূর্ব-সীমান্ত বরাবর অন্ত একটি জিলা গঠিত হয়, নাম হয় "পশ্চিম বর্ধমান।" ইহার সদর স্থাপিত হয় বাঁকুড়া শহরে। পূর্বদিকে এই জিলার প্রান্তসীমা বিস্তৃত থাকে কোতুলপুর পর্যন্ত, পশ্চিম দিকে ইহার সীমারেখা ছিল মোটামুটি বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ রাস্তা ও বাঁকুড়া-খাতরা রাস্তা বরাবর। বাঁকুড়া শহর ছিল জিলার পশ্চিম সীমার শেষ প্রান্তে। ইং ১৮৭২ সালে সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর, সেরগড ও সেনপাহাড়ি পরগনা বর্ধমান জিলার সহিত যুক্ত হয়, আবার অন্যদিকে ছাতনা মানভূম হইতে বাহির হইয়া "পশ্চিম বর্ধমান" জিলার অন্তর্গত হয়। ইং ১৮৭৯ সালে খাতরা ও রায়পুর থানা সহ সুপুর, অম্বিকানগর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা ও রায়পুর পরগনা মানভূম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই নবগঠিত জিলার সহিত সংযুক্ত হয়, সোনামুখী, ইন্দাস ও কোতুলপুর থানাও ইহার সহিত যুক্ত হয়। এই ভাবে বাঁকুডা জিলা ইহার বর্তমান রূপ ধারণ করে কিন্তু ইং ১৮৮১ সালের পূর্বে বর্তমান নাম লাভ করে না। তখন পর্যন্ত সরকারী কাগজ-পত্রে ইহার পরিচয় ছিল "পশ্চিম বর্ধমান" নামে।

জিলার বর্তমান রূপ

বিশাল দামোদর নদ পশ্চিম-পূর্ব গতিতে জিলার উত্তর ভাগ দিয়া প্রবাহিত থাকিয়া ইহাকে বর্ধমান জিলা হইতে পৃথক করিয়াছে। পূর্বে বর্ধমান জিলার খণ্ডঘোষ থানা ও হুগলি জিলার গোঘাট থানা, দক্ষিণে মেদিনিপুর জিলা ও পশ্চিমে নবগঠিত পুরুলিয়া জিলা। এই চতুঃসীমার মধ্যে জিলার আয়তন ২৬৪৬ বর্গ মাইল।

চতুঃসীমা

শাসন কার্যের সুবিধার জন্ম জিলা দুইটি মহকুমায় বিভক্ত, বাঁকুড়া সদর ও বিষ্ণুপুর। জিলার মোট থানাসংখ্যা ১৯। নিম্নে ইহাদের পরিচয় ও ১৯৬১ সালের সেনসাস অনুযায়ী লোকসংখ্যা দর্শিত হইল :

মহকুমা ও থানা

মহকুমা	থানা	আয়তন (বর্গমাইলে)	লোকসংখ্যা
বাঁকুড়া সদর		১৯৩৩'৪	১১,৭৪,৯৭৮
	বাঁকুড়া	১৫৭ ৭	১৭৬,৭৪৬
	ওঁদা	১৯৩'৯	১,০৯,৯১৩
	ছাতনা	১৭২'৯	১,০২,৪৮৮

মহকুমা	থানা	আয়তন (বর্গমাইলে)	লোকসংখ্যা
	গঙ্গাজলঘাটি	১৪৩'৩	৮৯,৩৬৬
	বড়জোড়া	১৫১'৯	৯১,৮১৭
	মেজিয়া	৬২'৯	৪১,৮২৭
	শালতোড়া	১২১'৫	৭০,৭৩৬
	খাতরা	১৬৬'৫	১,০১,৫২৯
	ইন্দপুর	১১৫'৯	৭৫,২৯২
	রাণীবাঁধ	১৭৫'৪	৬৬,৬০৪
	রায়পুর	২২৭'১	১২৬,১৫৭
	সিমলাপাল	১১৯'৪	৬০,৯৭৮
	তালডাংরা	১৩৫'০	৬১,৫২৫
বিষ্ণুপুর		৭১৩ ৫	৪,৮৯,৫৩৫
	বিষ্ণুপুর	১৪৬'৫	১,০১২৪৩
	জয়পুর	১০০ ৯	৭০,৯৮০
	কোতুলপুর	৯৬'৭	৭৭,৯৬০
	সোনামুখী	১৪৬'৭	৮২,৬২৪
	পাত্রসায়ের	১২৪'২	৮৩,৩৯৬
	ইন্দাস	৯৮'৫	৭৩,৩৩২

পৌর প্রতিষ্ঠান

জিলায় মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তিন। ইহাদের পরিচয় নিম্নরূপ:

পৌর প্রতিষ্ঠান	আয়তন (বর্গ মাইলে)	লোকসংখ্যা
বাঁকুড়া	৭	৬২৮৩৩
বিষ্ণুপুর	৮	৩০৯৫৮
সোনামুখী	৪ ৫	১৫০২৭

পাত্রসায়ের ও খাতরা মিউনিসিপালিটি পর্যায়ভুক্ত না হইলেও প্রায় ইহার সমতুল্য। ইহাদের আয়তন ও লোকসংখ্যা এইরূপ:

পাত্রসায়ের	৩'৩৬	৬৫৮২
খাতরা	২ ৯০	৬৯৫৭

বাঁকুড়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যে কোন নবাগত পর্যটকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। প্রথমে হইল ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

বাঁকুড়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বাঁকুড়ার রূপ ছোট নাগপুর অঞ্চলের যে কোন অংশের সহিত তুলনীয়। জিলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ এই নৈসর্গিক দৃশ্য ও ও সাধারণের জীবন কাহিনী সম্বন্ধে আনে এক অভিনব ও মনোরম অভিজ্ঞতা। পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিমের দিকে

রূপসী বাঁকুড়া

অগ্রসর হইয়া মল্লরাজগণের গড় বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেই মনে হইবে যেন শস্যশ্যামলা অবারিত মাঠ পিছনে পড়িয়া আছে। গড় বিষ্ণুপুরের লাল মাটি, অপ্রশস্ত রাস্তা আর বিশাল বাঁধ সমষ্টি অতিক্রম করিয়া বিরাই নদীর সেতুর নিকট উপস্থিত হইলে দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত মাঠ আবার যখন দৃষ্টি পথে আসে তখন ভূপৃষ্ঠ ঈষৎ উন্নত-নত। দূরে বনানীর সীমা রেখা, মাঝে মাঝে পল্লী প্রান্ত। দ্বারকেশ্বর নদের বালুকাস্তীর্ণ ক্ষীণ রূপালি রেখা অতিক্রম করিলেই ক্রম-বর্ধমান বাঁকুড়া শহরের যে রূপ আত্ম-প্রকাশ করে, তাহা চারিদিকের প্রকৃতি পরিবেশের সম্পূর্ণ বিপরীত, দুইটিতে যেন মিল খাইয়া চলিতেছে না। তারপর যতই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ভূপৃষ্ঠ ক্রমাগত অধিকতর অসমতল; কিছুদূর পর্যন্ত উপরে উঠিয়া আবার ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নীচের দিকে নামিয়াছে, আবার উঠিয়াছে। পর পর এইভাবে উন্নত-অবনত হওয়ার ফলে সৃষ্ট হইয়াছে স্থির তরঙ্গের অসংবদ্ধ শ্রেণী, সেগুলি শেষ হইয়াছে দূর পাহাড়ের সীমারেখায়। মাঝে মাঝে বা কোন উন্মুক্ত শিলাখণ্ড মাটি হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূর দিগন্তে শুশুনিয়ার ন্যায় কোন পর্বতচূড়া আকাশে মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান, অথবা পাহাড়ের সুদীর্ঘ অসংলগ্ন শ্রেণী অবরোধ করিয়াছে দৃষ্টিপথ। তরঙ্গায়িত ভূমির নীচের ভাগে কৃষিক্ষেত্র, সেখানে বাউরি বা সাঁওতাল নারী চাষের কাজে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে গান গাহিয়া দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে। যুবক, যুবতী, শিশুসন্তান সঙ্গে সাঁওতাল দল চলিয়াছে নিঃশব্দে, মনোরম পদক্ষেপে। তাহাদের গন্তব্যস্থল "নামাল" অর্থাৎ পূব দেশে, সেখানে কাজ মিলিবে। আরও কিছুদূর, তখন দেখা যাইবে উত্তরে 'বিহারী নাথ', তারপর শৈলশ্রেণীর পর শৈলশ্রেণী, আর

ইহাদের পিছনে মাথা তুলিয়া আছে একখণ্ড বিরাট নীলাভ মেঘের ন্যায় [illegible] কোটি শৈল-চূড়া। অজ্ঞাতসারেই ভূপৃষ্ঠ ছোট নাগপুর মালভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

অসমতল ভূখণ্ড ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া কাঁসাই নদীর অববাহিকায় মিশিয়াছে। এই অববাহিকার বাম অর্থাৎ পূর্বভাগে বিস্তীর্ণ সমতল উর্বর ভূমি, অন্যভাগে পাহাড় ও অরণ্যাবৃত ভূখণ্ড মেদিনিপুর ও পুরুলিয়ার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। কাঁসাই নদীর অববাহিকা যেখানে উর্বর সমতল ভূমি সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে দেখা যায় ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া সবুজ ধানের ক্ষেত। কৃষির সময় সাঁওতাল, বাউরি প্রভৃতি শ্রেণীর শত শত নরনারী দুঃসহ রৌদ্রতাপ, বর্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করিয়া অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত চাষের কাজ করিয়া যায়; মাঝে মাঝে বা ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশে পরস্পরের সহিত আলাপ করে সরল, আনন্দচিত্তে। অববাহিকার পশ্চিম ভাগে শালবন-ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী, দূর হইতে দেখা যায় নীল মেঘের ন্যায়। এই অঞ্চলেই মনোরম প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে সদ্য-নির্মিত কংসাবতী জলাধার। আরও দক্ষিণে, কাঁসাই নদীর অপর দিকে রাণীবাঁধ অঞ্চলে, অরণ্য ও ঘনবনশীর্ষ পাহাড় শ্রেণীর অপূর্ব সমারোহ। শ্রেণীর পর শ্রেণী রচনা করিয়া পাহাড়গুলি বিস্তৃত হইয়াছে দূর দিগন্ত পর্যন্ত, আর ইহাদের মধ্যদিয়া চলিয়াছে গিরিপথ—নিবিড় বনরাশি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষিক্ষেত্র, পল্লী-প্রান্ত পার্শ্বে রাখিয়া এক মনোহর প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যদিয়া, ঝিলিমিলির দিকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বাঁকুড়ার এই অংশ অতুলনীয়।

সঙ্গে সঙ্গে আর যে একটি রূপ প্রকাশ পায়, তাহা হইল নিঃস্বতার, দৈন্যের; যাহাকে বলা যায় সর্ব-শূন্য দারিদ্র্যের রূপ। জিলার পশ্চিম ভাগেই এই রূপটি অধিকতর প্রকট।

কুরূপা বাঁকুড়া

অর্ধনগ্ন, শীর্ণাকৃতি নরনারী ততোধিক শীর্ণ গৃহপালিত গো-মহিষাদি যে আর্থিক দুর্গতির ইঙ্গিত করে তাহা কোন যুগেরই সমাজ-জীবনের সুষ্ঠু প্রগতির পরিচায়ক নহে। যে অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি শতকের ৮০ জনের জীবিকা কৃষি, আর তাহার ভিতর এক বৃহৎ অংশ ভূমিহীন কৃষিজীবী পর্যায়ের, সেখানে দারিদ্র্য যে একরূপ চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে থাকিবে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে; কিন্তু এই দারিদ্র্যের প্রকৃত রূপ, ইহার গভীরতা,

স্বয়ং না দেখিলে অনুধাবন করা দুষ্কর। অথচ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে যখন কোম্পানির ফৌজ এই অঞ্চলে প্রথম অভিযান চালায়, তখন অবস্থা ছিল ইহার বিপরীত। প্রায় সমসাময়িক ইংরেজ কোম্পানির কলিকাতাস্থ গবর্নর হলওয়েল সাহেব, তদানীন্তন বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহের রাজত্বে বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রজাসাধারণের যে সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত উপরোক্ত অভিযানের অধিনায়ক ফার্গুসন সাহেবের বিবরণের সাদৃশ্য আছে। এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এখন হইয়াছে অতীতের বিষয়, ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে অর্ধাশন বা অনশন আর খড়শূন্য কুটীর-চাল যাহা আবার—

"প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙে ঝড়ে।"

প্রথম স্তবক

প্রাক্ মঙ্গলযুগ

পুরাতত্ত্ব

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পশ্চিম বাংলার এই অঞ্চলের সুদূর অতীত অন্ধকারের আবরণে আচ্ছন্ন। কোন নির্ভরশীল উপাদানের সাহায্যে এই যুগের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় সম্ভব নহে। আর্য-ভাষা-ভাষীগণের প্রাচীন ধর্ম-সাহিত্য, বৈদেশিক লেখকগণের বৃত্তান্ত, প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রভৃতির ক্ষীণ রশ্মি অথবা আনুমানিক ভিত্তি কখনও কখনও এই অন্ধকার ভেদ করিয়া ইতিহাসের কোন এক বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের উপর আলোক-পাত করে বটে, কিন্তু ঘনায়মান অন্ধকার এই ক্ষীণ আলোক রেখাকে অগ্রসর হইতে দেয় না।

অন্ধকারের আবরণে সুদূর অতীত

পণ্ডিতগণ মনে করেন যে আদিযুগে প্রাগ্‌-আর্য নিষাদ জাতি, যাহাদের বলা হয় আদি অস্ত্রাল বা প্রোটো অস্ত্রাল, বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া আসাম হইতে মধ্য প্রদেশের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগে বাস করিত। দক্ষিণ বিহার ও পশ্চিম বাংলায় যে অংশে বর্তমান বর্ধমান বিভাগ, সেই অঞ্চলে তাহাদের ছিল বিশেষ আধিপত্য। এই নিষাদ জাতির আদি বৃত্তি ছিল প্রধানতঃ পশু শীকার। প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তাহাদের প্রধান সহায়। সম্প্রতি দামোদর নদের উভয় তীরে প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক যুগের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়। যদিও কালক্রমে ইহাদের কোন কোন শাখা কৃষি ও পশুপালনের দিকে আকৃষ্ট হয়, আদিবৃত্তির সংস্কার তাহাদের জীবন ধারা হইতে লুপ্ত হয় নাই। পরযুগে দ্রবিড় গোষ্ঠির কোন কোন শাখা উন্নত ধরনের সভ্যতা লইয়া এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে কোন শাখা আবার লোহের নিষ্কাশন ও ইহার ব্যবহার বা পুর-নির্মাণে পারদর্শী ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বর্ধমানের কয়েক স্থানে খনন করিয়া এই প্রাগ্‌-আর্য দ্রবিড় সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাইয়াছেন অনেকের মতে তাহার সহিত প্রাগ্‌-আর্য সিন্ধু সভ্যতার সংযুক্ত আছে।

প্রাগ্‌-আর্য নিষাদ জাতি

আর্য-ভাষা-ভাষীগণের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকে ভারতের পূর্বপ্রান্তে প্রাচী দেশের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন মগধ বা বগধ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (খৃষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দী) প্রাচী দেশের মগধ বা বগধ রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র অঙ্গুত্তর নিকায় (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) তৎসময়ের উত্তর ভারতে যে ষোলটি সার্বভৌম রাজ্য বা মহাজনপদ ছিল তাহার পরিচয় প্রসঙ্গে মগধ রাজ্য ও অঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছে: প্রাচী দেশের আর কোন রাজ্যের উল্লেখ নাই। মনে হয় যে আর্য সংস্কৃতির ধারা সেই যুগে বগধ বা মগধ অর্থাৎ বর্তমান দক্ষিণ বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই; আর্য সংস্কৃতির বাহকদের নিকট এই অঞ্চল সম্বন্ধে ধারণাও ছিল অস্পষ্ট। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ যুগে কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য ও তৎপূর্ববর্তীযুগে মগধ রাজ্য ও কলিঙ্গের মধ্যে যে সম্বন্ধের সন্ধান মেলে তাহাতে মনে হয় যে, দুইটি রাজ্য ছিল পরস্পর সংলগ্ন। মৌর্য-পূর্ব নন্দবংশীয় কোন রাজা কলিঙ্গ দেশে একটি পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একটি প্রাচীন লিপিতে। কলিঙ্গ মৌর্য প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। তাই সম্রাট অশোকের অভিযান হয় কলিঙ্গে, আর এই অভিযান সম্রাটের জীবনে যে পরিবর্তন আনয়ন করে, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের সুব্যবস্থা ছিল। কানিংহাম সাহেব বলেন যে মগধ হইতে কলিঙ্গগামী সুরক্ষিত রাজপথ প্রসারিত ছিল বর্তমান পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জিলার মধ্য দিয়া। কলিঙ্গ দেশের অবস্থান ছিল মগধ রাজ্যের দক্ষিণে।

মগধ ও কলিঙ্গের যে বিবরণ প্রাচীন আর্য ধর্মগ্রন্থ বা বৌদ্ধযুগে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে বর্তমান বাঁকুড়া জিলার পশ্চিমভাগ ছিল প্রাচীন মগধের সীমান্ত অঞ্চল ও

অসুর জাতি

দক্ষিণ ভাগের কিয়দংশ ছিল কলিঙ্গ রাজ্যভুক্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মগধ বা বগধের অধিবাসীকে অসুর সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছে। মহাভারতাদি গ্রন্থে ভারতের পূর্ব প্রান্তে অসুরগণের আধিপত্যের পরিচয় আছে—এক সময় মথুরা হইতে মগধের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অসুর প্রভাব। দেখা যায় যে পূর্বকালে বাঁকুড়ায় অসুর সম্প্রদায়ের কোন শাখার প্রাধান্য ছিল, আর ইহার স্মারক হিসাবে এখনও বর্তমান আছে বহু স্থানীয় নাম যেমন হাট আসুরিয়া, বন আসুরিয়া, অসুর গড়, অসুর পুকুর। অসুর জাতির সহিত মহাভারতাদির

অসুরের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না কিন্তু যে অসুরজাতির অস্তিত্ব আমরা এই অঞ্চলে উপলব্ধি করিতে পারি তাহারা ছিল ঐতিহাসিক জাতি। অসুরজাতি এখন আর এ অঞ্চলে নাই, কিন্তু সন্নিহিত ছোট নাগপুরের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ নেতার হাটের পার্বত্য অঞ্চলে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। হাটন সাহেব (Dr. Hutton) এই অসুর জাতি সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিমত এই যে মূলে তাহারা ছিল এক প্রাগ্-আর্য জাতি, নানাবিধ ধাতব কার্যে বিশেষতঃ খনিজ লৌহ নিকাশনে ও লৌহ গলাইয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে ছিল পারদর্শী (১)। স্থাপত্য কলায় ছিল ইহাদের বিশেষ অধিকার; ছোট নাগপুরের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বহু প্রাচীন পরিত্যক্ত লৌহ আকর, বিশাল প্রস্তর প্রাকার, পুরাতন নগর বা লোকালয়ের ধ্বংসাবশেষ জ্ঞাপক বিরাট ইষ্টকস্তূপ প্রভৃতি তাঁহার মতে এই অসুর জাতির স্থাপত্য কলার নিদর্শন। রাজগীর অর্থাৎ মহাভারতের প্রাচীন গিরিব্রজ বা রাজগৃহের সুবিশাল প্রস্তর প্রাকারের সহিত ছোট নাগপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাকারের সাদৃশ্য আছে। গিরিব্রজ ছিল অসুর রাজ জরাসন্ধের সুরক্ষিত নগরী।

ছোট নাগপুর ও ইহার প্রান্ত-সীমায় এক সময় যে অসুর জাতির প্রাধান্য ছিল তাহা অনেকেরই ধারণা (২)। বহু শতাব্দী যাবৎ এই অসুর জাতি এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বর্তমান থাকে, পরে মুণ্ডা জাতীয় নানা সম্প্রদায় যখন এখানে অনুপ্রবেশ করে, ইহাদের চাপে অসুরগণ দূর পার্বত্য ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তার হয় আনুমানিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে। অনেকে এই অসুর জাতির সহিত সিন্ধু উপত্যকার প্রাগ্-আর্য জাতির নিবিড় সম্বন্ধ ছিল বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে অসুর জাতির আদি বাসভূমি ছিল উত্তর ভারতে, সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতা গঠনে ছিল ইহাদের বিশেষ অবদান। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে প্রাচীন আর্যগণ লৌহ নিকাশন, লৌহের ব্যবহার বা নগর নির্মাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার প্রাগ্-আর্য জাতি ছিল ইহাতে পারদর্শী। বহিরাগত আর্যগণের সহিত সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর অসুর সম্প্রদায় সিন্ধু উপত্যকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ও ভারতের বিভিন্ন

(১) J. H. Hutton—Caste in India.

(২) K. K. Leuba—The Asur.

স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদেরই এক শাখা গঙ্গাস্রোত অবলম্বন করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হয় ও কালক্রমে ছোটনাগপুর ও ইহার সন্নিহিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

প্রাচীন সুহ্ম দেশ

জিলার পূর্ব অঞ্চল ছিল প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের অন্তর্গত। এই সুহ্ম রাজ্যের পরিচয় আমরা পাই পরবর্তীযুগের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে দৈত্যরাজ বলির পাঁচ পুত্রের নামানুসারে পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়; ইহারা হইতেছে সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র। অঙ্গ রাজ্য ছিল মগধের পূর্বে, অঙ্গের পূর্ব দিকে ছিল সুহ্ম। সুহ্ম রাজ্যের পূর্বে ছিল বঙ্গদেশ, উত্তরে পুণ্ড্র আর দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ।

মহাভারতে ভীমের দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে ভীম পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেবকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন ও পরে সুহ্মদের অধীশ্বর ও সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে সুহ্ম ও কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে রঘু নানা দেশ জয় করিয়া সুহ্ম দেশে উপস্থিত হইলে সুহ্মবাসিগণ বেতস পত্রের ন্যায় নত হইয়া তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করে; পরে রঘু কপিশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে জয় যাত্রা করেন। এই কপিশা হইতেছে অনেকের মতে বর্তমানের কাঁসাই নদী। দশকুমার চরিত নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সুহ্ম দেশের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এই দেশ সমুদ্রকূলবর্তী তাম্রলিপ্ত বা দামলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়।[১] তাম্রলিপ্ত মেদিনিপুর জিলার বর্তমান তমলুক।

রাঢ় দেশ ও গঙ্গারাষ্ট্র

কালক্রমে সুহ্মদেশের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া ইহার দক্ষিণাংশ যুক্ত হয় কলিঙ্গ বা উৎকল রাজ্যের সহিত, অবশিষ্টাংশ রহিয়া গেল এক স্বাধীন রাজ্যরূপে আর ইহা পরিচিত হয় রাঢ় বা রাঢ়া নামে। তখন আর্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রধানতঃ উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর্য সভ্যতার গণ্ডি-বহির্ভূত দেশ সম্বন্ধে আর্য ভাষাভাষী-গণের ধারণা ক্ষীণ থাকায় গঙ্গা-প্রবাহবিধৌত এই রাজ্য তাঁহাদের নিকট পরিচিত হয় এক সাধারণ নামে—"গঙ্গারাষ্ট্র"। "গঙ্গারাষ্ট্র". দিগ্‌বিজয়ী

১। "সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য" ইত্যাদি।

সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডারের সমসাময়িক বা পরবর্তী গ্রীক ঐতিহাসিকদের নিকট পরিচয় লাভ করে "গঙ্গারিডি" নামে। গঙ্গারাষ্ট্র নামও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া "গঙ্গারাঢ়" বা মাত্র "রাঢ়" বা "রাঢ়ায়" পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মূল গঙ্গা প্রবাহ প্রবাহিত ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জিলার মধ্য ভাগ দিয়া ও বর্তমান, হুগলি ও হাওড়া জিলার পূর্ব প্রান্ত ব্যাপিয়া। পরে নৈসর্গিক কারণে গঙ্গা ইহার আদি প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া পদ্মা নদীর খাত অনুসরণ করে। বর্তমান ভাগীরথী বা গঙ্গা মূল গঙ্গানদীর পরিত্যক্ত প্রবাহ।

রাঢ়ের প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন জৈন গ্রন্থ "আচারাঙ্গ সুত্ত" হইতে। ইহাতে উল্লেখ আছে যে তখন অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে লাঢ়া অর্থাৎ রাঢ় দেশ ছিল জনপদহীন অরণ্যে আবৃত, ইহার অধিবাসীগণ ছিল সদাচারহীন ও হিংস্র প্রকৃতির, জৈন ধর্ম প্রবর্তক মহাবীর তাহাদের হস্তে নিগৃহীত হন। কিন্তু আচারাঙ্গ সুত্ত রাঢ় দেশের যে অংশের উল্লেখ করিয়াছে তাহা হইল রাঢ়ের প্রত্যন্ত ভাগ, সম্ভবতঃ বর্তমানের বর্ধমান-বিহার সীমান্ত। জৈন ধর্ম যে অঞ্চলে বিকশিত হয় তাহা এই সীমান্তের অনতিদূরে। প্রাচীন রাঢ়ের সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন গ্রীক লেখকগণ। তাঁহাদের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে আলেক্জাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় পূর্ব প্রান্তে প্রাচী ও গঙ্গারিডি নামে দুই পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে গঙ্গারিডির অবস্থান ছিল গঙ্গানদীর নিম্ন প্রবাহ ব্যাপিয়া। এই রাজ্যের অধিবাসীগণকেও গ্রীক লেখকগণ গঙ্গারিডি নামে অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে তাহারা ছিল এক শক্তিশালী জাতি। আলেক্জাণ্ডারের পর মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে যে গ্রীক দূতের আগমন হয়, তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে গঙ্গারিডি রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের বাহিরে সম্পূর্ণ এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক প্লিনি গঙ্গারিডি রাজ্যের সমৃদ্ধি ও কৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহার প্রধান নগরী ছিল পার্থেলিস্ বা পোর্টালিস্। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐতিহাসিক টলেমি গঙ্গারিডি রাজ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লাটিন কবি ভার্জিল উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই রাজ্যের সমৃদ্ধি ও কৃষ্টির জয়গান

রাঢ়ের প্রাচীনত্ব

গঙ্গারিডি রাজ্য

করিয়াছেন। আলেক্জাণ্ডারের ভারত অভিযানের প্রায় তিন শত বৎসর পর লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে (Periplus of the Erythrean Sea) গঙ্গারিডি রাজ্যকে পরাক্রমশালী ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গারিডিরগণ ছিলেন নৌ-বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষ এবং বহু পরিমাণে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র এই দেশ হইতে সাগর পথে বিদেশে প্রেরণ করা হইত। আলেক্জাণ্ডারের সময় হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত এই স্বাধীন ঐশ্বর্যশালী রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তারপর ইহার ইতিহাস হয় অন্ধকারে আবৃত।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে গঙ্গারিডি রাজ্য ও রাঢ় অভিন্ন। গঙ্গারিডির সভ্যতার যে পরিচয় উপরোক্ত বৈদেশিকগণের লেখনী হইতে প্রকাশ পায় এবং যাহার নিদর্শন বর্ধমান জিলার অজয় তীরে রাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থানে খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পাইয়াছেন, তাহা ছিল প্রাগ্-আর্য সভ্যতা।

গঙ্গারিডির সভ্যতা—প্রাগ্-আর্য সভ্যতা

ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে এই সভ্যতার বাহক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা প্রাগ্-আর্য দ্রবিড় বা অনুরূপ কোন জাতি। ইঁহারা ছিলেন সেই গোষ্টির অন্তর্গত যাহা উত্তর ভারতে আর্য প্রভাব অনুপ্রবেশের পূর্বে এক মহান সভ্যতার অধিকারী ছিল, মহেন-জো-দেরো বা হারাপ্পার ন্যায় নগর সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। সিন্ধু উপত্যকায় ও পরে উত্তর ভারতে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হইবার পর এই প্রাগ্-আর্য জাতির কোন কোন শাখা গঙ্গা নদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে; দক্ষিণ ভারত নিবিড় অরণ্যে আবৃত থাকায় ইহাদের গতি হয় পূর্বে, আরও পূর্বে। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকাই হইল ভারতের উত্তর খণ্ডে ইহাদের শেষ আশ্রয় স্থল ও এইখানেই গঙ্গা, অজয় ও দামোদর সংলগ্ন ভূভাগে ইহারা বহু শতাব্দী যাবৎ বসবাস করিয়া নিজস্ব সভ্যতা ও কৃষ্টি বিস্তার করে। তাহারা যে সকল নিজস্ব সংস্কার পালন করিয়া গিয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার বহু নিদর্শন বিদ্যমান।

ওলড্হাম (Oldham) সাহেবের ন্যায় নৃতত্ত্ববিদের মতে গঙ্গারিডির জাতির মধ্যে বাগদি সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণের সংখ্যা প্রাধান্য ছিল ও ইহাদের দ্বারাই প্রধানতঃ গঠিত ছিল গঙ্গারিডিরগণ।[১] যদি এই মত গ্রহণ করা যায়,

১। **W. B. Oldham—Some historical and ethnical aspects of Burdwan District.**

কল্পনা করিতে পারা যায় যে প্রায় সমগ্র বর্ধমান ডিভিসন লইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল এক সুসংবদ্ধ বাগদি রাজ্য। গ্রীক ঐতিহাসিক পোর্টালিস বা পার্থেলিস্ নামে গঙ্গারিডির যে প্রধান নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কাহারও মতে বর্ধমান শহর বা ইহার সন্নিকটস্থ কাঞ্চন নগর, আবার কাহারও মতে বিষ্ণুপুর। দেখা যায় যে উপরোক্ত অঞ্চল ইহার বাগদি প্রাধান্য দীর্ঘকাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে আমরা দুইটি পরাক্রান্ত বাগদি রাজ্যের সাক্ষাৎ পাই, একটি হুগলি জিলার সপ্তগ্রামের ও অন্যটি বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরের। সপ্তগ্রামের বাগদি রাজ্য বিলুপ্ত করেন ভবদেব ভট্ট তাঁহার বুদ্ধি বলে কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বর্তমান থাকে। বর্তমানে বাগদি সম্প্রদায় ক্ষয়িষ্ণু হইলেও বর্ধমান-বাঁকুড়া জিলায় এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ।

গঙ্গারিডি ও বাগদি জাতি

কালক্রমে রাঢ় দুই ভাগে বিভক্ত হয়, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। দক্ষিণ ভারতের চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল দেব (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) তাঁহার তিরুমলয় লিপিতে (Tirumalai inscription) উত্তিল লাঢ়া অর্থাৎ উত্তর রাঢ় ও তাককন লাঢ়া অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে সীমারেখা ছিল কাহারও মতে অজয় নদ আবার কাহারও মতে দামোদর। রাঢ়ের এই অংশ পরিচিত হয় বর্ধমান ভূক্তি নামে; 'ভূক্তি' কথাটির অর্থ হইল রাজ্যাংশ বা প্রদেশ। বর্ধমান ভূক্তির আদি সীমারেখা ছিল উত্তরে অজয় নদ, পূর্বে ও দক্ষিণে গঙ্গা প্রবাহ, পশ্চিমে অরণ্য। এক সময় কিন্তু বর্ধমান ভূক্তি বলিতে ভাগীরথীর পশ্চিমে প্রায় সমগ্র বাংলা দেশকে বুঝাইত।

উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত বর্ধমান ভূক্তির বিস্তার ছিল উত্তরে অজয় উপত্যকা হইতে দক্ষিণে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত। বর্ধমান-ভূক্তির প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় বর্ধমান জিলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত মহারাজা বিজয় সেনের নামাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসন হইতে; তাম্রশাসনের সময় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক। মনে হয় যে বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ও মেদিনিপুরের অংশ বিশেষ পরবর্তীকালে বর্ধমান ভূক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দণ্ডভূক্তি নামে পরিচিত হয়। মেদিনিপুরে প্রাপ্ত মহাসামন্ত শশাঙ্কের তাম্রলিপি পালরাজ-

কালের ইরদা লিপি ও সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত পালরাজ রামপালদেবের প্রশস্তি "রামচরিত"এ দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের চোল-রাজগণের শিলালিপি (খৃষ্টীয় ১০২৩-২৫) এই দণ্ডভুক্তির পরিচয় দিয়াছে "টণ্ডভূক্তি" নামে।

---

(২)

ইতিহাসের ক্রমবিকাশ

গঙ্গারিডিয় সভ্যতার গৌরবময় যুগের পর বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আর্যসংস্কৃতির প্রভাব তিনটি বিভিন্ন ধারায় এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে; প্রথম ধারা জৈন ধর্মের বিকাশ, দ্বিতীয় ধারা বৌদ্ধ মতবাদের প্রসার ও তৃতীয় ধারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তৃতি। কোন্ ধারা যে সঠিক কোন্ সময় এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা স্থাপনের প্রয়াস পায় তাহার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই যুগ অন্ধকারময় কিন্তু অনুমান করা যায় যে বাংলার এই প্রত্যন্ত প্রদেশে বহুকাল ধরিয়া প্রবল প্রাগ্-আর্য প্রভাব বর্তমান থাকে।

আর্যসংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার

পূর্ব-ভাগে ছিল বাগদি প্রাধান্য, পশ্চিমভাগের অরণ্য ও উচ্চভূমিতে ছিল নানা শ্রেণীর উপজাতির বাসস্থান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহারা ছিল স্ব স্ব প্রধান, কোন সার্বভৌম শক্তির প্রভাবের বাহিরে। দেশ ছিল অরণ্যবহুল, কোন সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভুত্ব গণ্ডি হইতে বহুদূরে থাকায় বহির্জগতের পরিবর্তনের প্রভাব ইহার অভ্যন্তরে কদাচিৎ প্রবেশ করিত। কখনও বা প্রবল বহিঃশক্তি দ্বারা ইহার অংশবিশেষ বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছে; অংশবিশেষ কোন বৃহত্তর রাজ্য বা সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়া বহিরাগত প্রভাব বা কৃষ্টির বশীভূত হইয়াছে। আবার কখনও বহিরাগত কোন ভাগ্যান্বেষী উপজাতীয় অঞ্চলের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের কোনটিই সমগ্র অঞ্চলের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই বা এমন একটি স্বাধীন, সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের রূপায়ণ করিতে সক্ষম হয় নাই যাহাকে এই অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব বলা যায়। এইরূপ একটি রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বিলম্ব হয় নাই এবং ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হয় যে ইহার সংগঠনে বা রূপদানের মূলে কোন বৈদেশিক অবদান দৃষ্ট হয় না। আমরা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্য সম্বন্ধে বলিতেছি; এই প্রসঙ্গের অবতারণা পরে করা হইবে।

দুর্জয় প্রাগ্-আর্য প্রভাব

যাহা হউক, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই অন্ধকার যবনিকা কিছু পরিমাণে অপসারিত হইলে দেখা যায় যে দামোদর-তীরে পুষ্করণে এক রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন। বংশ পরিচয়ে পাওয়া যায় রাজা সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার নাম ; রাজবংশ বিষ্ণু উপাসক।

গুপ্তযুগ ও পুষ্করণ রাজ্য

পুষ্করণের বর্তমান নাম পোখরণা। রাজা চন্দ্রবর্মা শুশুনিয়া পাহাড়ের উপরে গুহা নির্মাণ করিয়া তথায় বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠা করেন ও ইহার প্রতিষ্ঠালিপি পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ করেন। চক্র ও প্রতিষ্ঠালিপি এখনও বর্তমান ও এই লিপি হইতেই রাজা চন্দ্রবর্মার বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। শুশুনিয়া শিলালিপি পশ্চিম বঙ্গে এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপি। গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বর্ণিত আছে যে সমুদ্রগুপ্ত দিগ্‌বিজয় উপলক্ষে যে সকল নরপতিকে পরাস্ত করেন, পুষ্করণাধীপ চন্দ্রবর্মা তাঁহাদের অন্যতম। ঐতিহাসিকের মতে এলাহাবাদ প্রশস্তির চন্দ্রবর্মা ও শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মা একই ব্যক্তি। বর্তমান বর্ধমান ও বাঁকুড়া জিলার অংশ লইয়া গঠিত ছিল তাঁহার রাজ্য। এই চন্দ্রবর্মার পরাজয় সমুদ্র গুপ্তের রাঢ়বঙ্গ বিজয়ের পথ যে সুগম করে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাঢ়াঞ্চলের অংশ বিশেষ যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে বর্ধমান জিলার মসাগ্রামে প্রাপ্ত গুপ্ত যুগের মুদ্রা তাহাই প্রমাণ করে।

পুষ্করণ রাজবংশের আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রাজা চন্দ্রবর্মার সময় হইতে মল্লরাজশক্তির অভ্যুদয় পর্যন্ত যুগের সুস্পষ্ট কোন পরিচয়ও অজ্ঞাত। বাংলার অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস কিছু আলোকপাত করিতে সমর্থ হয় বটে

পশ্চিম বাংলায় সামন্তযুগ

কিন্তু ইহাও মাত্র অংশ বিশেষের উপর। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য হীনবল হয় ও ইহার ফলে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে গুপ্ত সম্রাটের ক্ষমতা শিথিল হইয়া পড়ে। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যের পুর্ব প্রান্তে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য আবির্ভূত হয়, অধিপতি এক একজন সামন্ত। সামন্ত রাজগণ আবার প্রতিবেশী দুর্বল রাজ্য জয় করিয়া সার্বভৌম নরপতি হইতে প্রয়াসী হন। এইরূপ একজন

গোপচন্দ্র

বর্ধমানভুক্তিতে প্রবল হইয়া উঠেন, নাম গোপচন্দ্র। গোপচন্দ্র চতুষ্পার্শ্বের আঞ্চলিক সামন্ত শক্তিকে বিজিত করিয়া এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। বর্ধমান জিলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয় সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তিনি মহারাজাধিরাজ গোপ

চন্দ্রের অধীনে বর্ধমানভূক্তির একজন মহাসামন্ত ছিলেন। তাম্রশাসনের সময় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। বাঁকুড়া যে বর্ধমানভূক্তির অন্তর্গত ছিল, পূর্বে তাহা বলা হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অপর একজন সামন্ত নৃপতি প্রবল হইয়া উঠেন ও অন্যান্য সামন্তবর্গকে জয় করিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি মহাসামন্ত শশাঙ্ক। রাজ্য সুসংবদ্ধ করিয়া তিনি ইহার বিস্তার সাধনে মনোনিবেশ করেন ও পশ্চিমে কনৌজের সীমা ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। উড়িষ্যার বলেশ্বর জিলায় প্রাপ্ত তাম্রলিখন হইতে জানা যায় উড্রবিষয় বা উড়িষ্যার অন্তর্গত উত্তর তোষালি শশাঙ্কের অধিকারে ছিল। মেদিনিপুর সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত দুইখানি তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায় যে যখন শশাঙ্ক পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার অধীনস্থ সামন্ত মহারাজা সোমদত্ত দণ্ডভূক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন! পূর্বে বলা হইয়াছে যে মেদিনিপুর ও বাঁকুড়ার অংশ লইয়া গঠিত ছিল দণ্ডভূক্তি।

শশাঙ্কের রাজ্যসীমা

ইং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। ইহার পর পালরাজ শক্তির আবির্ভাব পর্যন্ত যে যুগ আসিল, বাংলার ইতিহাসে তাহা এক বিশৃঙ্খলার যুগ। কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় সামন্ত রাজগণ আবার স্ব স্ব প্রধান হইলেন। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল, ইহাদের অধিনায়ক যাহারা হইলেন, তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও ইহার বিস্তারের জন্য পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইলেন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, বিবাদ বিসংবাদ প্রভৃতি প্রবল অরাজকতার সৃষ্টি করিল; আত্মকলহ-লিপ্ত সামন্তগণ প্রজার স্বার্থ বিস্মৃত হইলেন এবং অরাজকতা ও অবিচারের ফলে সাধারণের জীবন দুর্বিসহ হইল। বলবানের নিকট দুর্বলের আত্মরক্ষার দ্বার রুদ্ধ হইল। দেশের এই সঙ্কটময় অবস্থার নামকরণ হইল "মৎস্যন্যায়"। জলাশয়ের বড়মাছ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছগুলি গ্রাস করে, এই অস্বাভাবিক অবস্থায় দুর্বল বলবান কর্তৃক সেইরূপ নির্যাতিত হইতে থাকিল। অত্যাচারে, অবিচারে অতিষ্ঠ হইয়া বাংলার জনসাধারণ অবশেষে গোপাল নামে একজন সামন্তরাজকে গৌড়ে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল; ইনিই বিখ্যাত

মাৎস্যন্যায়

পালরাজশক্তির আবির্ভাব

মাৎস্যন্যায়ের অবসান

পালরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা (৭৫০ খৃষ্টাব্দ)। গোপালের পুত্র বরেণ্য ধর্মপালদেব পিতার পরিচয়ে বলিয়াছেন :

"মাৎস্যন্যায়মপহিতুম প্রকৃতিভিঃ লক্ষ্মা করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণি।"[১]

মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া (রাজা নির্বাচন করিয়া) দিয়াছিল, নরপাল-কুল-চূড়ামণি গোপাল নামে সেই প্রসিদ্ধ রাজা……।

পাল-রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সহিত মাৎস্যন্যায়ের অবসান হয়। পালরাজগণ একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশ ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের গৌরবময় যুগে এই রাজ্য-সীমা লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[২] বাঁকুড়া বা ইহার অংশ বিশেষ যে সুবিস্তৃত পাল-রাজ্যের অন্তর্গত থাকে ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এক বিশেষ কারণে ইহা এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। পাল-রাজ বংশের তৃতীয় রাজা দেবপাল (খৃষ্টীয় নবম শতক), তাঁহার সময় কামরূপ বিজিত হয়; জয় করেন পাল সেনাপতি লাউসেন।[৩] অর্ধ-ঐতিহাসিক ধর্মমঙ্গলের কাহিনী যদি বিশ্বাস করা যায়, লাউসেন ছিলেন ময়না অথবা ময়না নগরের সামন্ত রাজা। ধর্মমঙ্গলে কথিত আছে যে কর্ণসেন যখন ইছাই ঘোষ কর্তৃক অজয় তীরস্থ ঢেকুর হইতে বিতাড়িত হইলেন, তিনি গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। ধর্মমঙ্গল এই গৌড়েশ্বরের পরিচয়ে বলিয়াছেন যে তিনি ধর্মপালের পুত্র। ধর্মপালের পুত্রের নাম উল্লেখ নাই কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে তাঁহার নাম দেবপাল। যাহা হউক, ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনুসারে গৌড়েশ্বর তাহার ভগিনী রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ময়নার অধীশ্বর করিয়া পাঠাইলেন। ইঁহাদেরই সন্তান লাউসেন, ধর্মঠাকুরের বরপুত্র। ধর্মমঙ্গলে লাউসেন এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং এই কাহিনী অনুসারে তিনি কামরূপের রাজাকে

পালযুগে বাঁকুড়া

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

(১) রাজা ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন
(২) রাজা দেবপালদেবের বাদল শিলালিপি
(৩) Ancient History of India—Vincent A. Smith.

পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমণ করেন। তিনি ধর্মঠাকুরের প্রসাদে বহু অসাধ্য সাধন করেন ও ময়নার রাজা হন।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনুসারে ময়না ছিল ধর্মঠাকুরের পুজা প্রচারের এক প্রধান কেন্দ্র। লাউসেন যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। ধর্মমঙ্গলের কথা পরে বলা হইবে।

ময়না বা ময়না নগরের অবস্থান লইয়া মতভেদ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে ময়না সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ময়নার অবস্থান রাঢ় ভূমির দক্ষিণে সমুদ্রতীরে।

ময়নাপুরের প্রাচীনত্ব

"ময়না নগরে বাটি সাগর সমীপ।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে মেদিনিপুর জিলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ময়না বা ময়নাগড় হইতেছে প্রাচীন ময়না। কিন্তু শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত ময়নাপুরই হইতেছে এই ময়না। ধর্মপুজা প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত ধর্মমঙ্গলে এক গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করেন; ময়নাপুরেই তাঁহার বংশধরগণ এতাবৎকাল বসবাস করিয়া আছেন, পাঁচটি ধর্মশীলাও এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে—যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীতল রায় ও চাঁদ রায়। এই ময়নাপুরকে কেন্দ্র করিয়া এক বিস্তৃত অঞ্চলে ধর্ম-পুজার এক অভূতপুর্ব বিকাশ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও সুসাহিত্যিক সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়ও এই মত পরিপোষণ করেন।

আমাদের মনে হয় যে এই অভিমতই যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ। বাঁকুড়ার ময়নাপুরই প্রাচীন ময়না বা ময়নানগর।

এই প্রসঙ্গে ঘনরাম চক্রবর্তীই তাঁহার ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে ময়নার ভৌগোলিক অবস্থানের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যায়। "রঞ্জাবতী বিবাহ" পালায় আছে যে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর বিবাহের পর তাঁহাদের বলা হইল "দক্ষিণে ময়নাভূমে করহ বসতি।" তারপর

ধর্মমঙ্গলে ময়না নগর

"কত কব যত গ্রাম থাকে ডানি বামে
প্রবেশে মঙ্গলকোট মোকামে মোকামে।

থাকিতে প্রহর নিশা চলিল সত্বর
দুই দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর।
স্নান পূজা করি পুনঃ করিল গমন
উড়ের গড এড়াল আমিলা উচালন।
পাড হয়ে দ্বারিকেশ্বর দিবা দুই ধামে
ময়না সমীপে এল মোকামে মোকামে।”

আবার ইন্দ মেটের ময়না যাত্রার পথ ইঙ্গিত হইয়াছে এই ভাবে :

“পিছে রাখি বর্ধমান সরাই সহর
দিগ দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর।
উড়ের গড এড়াল আমিলা উচালন
মান্দারণ রেখে ধরে ময়নার গণ।
পবণ গমনে চোর হইলা দাখিল
পার হল পরিসর পদ্মমার বিল।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে ঢেলে দিল গা
পেরুল ভবানী ভাবি ঘাটে নাই না।”

উপরের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে দ্বারকেশ্বর নদ অথবা মান্দারণ হইতে ময়নার দূরত্ব বেশী নহে। ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রূপরামের ধর্মমঙ্গলে। ‘লাউসেন চুরি’ পালায় রূপরাম বলিয়াছেন :

“ময়না চলিল সবে মায়াধর বেশে।
... ...
সত্যের গঙ্গা দামুদর না-এ পার হয়্যা
উড়ের গড় কামালপুর দক্ষিণে রাখিআ।
বন্দিআ দরিয়াপীর সমুখে সেলাম
বারাকপুর রাখে সৈয়দ মোকাম।
আসিলা মোগলমারি পশ্চাৎ করিআ
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া।
রাঙ্গামাট্যা সুরধনি সমুখে নিয়ড়
ডাহি দিগে মান্দারণ পীর ইসমাইল্যের গড়

দিবারাত্তি চলে নাঞ্চি বৈসে এক তিল
যোলক্রোশ বই হইল পত্নমার বিল।
কালিন্দী গঙ্গার তীরে দিল দরশন
তাহার দক্ষিণে দেখে ময়না ভুবন।"

ময়না নগর যে কালিন্দী নদীর উপর অবস্থিত ছিল তাহা উভয় বর্ণনায়ই পাওয়া যায়। আবার ময়না হইতে দ্বারকেশ্বরের প্রবাহ যে বেশী দূরে ছিল না তাহার উল্লেখ উভয় ধর্মমঙ্গল রচয়িতাই করিয়াছেন। ঘনরাম বলিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতীকে নির্দেশ দেন চাঁপাইয়ের ঘাটে গিয়া ধর্মপূজা করিতে:

"সংঘাত সাজিয়া সব দ্বারিকেশ্বর বেয়ে
করিবে ধর্মের পূজা চাঁপায়েতে যেয়ে।"

আবার রূপরামের "শালেভর" পালায় আছে রঞ্জাবতী কালিন্দী প্রবাহ অনুসরণ করিয়া দ্বারকেশ্বর প্রবেশ করেন ও দ্বারকেশ্বর বাহিয়া চাঁপাইয়ের ঘাটে উপস্থিত হন:

"চাপিয়া চলিল রাজ্য কালিনীর জল ॥
... ...
হরি বল্যা তরী বায় রামের মহিমা গায়
অবতার দেখিল দুকুলে।
দক্ষিণে দারিকেশ্বর দেখি বড় লাগে ডর
গায় অবতার মঙ্গলে ॥"

এই কালিন্দী বা কালিনী নদী এখন আর নাই কিন্তু ইহা যে দ্বারকেশ্বর নদের অদূরেই প্রবাহিত ছিল ও ইহাতেই মিশিত তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। রূপরাম আরও বলেন

"কালিনী বাহিল যদি দেখি দারিকেশ্বর নদী,'

অনেকে মনে করেন যে বাঁকুড়ার পূর্বাংশে দ্বারকেশ্বর নদের প্রবাহ চাঁপাই নদী বলিয়া পরিচিত ছিল। এই চাঁপাই নদীর তীর এক সময় ধর্মপূজার জন্য প্রসিদ্ধ হয়। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন "কোতুলপুরের ঈশান কোণে দ্বারকেশ্বর কূলে খননগর ও বিহার গ্রাম আছে। বিহারে কালু রায় ধর্মঠাকুর আছেন। ইহার মন্দির পুরাতন নয় কিন্তু নিকটে মাটি খুঁড়িতে গিয়া প্রাচীন মন্দিরের

যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত

চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, আশে পাশে পুরাতন ইটও পড়িয়া আছে। এইখানে চাঁপাইয়ের প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল।" রঞ্জাবতী খুব সম্ভবতঃ এইস্থানে ধর্মপূজা করেন। সুদূর তমলুকের ময়নাগড় হইতে দ্বারকেশ্বর তীরে আসিয়া "শালে ভর" দেওয়া কল্পনার বাহিরে। ময়নাপুর ধর্মমঙ্গলের ময়নানগর; সুতরাং দেখা যায় যে পাল-রাজগণের সময় এই অঞ্চল তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল ও শাসিত হইত অধীনস্থ সামন্ত দ্বারা।

অপর মান্দারণ ও শূরবংশ

বাংলায় পাল-রাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম হইতেই রাঢ় অঞ্চলে শূর-রাজবংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মনে হয় যে মাৎস্যন্যায়ের সুযোগ লইয়া এই রাজবংশ রাঢ়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পাল-রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিলেন তৃতীয় রাজা দেবপাল। তাঁহার সময় উত্তর রাঢ়ে শূররাজগণের আধিপত্য বিনষ্ট হয় ও শূররাজগণ দক্ষিণ রাঢ়ের অপর মান্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপর মান্দারণ হইতেছে পরবর্তীকালের গড় মান্দারণ। কিন্তু এই স্থানেও তাঁহারা স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিপতি ভাবে রাজত্ব করিতে পারিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ, পালরাজ দেবপাল যখন কলিঙ্গ জয় করেন, মধ্যবর্তী অপর মান্দারণের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। মনে হয় যে তাঁহারা পালরাজগণের সামন্ত হিসাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। বর্ধমানের দক্ষিণ ভাগ, ও হুগলি এবং বাঁকুড়া জিলার অংশ বিশেষ অপর মান্দারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে অপর মান্দারণের রাজ্যসীমা আরও বিস্তৃত হয় এবং ইহারই সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান, মোগলযুগের "সরকার মান্দারণ"।

ধরণীশূর

যাহা হউক, পাল-রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অপর মান্দারণের রাজা ধরণীশূর কিছু কালের জন্য উত্তর-রাঢ় পুনরধিকার করেন। পালবংশের নবম রাজা প্রথম মহিপাল ধ্বংসোন্মুখ পালশক্তির পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হন। উত্তর-রাঢ় বিজিত হয়। মনে হয় যে অপর মান্দারণের শূররাজগণ পালশক্তির সামন্ত পর্যায়ভুক্ত হন, কারণ, দেখা যায় যে মহিপালের সময় ১০২৩ খৃষ্টাব্দে চোলরাজ রাজেন্দ্র যখন বাংলা আক্রমণ করেন, অপর মান্দারণের রণশূর তাঁহাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন কিন্তু পরাস্ত হন। রাজেন্দ্র চোল দামোদর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন ও মহিপালকে

রণশূর ও রাজেন্দ্র চোল

পরাজিত করিয়া ত্রিবেণী পর্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ অধিকার করেন, কিন্তু বিজয়লব্ধ ভূখণ্ড সুসংবদ্ধ না করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

এই সুযোগে শূরবংশীয়গণ দক্ষিণ-রাঢ়ে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত হন। ইহার পর তাঁহারা একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতে থাকেন। পালরাজ রামপালদেবের (১০৭০—১১২০ খৃষ্টাব্দ) প্রশস্তি রামচরিতে বর্ণিত আছে যে, যে-সকল সামন্তরাজ রামপালকে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী কৈবর্তগণের হাত হইতে উদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অপর মান্দারণের লক্ষ্মী শূর। লক্ষ্মী শূর ভিন্নও এই অঞ্চলের আরও কয়েকজন সামন্ত নৃপতি রামপালকে সাহায্য করেন; তাঁহাদের পরিচয় রামচরিতে আছে। তাঁহারা হইতেছেন—ঢেক্করির প্রতাপ সিংহ, দণ্ডভুক্তির জয় সিংহ, কোটাটবির বীরগুণ, তেলকুপির সামন্তরাজ। ঢেক্করির অবস্থান ছিল বর্ধমান জিলার অজয় তীরে। তেলকুপি পুরুলিয়া জিলার রঘুনাথপুরের অদূরে দামোদর তীরে। দণ্ডভুক্তির পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্মী শূর

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে কোটাটবির অবস্থান ছিল সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরের পূর্বে, যদিও ভট্টশালী প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে বিষ্ণুপুরের পনর মাইল পুর্বেস্থিত কোটেশ্বর প্রাচীন কোটাটবি।

কোটাটবি রাজ্য

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজশক্তি ক্ষীণ হয়। তখন উড়িষ্যায় গঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। এই বংশের বিখ্যাত রাজা অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ পাল-শক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বাংলায় অভিযান করেন ও ভাগীরথী পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে অপর মান্দারণ সহ বাঁকুড়ার কিয়দংশ তাহার সামরিক শক্তির তীব্রতা অনুভব করে। রাজেন্দ্র চোলের ন্যায় তিনিও এই নববিজিত ভূখণ্ডের উপর কোন সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন নাই। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে বাঁকুড়ার কিয়দংশ হয় তাঁহার নিজ অধিকারে ছিল অথবা তাঁহার অধস্তন সামন্ত কর্তৃক শাসিত হইত।[১] তিনি বলেন যে রাণীবাঁধ থানায় কুমারী নদীর তীরে কতকগুলি মাটির ঢিবি খুঁড়িলে প্রাচীন ইষ্টক বাহির হইয়া পড়ে; স্থানীয় লোকদের মতে এগুলি চোড়গঙ্গের দুর্গের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। জিলার দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে

চোড়গঙ্গের বাংলা অভিযানে মান্দারণ ও বাঁকুড়া

(১) **District Gazeteer—Bankura**—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

চোড়গঙ্গের নাম এখনও সুপরিচিত। এই অঞ্চলে উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রাবল্য দেখা যায়, আর প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ চোড়গঙ্গের অভিযান অনুসরণ করিয়া এই অঞ্চলে আগমন করেন ও বসতি স্থাপন করেন।

চোড়গঙ্গের বিজয় অভিযানের পরেও অপর মান্দারণের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। বাংলার ক্ষীয়মান পালশক্তিকে অপসারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন রাজবংশ। এই রাজবংশের সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাঢ় প্রদেশে এক ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। তখন পাল রাজশক্তি অবনতির দিকে, রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে ইহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ। সেন বংশীয় বিজয় সেন এই সুযোগের অপব্যবহার করেন নাই। তিনি নিজ রাজ্যসীমা প্রসারে মন দেন ও শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপর মান্দারণের শূর বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন ও উড়িষ্যারাজ চোড়গঙ্গের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। এই ভাবে শক্তিবৃদ্ধি ও সীমান্ত নিরাপদ করিয়া তিনি তাঁহার বিজয় অভিযানে অগ্রসর হন ও দুর্বল পাল-রাজ-বংশের উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। ইহারই পর অধ্যায় হইল রাজ্যসীমা বিস্তার। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান তিনি জয় করেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপি হইতে জানা যায় যে, যে-সকল রাজাকে তিনি জয় করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন "বীর…"[১]। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন কোটাটবির বীরগুণ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে বীরগুণ পালরাজ রামপালকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিজয় সেন ও মান্দারণ

অপর মান্দারণ রাজ্য সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না, মনে হয় যে সেন বংশীয়গণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পর ইহার স্বাধীন সত্তা লোপ পায়। কোটাটবি ও অপর মান্দারণে সেন বংশীয় প্রভুত্ব স্থাপনের সহিত বাঁকুড়ার অংশ বিশেষ ইহাদের রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু সেন রাজগণের আমলের প্রবল ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন রাজ্যের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে কোন দৃঢ় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কিনা সন্দেহ।

সেন বংশের রাজ্যসীমা ও বাঁকুড়া

সেনবংশীয় শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় বাংলায় মুসলমান শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তারপর জনপদের পর জনপদ মুসলমান বিজেতার

(১) লিপির এই ভাগ অস্পষ্ট।

বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু বাঁকুড়ার উপর কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় নাই।

বাংলায় মুসলমান আক্রমণ ও বাঁকুড়া

উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণ তখনও পরাক্রান্ত। মুসলমান অভিযানের বন্যা যখন বাংলার এক এক প্রদেশ গ্রাস করিতেছিল, তখন গঙ্গবংশীয়গণ দামোদর নদের দক্ষিণ হইতে যাবতীয় ভূভাগের অধীশ্বর হইয়া দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে মুসলমান অভিযানের পথে প্রবল বাধা স্বরূপ বর্তমান ছিলেন। মনে হয় যে সেনবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই প্রদেশ পুনরধিকার করেন।

দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল উড়িষ্যা বনাম পাঠান

বাংলার প্রথম মুসলমান শাসকের সময় হইতে কয়েক শতাব্দী যাবৎ দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের ইতিহাস হইল উড়িষ্যা রাজশক্তি ও বাংলার পাঠান সুলতানের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষ। তখন অপর মান্দারণের শূরবংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বাংলার পাঠান সুলতানের নিকট অপর মান্দারণ পরিচিত গড় মান্দারণ নামে। গড় মান্দারণ ইহার সামরিক গুরুত্বপুর্ণ অবস্থানের জন্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পাঠান সুলতানগণ ইহার অধিকারকে দক্ষিণ বিজয়ের প্রথম সোপান বলিয়া মনে করিতেন ও এই কারণে ইহা নিজ অধিকারে রাখিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সুতরাং দীর্ঘ সংঘর্ষে গড় মান্দারণের উপর প্রভুত্বের বহুবার পরিবর্তন হয়, কখনও ইহা থাকে উড়িষ্যার অধীন, কখনও বা যায় মুসলমানের হাতে। দেখা যায় যে দক্ষিণ অঞ্চলে বিজয় অভিযান পরিচালনা পাঠান সুলতানগণের পক্ষে সহজ-সাধ্য হয় নাই; অন্যদিকে উড়িষ্যারাজ কয়েকবার দামোদর অতিক্রম করিয়া রাঢ় অঞ্চলের কিয়দংশ সাময়িকভাবে অধিকার করেন। সুলতান সামসউদ্দিন ইলিয়াসের সময় হইতে (ইং ১৩৪২-৫৭ সাল) উড়িষ্যার প্রভুত্ব ক্ষীণ হইতে থাকে। এই পাঠান সুলতান দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল ও মেদিনিপুর জয় করিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন ও প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন। সামসুউদ্দিনের পুত্র সিকন্দরের সময় দিল্লির সুলতান ফিরোজ শা তুগ্‌লক উড়িষ্যার জাজনগর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানের পথ ছিল বিহার হইতে পঞ্চকোট, মানভূমের শিখর ও তারপর জাজনগর। এই অভিযান বর্ণনায় মুসলমান ঐতিহাসিক (১) জাজনগর

---

(১) তবক্ত-ই-নাশিরি

রাজ্যের সীমান্তবর্তী কাটাসিন নামক যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকে মনে করেন ইহা ছিল বর্তমান বাঁকুড়ার অন্তর্গত।

যাহা হউক দেখা যায় যে বাংলায় ইলিয়াসশাহী শাসনের সময় উড়িষ্যা-পাঠান সংঘর্ষে উড়িষ্যা বিপর্যস্ত হয়। গঙ্গবংশের পর সূর্যবংশীয় রাজা কপিলেন্দ্রদেবের সময় উড়িষ্যা আবার প্রবল হয়। কপিলেন্দ্রদেব মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন ও রাঢ় পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া এক বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করেন। এই জয়ের স্মারক হিসাবে তিনি উপাধি গ্রহণ করেন "গৌড়েশ্বর"। কিন্তু ইহার পর উড়িষ্যার আবার অবনতি হয়। সুলতান রুকনুদ্দিন বরবকের সময় (ইং ১৪৫৯-৭৪ সাল) গড় মান্দারণ গজপতি নামে একজন রাজা বা সাঁমন্তের অধিকারে ছিল। তাঁহার সময় শা ইসমাইল সুফি গৌড়ের পাঠান সুলতানের পক্ষে গজপতির বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও গড় মান্দারণ অধিকার করেন। শা ইসমাইল সুফি পরবর্তীকালে একজন বিখ্যাত পীর বলিয়া পরিচিত হন ও হিন্দুমুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

দক্ষিণ দামোদরে পাঠান অভিযানের অগ্রগতি

কিন্তু মুসলমান শক্তি আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। পরবর্তীকালে সুলতান হুশেন শাহ (১৪৯৩-১৫২০) কিছুকালের জন্য গড় মান্দারণ অধিকার করিয়া উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত জয় করেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই উড়িষ্যা রাজ হরিচন্দন মুকুন্দদেব মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া দামোদরের দক্ষিণে সমগ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। পরে ইং ১৫৬৭ সালে সুলেমান কররানি এই ভূভাগ জয় করিয়া উড়িষ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হন।

ফলে বাঁকুড়ার উপর মুসলমান আক্রমণের তীব্রতা অনুভূত হয় নাই। কিন্তু জিলার অংশবিশেষের উপর উড়িষ্যার প্রভাব বলবৎ থাকে। দুই প্রবল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্তরালে বাঁকুড়া অলক্ষ্যে যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, অরণ্য প্রাকারের বাহির হইতে কেহ তাহার রূপ কল্পনা করিতে পারে নাই। বন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই রাজবংশের কাহিনী হইল প্রকৃতপক্ষে বাঁকুড়ার ইতিহাস।

বাঁকুড়া মুসলমান অভিযান মুক্ত

দ্বিতীয় স্তবক

মল্লযুগ

"দাঁড়াও ! চরণ তব সাম্রাজ্য ধুলায়,
একটি সাম্রাজ্য হেথা রয়েছে প্রোথিত।

বায়রন (Childe Harold)

প্রথম প্রভাত

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন—

"বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজবংশের ঐতিহাসিক পরিচয় সেই যুগ হইতে পাওয়া যায় যখন দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দুরাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন আর ভারতে মুসলমানের নাম শ্রুত হয় নাই। বখ্‌তিয়ার খিলজি যখন বাংলাদেশ জয় করেন তাহার পাঁচশত বৎসর পুর্ব হইতে তাঁহারা বাংলার এই প্রান্তে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। মুসলমানদের বাংলা জয়ে বিষ্ণুপুর রাজগণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। দামোদর নদের ন্যায় প্রবল জলপ্রবাহ, বহুবিস্তৃত শাল ও অন্যান্য অরণ্য ও বিষ্ণুপুর গড়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ, এই সব দ্বারা সুরক্ষিত এই অঞ্চল বাংলার উর্বর অংশের মুসলমান শাসকদের নিকট অল্পই পরিচিত ছিল। পরিচিত হইলেও তাঁহারা এই দিকে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিষ্ণুপুরের রাজগণ তাঁহাদের বিশাল রাজ্যের সর্বময় প্রভু ছিলেন। মুসলমান যুগের পরের দিকে যখন মোগল শক্তি পরাক্রান্ত হয় ও সাম্রাজ্য সুসংবদ্ধ করার প্রয়াস পায়, কদাচিৎ কোন মোগল বাহিনী বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া কর দাবী করিত। কর দিবার অঙ্গীকার সময় সময় করাও হইত কিন্তু বিষ্ণুপুরের উপর মুর্শিদাবাদের সুবেদার সেইরূপ ক্ষমতা কখনও প্রয়োগ করেন নাই যেরূপ তিনি করিতে পারিতেন বর্ধমান বা বীরভূমের রাজার উপর। বর্ধমান রাজবংশের গৌরব বৃদ্ধির সহিত বিষ্ণুপুর ম্লান হইতে থাকে; বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া ইহার এক বিশাল অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। বিষ্ণুপুরের গৌরব যাহা বা অবশিষ্ট ছিল, মারাঠা আক্রমণে তাহাও বিনষ্ট হয়।"

বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য —মল্লভূম।

বিষ্ণুপুরের রাজগণ যে ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিতেন তাহার পরিচয় "মল্লভূম" নামে। বাঁকুড়ার সদর মহকুমার কিয়দংশ এবং বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর ও ইন্দাস থানা সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত হইলেও এক সময় উত্তরে সাঁওতাল পরগনা, দক্ষিণে মেদিনিপুর জিলার অভ্যন্তর, পুর্বে বর্ধমান জিলার অংশ ও পশ্চিমে পুরুলিয়া জিলা এই চতুঃসীমাবদ্ধ অঞ্চল মল্লভূমিরই অন্তর্গত ছিল। "মল্লভূম" কথাটির অর্থ হইতেছে মল্লদের বাসভূমি। এই নামের উৎপত্তির সহিত যে কাহিনী সংযুক্ত

মল্লভূমের পরিচয়

আছে তাহা হইল বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার কাহিনী; মল্লবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাঁহার পরিচয় হয় "আদিমল্ল" নামে। "আদিমল্লের" পর কয়েক পুরুষ যাবৎ বিষ্ণুপুর রাজগণ এই মল্ল উপাধি ত্যাগ করেন নাই। ওলড্‌হাম (Oldham) সাহেব প্রমুখ মনীষীর মতে মল্লভূম কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে মল্ল বা মাল জাতি হইতে। গ্রীক

মাল জাতি

ঐতিহাসিকগণ পালিবোথরা বা পাটলিপুত্রের প্রাচী রাজ্যের পূর্বে মল্লি ও শবরী বা সুয়ারি নামে দুই সুবৃহৎ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই মল্লি বা মল্ল বা মাল জাতি অতি প্রাচীন। ওলড্‌হাম সাহেব অনুমান করেন যে একসময় এই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় পশ্চিম বাংলার প্রান্ত দেশ ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল; রাজমহল পাহাড়ের সৌরিয়া মালার, সাঁওতাল পরগনার মাল পাহাড়ি, বর্ধমান-বাঁকুড়ার মাল, ইহারা সকলেই এই বিরাট জাতি হইতে উদ্ভূত। বর্ধমান-বাঁকুড়ার

মাল ও বাগদি

বাগদি সম্প্রদায়ও এই মাল জাতি হইতে অভিন্ন। মাল ও বাগদির মধ্যে সম্বন্ধ এরূপ নিবিড় যে তাঁহারা একই হুকায় তামাক খায়, একই বংশজাত বলিয়া দাবী করে। বিষ্ণুপুর রাজকে দুই সম্প্রদায়ই নিজেদের রাজা বলিয়া স্বীকার ও মান্য করে। মালজাতিরই এক বিশাল শাখা কালক্রমে আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মূলজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও বাগদি নামে পরিচিত হয়। মল্লি বা মালজাতির বাসভূমি বলিয়া এই অঞ্চল পরিচিত হয় "মল্লভূম" নামে আর মল্লি বা মল্ল বা

মল্লরাজ

মাল জাতির রাজা অভিহিত হন "মল্লরাজ" নামে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি এইরূপ: "ক্ষত্রিয় পদবী 'সিংহ' উপাধি ধারণ করিবার পূর্বে বহু শতাব্দী যাবৎ বিষ্ণুপুর-রাজগণ আর্যেতর 'মল্ল' নামে নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন; এখন পর্যন্ত

বাগদি রাজা

তাঁহারা বাগদি রাজা বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত। ইহা ও অন্যান্য তথ্য হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে বিষ্ণুপুর-রাজবংশ বংশগত কারণে ক্ষত্রিয় নহেন, সুদীর্ঘ স্বাধীনতা ও বিগত ঐতিহ্যের কারণেই ক্ষত্রিয়।"

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মল্লরাজগণ এক বিস্তৃত অঞ্চলের প্রভু ছিলেন। তাঁহাদের গৌরবময় যুগে রাজ্যের সীমা ছিল

মল্লরাজগণের রাজ্য-সীমা ও বৈশিষ্ট্য

উত্তরে সাঁওতাল পরগনা, দক্ষিণে মেদিনিপুরের অংশ, পূর্বে বর্ধমানের অংশ ও পশ্চিমে পঞ্চকোটের প্রান্তসীমা ও ছোটনাগপুর।

এই ভূখণ্ডে বিষ্ণুপুর-রাজগণ পরিচিত ছিলেন "মল্লাবনিনাথ" অর্থাৎ মল্লভূমি বা মল্লাবনির প্রভু নামে। এই রাজবংশের এক বিশেষ কীর্তি হইল মল্লশক নামে বিষ্ণুপুরী অব্দের প্রচলন। বাংলা দেশে প্রচলিত সাল ও বিষ্ণুপুরী অব্দের মধ্যে পার্থক্য ১০১ বৎসরের। যাবতীয় উৎকীর্ণ লিপি ও রাজদপ্তরে বিষ্ণুপুর-রাজগণ এই মল্লশক ব্যবহার করিয়াছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে বা প্রান্তদেশের উপজাতির উপর ছিল তাঁহাদের অসামান্য প্রভাব। বিষ্ণুপুর-রাজগণের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁহারা যে সৈন্যবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করিতেন তাহা ছিল নিতান্ত স্বদেশীয়; দেশের সাধারণ লোক—বাগদি, ডোম, উপজাতি প্রভৃতি লইয়া গঠিত ছিল এই সৈন্যবাহিনী। ধর্মমঙ্গল রচয়িতার কথায় রাজপুত্র হইতে কুম্ভকার, সাধারণ কৃষিজীবী, কোল ও অন্যান্য তথাকথিত নিম্ন শ্রেণী লইয়া গঠিত ছিল সৈন্য-বাহিনী; পাল অথবা সেনরাজগণের সৈন্য-বাহিনীভুক্ত শক-মালব-হূণ-কণিক-কর্ণাট-লাট প্রভৃতি বিদেশীয় ভাগ্যান্বেষীর কোন স্থান মল্লরাজ-বাহিনীতে ছিল না। মল্ল-সৈন্য-বাহিনীর রূপ প্রকাশ করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ মহাশয় মল্লভূমবাসী জনৈক ধর্মমঙ্গল প্রণেতার রচনা উদ্ধৃত করিয়া।[১]

"গজপৃষ্ঠে ধাঙ ধাঙ বাজে জোড়া দামা
সাজিল ভূপতি রায় মাহুত্যার মামা।
আগে চলে বার ঘণ্টা পতাকা নিশান
ছত্রিশ হাজার ঘোড়া চলে কানে কান।
সাজিল প্রধান ঢালি বুড়া কুম্ভকার
... ...
রাম রায় চাষা সাজে সমরে প্রচণ্ড
যমকে নাশিতে পারে যুঝ্যা এক দণ্ড।
ছ বুড়ি মাদল বাজে তের পণ ঢোল
আগে ধায় বন্দুকি ধানুকি কত কোল।"

বিষ্ণুপুরের ডোম সৈন্য এক সময় বিশেষ খ্যাতি লাভ করে এবং ইহার স্মারক হিসাবে এখনও প্রচলিত আছে শিশু ছড়া

"আগ ডোম, বাগ ডোম, ঘোড়া ডোম সাজে।"

---

(১) শ্রীবিনয় ঘোষ—পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি

গ্রন্থের সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় বলেন যে ইহা ইঙ্গিত করে এক চতুরঙ্গ সৈন্য-বাহিনী যাহার সম্মুখ ভাগে ডোম সৈন্য, পার্শ্বে ডোম সৈন্য আর সঙ্গে অশ্বারোহী ডোম সৈন্য। এই ডোমসৈন্যের বীরত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতার উল্লেখ মধ্যযুগের যাবতীয় ধর্ম-মঙ্গল প্রণেতাই করিয়া গিয়াছেন।

উপজাতীয়গণ মাত্র মল্লরাজগণের নহে, সম-সাময়িক অন্যান্য বহু স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহিনীর এক প্রধান অঙ্গ ছিল। পরবর্তীকালে কোম্পানির নিকট এই রাজন্যবর্গের বশ্যতা স্বীকারের পর এই দেশীয় সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাতে যে পরিস্থিতি সৃষ্ট হয় তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

মল্লরাজগণের আত্মরক্ষামূলক তিনটি সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল। দূর সীমান্তে ছিল ঘাটোয়াল; সীমান্ত রক্ষা ভিন্নও সীমান্তে বা ইহার অপরদিকে শত্রু সৈন্যের চলাচল বা কোন বিদেশীর গমনাগমনের উপর লক্ষ্য রাখা ও এ বিষয়ে বিশেষ বার্তা অনতিবিলম্বে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া ছিল তাহাদের কর্তব্য। বিষ্ণুপুর নগরীর চতুর্দিক ব্যাপি বিশাল অরণ্য ছিল আত্মরক্ষার দ্বিতীয় ব্যবস্থা, আর সুরক্ষিত বিষ্ণুপুর দুর্গ ছিল তৃতীয়।

রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম রঘুনাথ। প্রচলিত কাহিনী তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলে: ১০২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬৯৫ সালে উত্তর ভারতের জয়নগরের রাজা তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে পুরীধামের দিকে যাত্রা করেন। তীর্থগামী পথ ছিল অরণ্যের মধ্য দিয়া। রাজার সঙ্গে ছিলেন আসন্নপ্রসবা রাজমহিষী। অরণ্যের কোন স্থানে বিশ্রামরতা অবস্থায় রাজমহিষীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয় ও তিনি এক পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। কোন কোন কাহিনীতে আছে যে রাজমহিষী যেখানে প্রসব করেন তাহা হইতেছে লাউগ্রাম, কোতুলপুর হইতে ছয় মাইল দূরে। মহিষী ও নবজাত কুমারকে সঙ্গে লইয়া তীর্থপথে অগ্রসর হওরা দুষ্কর বিধায় রাজা তাঁহাদের অরণ্যের মধ্যে ত্যাগ করিয়াই অগ্রসর হন। ইহার পরই জনৈক কুশমেটিয়া বাগদি অরণ্যে কাঠ সংগ্রহ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হয় ও নবজাত শিশুকে একা অসহায় অবস্থায় দেখে; শিশুর মাতার কোন সন্ধান মিলিল না। এই বাগদি শিশুকে নিজগৃহে লইয়া যায় ও লালন-পালন করে। তখন বালকের সুন্দর আকৃতি ও শরীরে রাজচিহ্ন দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও নিজগৃহে লইয়া যায়। বালক ক্রমে যুদ্ধ-

রাজবংশের প্রতিষ্ঠার কাহিনী

বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠে এবং মাত্র ১৫ বৎসর বয়সেই একজন প্রখ্যাত মল্লবীর বলিয়া পরিগণিত হয়। মল্লবিদ্যায় দক্ষতার জন্য পঞ্চমগড়ের রাজার দৃষ্টি পড়ে বালকের উপর এবং তিনি বালককে "আদি মল্ল" উপাধি প্রদান করেন।

আদিমল্ল

এই কাহিনীর যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই এবং ইহা যে নিতান্ত কাল্পনিক সে সম্বন্ধে কোন উক্তি নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। পণ্ডিতগণের মত এই যে, এই কাহিনীর উদ্ভব রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পর যখন মল্লরাজগণ ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীর পরিপোষক হন। বহুযুগ ধরিয়া মল্লরাজগণ সাধারণের নিকট "বাগদি রাজা" বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।

ক্রমে আদিমল্ল প্রদ্যুম্নপুর বা পদমপুরের রাজার অনুগ্রহে তাঁহার সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত হন ও পরে লাউগ্রামের রাজা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন। জট-বিহারের সামন্ত প্রতাপনারায়ণ পদমপুর-রাজকে কর প্রদান বন্ধ করায় আদিমল্ল তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া জটবিহার নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। আদিমল্ল লাউগ্রামে ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর রাজা হন পুত্র জয়মল্ল। জয়মল্লের শাসনকালে পদমপুর রাজ্য অধিকৃত হয়। কথিত আছে যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পদমপুরের রাজা পরিবারবর্গ সহ নিকটস্থ "কানাই সায়রে" আত্ম-বিসর্জন করেন। অনুমান যে জয়মল্ল পদমপুরেই রাজধানী স্থাপন করেন, কারণ, অষ্টাদশ রাজা জগৎমল্লের সময় রাজধানী পদমপুর হইতে বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত হইবার কাহিনী প্রচলিত আছে। জয়মল্ল ছিলেন একজন পরাক্রান্ত রাজা। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ইহাকে শক্তিশালী করা ছিল তাঁহার নীতি। তৎপরবর্তী রাজগণের সময় মল্লরাজ্যের আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। চতুর্থ রাজা কালুমল্ল ইন্দাসের রাজাকে জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ষষ্ঠ রাজা কানুমল্ল কাকাটিয়া রাজ্য জয় করেন; অষ্টম রাজা শূরমল্ল মেদিনিপুর জিলার বগড়ি রাজ্য স্বীয় অধিকারে আনেন। তারপর অষ্টাদশ রাজা জগৎমল্লের সময় রাজ্য সুসংবদ্ধ হয় ও ইহার উন্নতি বিধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। রাজধানী অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রস্থলে স্থানান্তরিত হয় ও ইহার নামকরণ হয় বিষ্ণুপুর। নূতন নগরীর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি

জয়মল্ল

কালুমল্ল

কানুমল্ল

শূরমল্ল

জগৎমল্ল

সাধনে এই রাজা বিশেষ তৎপর হন। প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে হাণ্টার সাহেব বলেন যে রাজা নগরী এইভাবে নির্মাণ করেন যে ইহা হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—স্বর্গের ইন্দ্রপুরী হইতেও মনোহর। নগরীর হর্ম্যরাজি ছিল বিশুদ্ধ শ্বেত পাথরের; রাজপ্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল প্রেক্ষাগৃহ, সুসজ্জিত ঘর, বাসগৃহ ও বহির্বাটি। তাহা ছাড়া ছিল হাতিশাল, সৈন্যাবাস, মালখানা, অস্ত্রাগার, কোষাগার ও দেবালয়। এই সময় বহু বণিক এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে।[১]

এই কাহিনীর মধ্যে যে অতিরঞ্জন আছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা সত্ত্বেও মনে হয় যে রাজা জগৎমল্লের সময় বিষ্ণুপুর নগরী গৌরবের স্থান অধিকার করে। জগৎমল্লের সময় ইং ১০৩৩-১০৫১ সাল।

জগৎমল্লের পর উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন ক্ষেত্রমল্ল বা রামমল্ল (ইং ১১৮৫-১২০৯ সাল)। রামমল্ল বিষ্ণুপুরকে এক প্রবল সামরিক শক্তিতে রূপান্তর করার প্রয়াসী হন। তখন দেশে মুসলমান অভিযানের জয়যাত্রা চলিতেছে; রাজ্যের পর রাজ্য মুসলমান শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। এই উদীয়মান শক্তিকে প্রতিরোধ করিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়—বিষ্ণুপুরকে এক প্রতিদ্বন্দ্বী সবল শক্তিতে পরিণত করা। রামমল্ল এই দিকে মনোনিবেশ করেন। বিষ্ণুপুর গড়ের সংস্কার ও উন্নতি বিধান হইল। কথিত আছে যে বহু প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্রও এই সময় গড়ে আমদানি করা হয়। সৈন্যবাহিনীর সংস্কার ও পুনর্ন্যাস হইল; বাহিনীর পোশাক-পরিচ্ছদ তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইল। এই সামরিক তৎপরতা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং ইহার বৈশিষ্ট্য হইল পশ্চিম সীমান্তে বিজয় অভিযান ও পুর্ব-সীমান্তে আত্মরক্ষামূলক নীতি। মল্লরাজ্যকে উদীয়মান মুসলমান শক্তির বাধাহীন সংস্পর্শে আনিবার কোন প্রয়াস হয় নাই। সমগ্র পুর্ব-প্রান্ত ব্যাপিয়া গড়িয়া ওঠে দুর্ভেদ্য অরণ্য-ব্যূহ।

রামমল্ল

রামমল্লের পর যে রাজার উল্লেখ করা যাইতে পারে তিনি হইলেন পৃথ্বিমল্ল (ইং ১২৯৫-১৩১৯)। তাঁহার সময় গড়বেতা রাজ্য বিজিত হয় আর ইহার ফলে সিমলা পাল রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চল বিষ্ণুপুর

পৃথ্বিমল্ল

(১) W. W. Hunter—Pundit's Chronicles of Rajas of Bishnupur

রাজ্যভুক্ত হয়;[১] এগুলি ইতিপুর্বে গড়বেতা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রাজা পৃথ্বিমল্ল ছিলেন শিল্প কলার পৃষ্ঠপোষক। তাহার সময় বিষ্ণুপুরের অদূরবর্তী ডিহরে দুইটি প্রসিদ্ধ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়—একটি হইল ষাঁড়েশ্বরের মন্দির অপরটি শৈলেশ্বর বা শল্লেশ্বরের।[২] শিল্পকলার প্রতি এই অনুরাগ পরবর্তী রাজগণের সময় অক্ষুণ্ণ থাকে। রাজা শিবসিংহ মল্লের সময় (১৩৭১-১৪০৭) বিষ্ণুপুর সঙ্গীত সাধনার একটি কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়। রাজা চন্দ্রমল্লের রাজত্ব কালে (ইং ১৪৬০-১৫০০) জয়পুর থানার সলদা গ্রামের গোকুল চাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে মনে করেন যে ইহাই জিলার প্রাচীনতম "বাংলা মন্দির"।

শিবসিংহ মল্ল
চন্দ্রমল্ল

এতাবৎকাল কোন মুসলমান শক্তি বিষ্ণুপুর-রাজ্য আক্রমণ করার প্রয়াস করে নাই, কর দাবী করা তো দূরের কথা। বাংলার মুসলমান শক্তির সহিত বিষ্ণুপুরের প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয় রাজা ধর হাম্বীরের সময়। ধর হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে প্রাপ্ত এক বংশ তালিকার ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন,[৩] যে ৪৬শ রাজা চন্দ্রমল্লের পর রাজা হন যথাক্রমে বীরমল্ল, ধারিমল্ল, বীর হাম্বীর, ধর বা ধারী হাম্বীর, রঘুনাথ সিং অর্থাৎ বীর হাম্বীর ধর বা ধারী হাম্বীরের পিতা। এ সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে ধর বা ধারী হাম্বীর মাত্র কিছুদিন রাজত্ব করার পর ভ্রাতা রঘুনাথ কর্তৃক অপসারিত হন। অন্য-দিকে ও' ম্যালি সাহেব (L. S. S. O'Mally), রমেশচন্দ্র দত্ত হাণ্টার সাহেবের লিখিত বিবরণী ও বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত পুরাতন পুঁথিপত্র প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যে কাহিনী লিখিয়াছেন তদনুসারে ধর বা ধারী হাম্বীর রাজা বীর হাম্বীরের পিতা। ও'ম্যালি সাহেবের কাহিনী অনুসারে ধর হাম্বীরের সময় ইং ১৫৩৯-১৫৯৫ সাল।

ধর হাম্বীর
মুসলমান শক্তির সহিত প্রথম সংস্পর্শ

---

(১) এই সব অঞ্চল বেশিদিন বিষ্ণুপুরের অধীন থাকে না মনে হয়। কিছুকাল পরেই নকুড় তুঙ্গের এই অঞ্চল বিজয়ের কথা প্রচলিত আছে।

(২) প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে মন্দির দুইটির নির্মাণকাল আরও পূর্বে—একাদশ শতাব্দীতে।

(৩) অভয়পদ মল্লিক—History of Vishnupur Raj.

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে ধর হাম্বীর বাংলার মুসলমান সুবেদারের আনুগত্য স্বীকার করেন ও বার্ষিক ১,০৭,০০০ টাকা কর প্রদানে স্বীকৃত হন। কিন্তু তাঁহারাই আবার বলেন যে এই কর প্রদান সম্পূর্ণ নির্ভর করিত রাজার ইচ্ছার উপর; ইহার অনাদায়ে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই। রাজা ধর হাম্বীরের সময় মোগল সেনাপতি তোডরমল সুবে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া যে ভূমিরাজস্ব সংস্কার প্রবর্তন করেন তাহাতে সমগ্র বাংলাদেশ উনিশটি সরকারে বা প্রদেশে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি মহল বা পরগনায় ভাগ করা হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্যকে ইহার কোনটিরই অন্তর্গত করা হয় নাই। মোগলের দৃষ্টিতে বিষ্ণুপুর তখন সাম্রাজ্যের বহির্ভূত অঞ্চল।

---

(২)

ভাস্কর মহিমায়

রাজা ধর হাম্বীরের পর রাজা হন বীর হাম্বীর (১৫৯৬-১৬২২ খৃষ্টাব্দ)। এই সময় আমরা আরও স্পষ্ট ইতিহাসের যুগে চলিয়া আসিয়াছি। রাজা ছিলেন বিচক্ষণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী। বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন সামরিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হইল তাঁহার প্রথম নীতি। বিষ্ণুপুর গড় আরও সুদৃঢ় করা হয়; দুর্গপ্রাকার কামানে সুসজ্জিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন যে রাজার অধীন ছিল ২৭টি দুর্ভেদ্য দুর্গ, ১৫টি নিজস্ব, ১২টি অধীনস্থ সামন্তগণের। পশ্চিম সীমান্তে তিনি বিষ্ণুপুরের চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করেন। পুরুলিয়ার পঞ্চকোট পাহাড়ের উপর যে পুরাতন দুর্গ আছে তাহার দুয়ার বন্ধ ও খড়িবাড়ী তোরণে "বীর হাম্বীর" নাম বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে; লিপির সময় ১৬৫৭ বা ১৬৫৯ শকাব্দ অর্থাৎ প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ বীর হাম্বীর এই দুর্গ নির্মাণ করেন ও পরে ইহা পঞ্চকোট রাজের অধিকারে আসে। আবার ইহাও সম্ভব যে দুর্গ প্রথম নির্মাণ করেন পঞ্চকোট রাজ, পরে বীর হাম্বীর ইহা জয় করিয়া স্বীয় নাম উৎকীর্ণ করেন। যাহা হউক ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পঞ্চকোটের রাজ্য সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বীর হাম্বীরের রাজ্য। বীর হাম্বীরের সহিত বাংলার মোগল সুবেদারের সংঘর্ষ হয়; কিন্তু বুদ্ধিমান রাজা দেখিলেন যে উদীয়মান মোগল শক্তির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ বরণ করা অপেক্ষা নামমাত্র কর প্রদানের স্বীকৃতিতে ইহার সহিত মৈত্রী রক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক। তিনি বার্ষিক ১৬৭০০০ টাকা কর প্রদানে স্বীকৃত হন। রাজা ও তাঁহার বংশধরগণ এই মৈত্রী রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তখন মোগল-পাঠানের সারা বাংলার উপর প্রভুত্বের দাবি মীমাংসিত হয় নাই। ইতিপূর্বে যখন দামোদর নদের উত্তর ভূখণ্ডে পাঠান-আধিপত্য স্থাপিত হয়,

বীর হাম্বীর

তাঁহার সীমান্ত নীতি

পশ্চিম সীমান্ত

পূর্ব সীমান্ত ও
উদীয়মান মোগল শক্তি

মোগলের সহিত মৈত্রী

উড়িষ্যার হিন্দু রাজগণ ইহার দক্ষিণভাগে স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। হুসেন শাহ্ যখন গৌড়ের সিংহাসনে (ইং ১৪৯৩-১৫২০ সাল), দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চল সাময়িকভাবে তাঁহার অধিকারে আসে বটে কিন্তু উড়িষ্যা-রাজ হরিচন্দন মুকুন্দদেব মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিতাড়িত করিয়া ইহা উদ্ধার করেন। ইং ১৫৬৭ সালে পাঠান সুলতান সুলেমান কররানি এই অঞ্চল জয় করিয়া উড়িষ্যা পর্যন্ত বিজয় অভিযান করেন। এ কথা পুর্বে বলা হইয়াছে।

সুলেমান কররানি যখন উড়িষ্যায় অভিযান করেন, উত্তর-ভারতে মোগল-শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সুলেমান যতদিন জীবিত ছিলেন মোগল-বাহিনী বাংলাদেশে পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইং ১৫৭০ সালে তিনি পরলোক গমন কবেন ও তাহার পরই রাজা তোডরমলের নেতৃত্বে বাংলায় মোগল-অভিযান আরম্ভ হয়। সুলেমানের পুত্র দাউদ পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দামোদর অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন, মোগল সৈন্য মেদিনিপুর পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। বাধ্য হইয়া দাউদ সন্ধি করেন ও ইহার ফলে দক্ষিণ-দামোদরের প্রায় সমগ্র অংশ মোগলের অধীনে আসে। অনুমান যে এই সময় মল্লরাজ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার ফল হইল যে পরে যখন দাউদ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, বিষ্ণুপুর আক্রান্ত হয়। কথিত আছে যে, আক্রমণ প্রতিহত হয়, শত শত নিহত সৈন্য রাখিয়া পাঠানবাহিনী পলায়ন করে। এই যুদ্ধ হয় বিষ্ণুপুরের উত্তর তোরণের বাহিরে। এই রক্তক্ষয়কারী যুদ্ধের স্মৃতিতে স্থানটি পরিচিত হয় "মুণ্ডমালার ঘাট" নামে।

পাঠান-মোগল সংঘর্ষ

যাহা হউক, দাউদ তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ক্রমে ক্রমে রাজমহল পর্যন্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ইং ১৫৭৬ সালে মোগলের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মোগলশক্তি পুনরায় দামোদর পর্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ অধিকার করে। দামোদরের দক্ষিণ ভূখণ্ড কিন্তু দাউদের পুত্র কতলু খাঁ-এর দখলে রহিয়া যায়। অবশেষে রাজা মানসিংহ এক বিরাট মোগল বাহিনী লইয়া এই অঞ্চলে অভিযান করেন। এই বাহিনীর সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া কতলু খাঁ দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চল হইতে পশ্চাদপদ হইয়া প্রথমে মেদিনিপুর ও পরে উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ

মোগল সাহায্যে বীর হাম্বীর

করেন। মোগল সৈন্য তাঁহাকে অনুসরণ করে। মোগলের এই অভিযানের সময় বীর হাম্বীর মানসিংহের সহিত যোগদান করেন। কতলু খাঁ মানসিংহের অগ্রগতি প্রতি-রোধের জন্য রায়পুরের পথে সৈন্যদল প্রেরণ করিলে, মানসিংহের পুত্র জগৎ-সিংহকে ইহার বিরুদ্ধে পাঠান হয়। পাঠানগণ সন্ধির প্রস্তাব করে; বুদ্ধিমান বীর হাম্বীর জগৎসিংহকে ইহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, কারণ, তিনি পাঠান-গণের প্রস্তাবে সন্দেহ পোষণ করিলেন। কিন্তু বীর হাম্বীরের পরামর্শ গৃহীত হয় নাই। ফলে তাহাদের অতর্কিত নৈশ আক্রমণে মোগলবাহিনী বিপন্ন হয়। জগৎসিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হন; পাঠান সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করার প্রয়াস করে কিন্তু বিশেষ এক সঙ্কটময় মুহূর্তে বীর হাম্বীর তাঁহাকে উদ্ধার করেন ও বিষ্ণুপুর দুর্গে আশ্রয় দেন। বীর হাম্বীর এই ভাবে মোগলের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলেন কিন্তু ইহার ফল হইল যে দুই বৎসর পর পাঠানগণ যখন আবার প্রবল হয় ও বীর হাম্বীর যখন তাহাদের সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন, তাহারা বিষ্ণুপুর রাজ্য লুণ্ঠন করে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি রাজ্য পাঠান-মুক্ত করিতে সমর্থ হন।

সহযোগিতা

বীর হাম্বীরের সময়কার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বিষ্ণুপুর রাজবংশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবেশ। বংশানুক্রমে এই রাজবংশ ইতিপুর্বে ছিলেন পরম শাক্ত ও শৈব। এক্তেশ্বর, ডিহর ও বাহুলাড়ার ন্যায় প্রাচীন ও বিস্ময়কর দেবালয়, মৃন্ময়ী দেবীর মন্দির ও পুজানুষ্ঠান প্রভৃতি এই রাজবংশের উক্ত ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দেয়। প্রখ্যাত মল্লেশ্বর শিব মন্দির বীর হাম্বীরের কীর্তি। মল্লেশ্বর-শিব মন্দিরের নির্মাণকাল মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় ৯২৮ মল্লাব্দ বা ইং ১৬২২ সাল, বীর হাম্বীরের রাজত্বের শেষ বৎসর। লিপিতে কিন্তু নির্মাতার নাম উল্লেখ আছে বীরসিংহ:

মল্লরাজগণের আদি ধর্মবিশ্বাস—শৈব ও শাক্ত

মল্লেশ্বর

"বসুকর নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেণ
অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু।

কিন্তু বীরসিংহ বা বীরসিং হইতেছেন বীর হাম্বীরের উত্তরাধিকারী রাজা রঘুনাথ সিংএর পুত্র। তিনি সিংহাসন লাভ করেন ৯৬২ মল্ল শকে অর্থাৎ ইং ১৬৫৭ সালে। ৯২৮ মল্লাব্দে তিনি এই মন্দির নির্মাণ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে বীর হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিং প্রথম ক্ষত্রিয়-বাচক "সিংহ" পদবী গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরের বহু দেবালয় তাঁহার সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। মল্লেশ্বর শিব মন্দিরের নির্মাণকার্য বীর হাম্বীরের সময় আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর তাঁহার যে ভাবান্তর হয়, তাহাতে নির্মাণকার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান। রঘুনাথ এই অসম্পূর্ণ কাজ সমাধান করেন ও মন্দিরগাত্রের লিপি উৎকীর্ণ করার সময় "বীরের" সহিত নূতন "সিংহ" উপাধি যোগ করেন।

বীর হাম্বীব বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন, তাঁহার দীক্ষাগুরু বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস। এই সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।[১] বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি গুরু প্রণামী হিসাবে বহু ভূমি ও ধন দান কবেন।

রাজবংশে বৈষ্ণব ধর্ম

ক্রমে তিনি হইলেন একজন পরম বৈষ্ণব। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকরে যে সকল বৈষ্ণবগীতি স্থান পাইয়াছে তাহাব দুইটি বীর হাম্বীরের রচনা বলিয়া খ্যাত। বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরে সর্বপ্রথম মদনমোহনের পুজা প্রবর্তিত করেন বলিয়া কথিত আছে।[২] মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে উল্লেখ আছে যে পুর্বে মদনমোহন এক ব্রাহ্মণের গৃহে পুজিত হইতেন

"বিষ্ণুপুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে
পুর্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে।"

মদনমোহনের মন্দির কিন্তু নির্মিত হয় রাজা বীরসিং-এর পুত্র দুর্জন সিং-এব সময়।

"শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদাম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে
মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে মাসেশুচৌ নির্মলে
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিবমিদং সার্ধ্যং স্বচেতোহলিনা
শ্রীমদ্দুর্জনসিংহ ভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা।"

মল্লেশ্বর ভিন্ন আর দুইটি মন্দিরেব নির্মাণকার্য বীর হাম্বীরকে আরোপ করা হয়, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ ও সাবরাকোণের রামকৃষ্ণ মন্দির।

---

(১) "সংস্কৃতি" ভাগ দ্রষ্টব্য

(২) অনেকে মনে করেন যে বীর হাম্বীর বৃষভানুপুর হইতে মদনমোহনকে চুরি করিয়া আনেন। কিছুকাল পূর্বেও বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবগণ "মদনমোহনের বন্দনা" গানে বীর হাম্বীরকে "মদনমোহনচোর" বলিয়া উল্লেখ করিত। ভক্তি রত্নাকরে বীর হাম্বীরের যে দুইটি গান পাওয়া যায় তাহাতে মদনমোহনের নাম নাই।

বীর হাম্বীরের পরবর্তী রাজা হন রঘুনাথ (ইং ১৬২৩-১৬৫৬)। মল্লরাজ-বংশে তিনিই প্রথম "সিংহ" বা "সিং" পদবী গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ: রঘুনাথ নবাব সেরেস্তায় ধার্য কর দিতে অবহেলা করেন। নবাব তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ নবাবের আমন্ত্রণে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে সেখানে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই অবস্থায় তিনি একদিন লক্ষ্য করেন যে, নবাবের এক দুরন্ত অশ্বকে ষোলজন সৈন্য লইয়া যাইতেছে নদীতে স্নান করাইবার জন্য। মাত্র একটি অশ্বের জন্য এতগুলি সৈন্যের প্রয়োজন দেখিয়া রঘুনাথ অবজ্ঞার ভাব দেখান। তাহাতে নবাব রঘুনাথকে নিজে অশ্ব পরিচালনার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। রঘুনাথ অবলীলাক্রমে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আট দিনের পথ মাত্র নয় ঘণ্টায় সমাপ্ত করিয়া নবাবের বিস্ময় সৃষ্টি করেন। মুগ্ধ হইয়া নবাব তাঁহাকে মুক্তি দান করেন ও শৌর্যের জন্য তাঁহাকে "সিংহ" উপাধিতে ভূষিত করেন। মতান্তরে, উপাধি দান করেন সুলতান শা সুজা, তখন রাজমহলে। বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি রঘুনাথকে রাজমহলে আমন্ত্রণ করেন ও পরে তাঁহার বীরত্বে মোহিত হইয়া এই উপাধি দেন। কথিত আছে যে কমলাকান্ত সার্বভৌম নামে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাস্য দেবীর অনুগ্রহেই রঘুনাথ নবাবের নিকট হইতে এই সম্মান লাভ করেন। তিনি কমলাকান্তকে বিষ্ণুপুর আনয়ন করেন ও ব্রহ্মোত্তরাদি দান করেন। এই কমলাকান্তই বিষ্ণুপুরের বারেন্দ্র বংশের পূর্বপুরুষ।

রঘুনাথ সিং

যাহা হউক, মল্লরাজগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বাচক এই সিংহ বা সিং উপাধি এই প্রথম। কাহিনীর মধ্যে যে কি পরিমাণে সত্য নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। দেখা যায় যে ইং ১৬৫৮ সালের পুর্বে বিষ্ণুপুর রাজ্যকে প্রত্যক্ষ মোগল শাসন গণ্ডির অন্তর্ভূক্ত করার কোন প্রয়াস হয় নাই। এই বৎসর সুলতান সুজা ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের উন্নতির জন্য যে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহাতে বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, চন্দ্রকোণা ও আরও কয়েকটি সীমান্তবর্তী করদ রাজ্য বাবদ দেয় পেশকুশ বা নির্ধারিত কর ধার্য হয় ৫৯,১৪৬ টাকা। এই সকল সীমান্ত অঞ্চল লইয়া একটি নূতন রাজস্ব-ভুক্তি বা সরকার গঠিত হয়, নাম হয় সরকার পেশকুশ। ইহাতে ছিল বিষ্ণুপুর রাজ্য সহ পাঁচটি মহল বা পরগনা।

সুলতান সুজা খাঁ ও বিষ্ণুপুর

ইতিপূর্বে সুলতান সুজা খাঁ বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া যে ভাবে নিগৃহীত হন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন পরবর্তী কালের কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্নর হলওয়েল সাহেব। হলওয়েল সাহেব বলেন যে মোগল বাহিনী যখন বিষ্ণুপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, নদীর বাঁধ কাটিয়া প্লাবন জলে তাহাদের ধ্বংস সাধন করা হয়। হলওয়েল সাহেব বিষ্ণুপুর রাজ্য সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহার উল্লেখ পরে করা হইয়াছে।

রঘুনাথ সিং-এর সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্টি ও উন্নতির মাপকাঠিতে বিষ্ণুপুর রাজবংশের সর্বোচ্চ গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ও তৎপরবর্তী রাজগণের সময় বিষ্ণুপুরের ভাস্কর্য শিল্প চরম উন্নতি লাভ করে ও ইহার অভিব্যক্তি হয় অভিনব স্থাপত্য কলায়। সাহিত্য, সঙ্গীত, পূর্তকার্য প্রভৃতিতেও এই যুগ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, ইহা পর-অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

বিষ্ণুপুরের গৌরবময় যুগের সূচনা

রঘুনাথ সিং-এর পরবর্তী রাজা হইলেন বীর সিং (ইং ১৬৫৭-১৬৯৪)। তাঁহার সময় বিষ্ণুপুরের বর্তমান দুর্গ নির্মিত হয়। বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়। রাজা বীর সিং কয়েকটি সুবৃহৎ বাঁধ বা জলাশয় প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুব ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে যে সকল বিরাট জলাশয় এখনও সাধারণের বিস্ময় সৃষ্টি করে, ইহাদের মধ্যে যমুনা বাঁধ, লাল বাঁধ, পোকা বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, গাঁতাত বাঁধ এই রাজার কীর্তি। গঠনমূলক কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এই রাজা অধীনস্থ সামন্তগণের উপর শাসনদণ্ড শিথিল করেন নাই। মালিয়ারার রাজা মণিরাম অধ্যুর্য প্রজা পীড়ন করেন এই সংবাদে বীর সিং সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে দমন করেন।

বীর সিং

রাজা বীর সিং সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী হইতে জানা যায় যে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। রাজপরিবারের অনেককে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁহার অত্যাচার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সিং তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করা হয়। নিজ পুত্রদের উপর কোন কারণে বিরূপ হওয়ায় তিনি তাঁহাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। রাজার আদেশে সকলকেই হত্যা করা হয় কিন্তু অনুচরবর্গের সহায়তায় দুর্জন সিং রক্ষা পান।

কথিত আছে যে বীর সিং অপরাধীগণকে জীবন্ত অবস্থায় প্রাচীরে গাঁথিয়া মারিতেন। এইসব সত্ত্বেও এই রাজা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে অনুরক্ত। কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁহার শিবমঙ্গলে গাহিয়াছেন

"বীর সিংহ মহারাজা অবনিতে মহাতেজা
সদা মতি ইষ্টের চরণে
সংকীর্তন অভিলাষী তাঁহার দেশেতে বসি
দ্বিজ কবিচন্দ্র রস ভনে।"

দুর্জন সিং

বীর সিং-এর পর রাজা হন দুর্জন সিং। তাঁহার সময় মদনমোহনের মন্দির নির্মিত হয়। তৎপরবর্তী রাজা হইতেছেন দ্বিতীয় রঘুনাথ সিং। তাঁহার সময় বিষ্ণুপুরের সীমান্তবর্তী চেতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ রহিম খাঁ নামে একজন পাঠান সেনানীর সহায়তায় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয় ও বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায়কে পরাজিত ও নিহত করে। রাজপরিবারের সকলেই বন্দী হন, মাত্র জগৎরাম পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। জগৎরামের প্রার্থনামত বাংলার সুবেদার তাঁহার সাহায্যের জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করেন; এদিকে মোগল বাদশাহ ঔরংগজেবও তাঁহার পৌত্র আজিম-উ-শানকে বিদ্রোহ দমনে বর্ধমান প্রেরণ করেন। রঘুনাথ সিং পূর্বাচরিত নীতি অনুসরণ করিয়া মোগলের সাহায্যে অগ্রসর হন ও শোভা সিংহের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া চেতুয়া লুণ্ঠন করেন। কথিত আছে যে এই সময় তিনি বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন, শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করিয়া বিষ্ণুপুর লইয়া আসেন ও পরে তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করেন। চেতুয়ায় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল বিশালাক্ষী দেবীর স্বর্ণ মূর্তি। এই মূর্তি বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে স্থান পায় এবং এখনও দুর্গাপূজার সময় পূজিত হয়।

দ্বিতীয় রঘুনাথ

লালবাই-এর কাহিনী

চেতুয়া জয়ের সহিত আর এক কাহিনী জড়িত আছে—লালবাইএর কাহিনী। শোভা সিংহের প্রাসাদে যাঁহারা বন্দী হন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন এই মুসলমান রমণী। কেহ কেহ বলেন যে লালবাই ছিলেন রহিম খাঁ-এর পত্নী। লালবাই ছিলেন রূপেগুণে অদ্বিতীয়া। রঘুনাথ শীঘ্রই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। অনুরাগ

ক্রমে পরিণত হয় গভীর প্রেমে। লালবাই-এর জন্য পৃথক প্রাসাদ ও প্রমোদ-কানন সৃষ্ট হইল। তাঁহার আসক্তির বশীভূত হইয়া রাজা কর্তব্য কার্যে হইলেন উদাসীন। কথিত আছে যে লালবাই-এর প্রভাবে রাজা তাঁহার অমাত্যগণকে মুসলমানি খানায় আপ্যায়িত করার সিদ্ধান্ত করেন। তদনুযায়ী ব্যবস্থাও হয়। রাজার এই অ-হিন্দু ও অ-বৈষ্ণবোচিত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজমহিষী তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। ফলে রঘুনাথ নিহত হন। হত্যাকাণ্ডে যাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন গোপাল সিং—যিনি পরে রাজা হন। লালবাইকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বাঁধের জলে নিক্ষেপ করা হয়, রাজ মহিষী সতী হন।

দ্বিতীয় রঘুনাথ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময় সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ দিল্লি হইতে বিষ্ণুপুর আগমন করেন ও বহু শিষ্য রাখিয়া যান।

সপ্তদশ শতাব্দী যখন শেষ হয়, বিষ্ণুপুর রাজবংশ গৌরবের চরমশিখরে।

গৌরবের চরমশিখরে বিষ্ণুপুর

মুসলমান শক্তির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের বাহিরে ছিল তাঁহাদের অধিকার। প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রভু হিসাবে তাঁহারা এইরূপ সম্মানভাজন ছিলেন যে বাংলার নবাব তাঁহাদেরকে মিত্রশক্তি হিসাবেই মনে করিতেন। যদিও নবাব সেরেস্তায় তাঁহারা কর প্রদান করিতেন, নিজ রাজ্যবিষয়ে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে নবাব মুরশেদকুলি খাঁ যখন কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনে অগ্রসর হন, মাত্র দুইজন রাজা তাঁহার স্বৈরাচারী শাসন-বিধান হইতে বাদ পড়েন, একজন হইলেন বিষ্ণুপুরের রাজা, অন্যজন বীরভূমের রাজা। বিষ্ণুপুরের রাজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহার রাজ্যের প্রাকৃতিক অবস্থানই তাঁহাকে নিরাপত্তা দিয়াছিল। রাজ্য ছিল অরণ্যবহুল, ঝাড়খণ্ডের পর্বতমালার সন্নিকট। কোন বহিঃশক্তি দ্বারা রাজ্য আক্রান্ত হইলে রাজা পাহাড ও অরণ্যের দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইতেন ও সেখান হইতে শত্রুর প্রত্যাগমন পথে বিপদের সৃষ্টি করিতেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আরও বলেন যে বিষ্ণুপুর-রাজ নবাব দরবারে উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ মানেন নাই, এই নির্দেশ তাঁহার বিরুদ্ধে বলবৎ করাও হয় নাই। মুর্শিদাবাদস্থিত প্রতিনিধি মাধ্যমে ধার্যকর প্রদান করিয়া তিনি নিজ রাজ্য পরিত্যাগ না করার অনুমতি পান।

পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ গবর্নর হলওয়েল সাহেব রাজা গোপাল সিং-এর সময়কার বিষ্ণুপুর রাজ্যের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহার অধিকাংশই তৎপূর্ববর্তী মল্ল-শাসনের চিত্র। রাজা গোপাল সিং-এর সময় ইহা বিলীন হইতেছিল। হলওয়েল সাহেব বলেন—"বর্ধমানের পশ্চিমে রাজা গোপাল সিং-এর বংশের রাজ্য। সুষ্ঠু প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক দিয়া সারা হিন্দুস্থানে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রধান স্বাধীন রাজা। দেশ জল-নিমজ্জিত করিয়া বিপক্ষের যে কোন সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা তাঁহার সবসময় আছে, যেমন ঘটিয়াছিল সুজা খাঁ-এর রাজত্বের প্রারম্ভে; তখন তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিতে একদল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী পাঠান হয় আর বাহিনীকে দেশের দূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কোন বাধা না দিয়া নদীর বাঁধ কাটিয়া তিনি তাহাদের ধ্বংস করেন। প্রকৃত পক্ষে মোগল বাদশাহ বা সুবেদারের প্রভুত্ব স্বীকার তিনি করিতেন না।…প্রাচীন হিন্দু-রাজের সৌন্দর্য, বিশুদ্ধতা, নিয়মানুবর্তিতা, ন্যায় পরায়ণতা ও কাঠিন্যের নিদর্শন যদি কোথায়ও থাকে তবে তাহা এখানেই। এখানে ধনসম্পত্তি বা মানুষের স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; দস্যুবৃত্তির কথা এখানে শোনা যায় না। যদি কোন পর্যটক বাণিজ্য দ্রব্যাদিসহ বা ইহা ছাড়াই এই রাজ্যে প্রবেশ করে, সরকার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পথ প্রদর্শনের জন্য বিনা ব্যয়ে রক্ষীদল মোতায়েন করা হয়[১]। তাহারা পর্যটকের নিজের ও সঙ্গের দ্রব্যাদির নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকে। পথে খাদ্য, যানবাহন বা অবস্থানের জন্য পর্যটকের কোন ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। এদেশে যদি কিছু হারায়, যেমন একথলি মুদ্রা বা অন্যকোন মূল্যবান দ্রব্য, আর ইহা যদি কাহারও হস্তগত হয়, সেই ব্যক্তি নিকটস্থ বৃক্ষে তাহা ঝুলাইয়া রাখে ও নিকটবর্তী চৌকিতে সংবাদ দেয়। চৌকির অধিনায়ক এই সংবাদ ঢোলসহরতে প্রকাশ করিতে আদেশ দেয়। এই অঞ্চলে প্রায় ৩৬০টি বিশালকায় মন্দির আছে, রাজা বা তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ইহাদের নির্মাতা।

হলওয়েল সাহেবের উক্তি

"গোজাতি এখানে এতদূর সম্মানিত যে যদি আকস্মিক কারণে ইহার কোনটির মৃত্যু হয় তবে যে নগর বা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে তাহার যাবতীয় নরনারী তিনদিন অশৌচ পালন ও উপবাস করে এবং

(১) সম্ভবতঃ এখানে ঘাটোয়ালদের কথা বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করে। বিষ্ণুপুর প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রও বটে।”

কোম্পানির আমলের জেমস্ গ্রাণ্ট (James Grant) নামে একজন সাহেব অনুরূপ বলিয়াছেন। গ্রাণ্ট সাহেব সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট নামেই অধিকতর পরিচিত। তাঁহার "Analysis of Finances of Bengal" বা “বাংলাদেশের রাজস্ববিধির প্রকৃতি বিশ্লেষণ” নামীয় রচনায় তিনি বলেন :

গ্রাণ্ট সাহেবের মত

“বিষ্ণুপুরের ছোট রাজারা প্রায় ১১০০ শত বৎসর পূর্বে এই অঞ্চল জয় করেন বলিয়া পরিচয় দেন। বিশদ এবং সঠিক নাম ও সময় সম্বলিত এক বংশ-তালিকাও তাহারা উপস্থিত করেন এবং ইহাতে রাজবংশের বর্তমান প্রতিনিধি পর্যন্ত পুরুষ পরম্পরায় এক অক্ষুণ্ণ বংশধারার সন্ধান পাওয়া যায়।...এই জমিদার-বংশ যে প্রাচীনত্বের দাবী করেন তাহার পিছনে যথেষ্ট সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, যে-সময়ের কথা হইয়াছে তখন অদূরবর্তী উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের পার্বতীয় অধিবাসীর ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রধানতঃ চোয়াড় বা দস্যুজাতীয় সম্পূর্ণ অসভ্যজাতির আবাসভূমি বাংলাদেশের এই প্রান্তে রাজবিপ্লব হয় এবং ইহারই পর প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন ও নূতন রাজ-শাসন। অধিবাসীগণ এখনও অসভ্য ; যদিও ইহারা বর্তমানে হিন্দু-ধর্মের রক্তক্ষয়-বিরোধী সনাতন ভাবধারা প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছে, ইহারা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত যাহা এখনও স্বীয় ইষ্টদেবী ভবানী বা কালীর নিকট নরবলি দিয়া এক অসভ্যপ্রথা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। হলওয়েল সাহেব ও তাঁহার পর আবে রেনাল (Abbe Reynal) এক আদর্শবাদী ও সুষ্ঠু শাসনপ্রথার অধীনে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সরলতা ও নির্মল চরিত্র সম্বন্ধে চিত্তবিনোদনকারী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই শেষোক্ত লেখক সত্য-যুগের কাহিনী-পরিচায়ক এইরূপ কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।...এই অঞ্চল আমাদের অধিকারে আসার পর ইহার সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে এই চারিত্রিক অঙ্কন কল্পনা-রসিক লেখকের সৃষ্টি ; মানুষকে আনন্দ-দানের পরিকল্পনায় বিভ্রান্ত মনের কাল্পনিক চিত্র। প্রকৃতপক্ষে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই অঞ্চল দস্যু তস্করের বাসভূমি বলিয়া সারা বাংলায় কুখ্যাত ছিল...যাহা এখনও আছে।”

গ্রান্ট সাহেবের এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে এবং সম্ভবতঃ তিনি ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিষ্ণুপুর রাজ্যে যে চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। পরন্তু তৎপূর্ববর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণী বা সম-সাময়িক সাহিত্য ও কাব্যে বিষ্ণুপুরের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত হলওয়েল সাহেবের বর্ণনার সামঞ্জস্য আছে। প্রশাসন যদি সুষ্ঠুভাবে ও প্রজার হিতার্থে পরিচালিত হয়, শাসকের উপর শাসিতের যদি সম্পূর্ণ আস্থা থাকে, হলওয়েল সাহেব বর্ণিত ধন সম্পত্তির নিরাপত্তা বাস্তবিকই সম্ভব হয়, যেমন হইয়াছিল শের সাহের সময়। তারপর বিবেচনা করিতে হইবে মল্লরাজগণের ব্যক্তিত্ব, যাহা জাতি উপজাতি নির্বিশেষে সর্বসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

এই বিষয়ে মন্তব্য

---

(৩)

"দিন শেষ, অপরাহ্ণ
সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম পাদ হইতে বিষ্ণুপুরের গৌরব ম্লান হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে যে সকল রাজা বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরূঢ় হন তাঁহারা পরমধার্মিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন; কিন্তু তাঁহারা ছিলেন বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত। রাজ্যশাসন অপেক্ষা ধর্মাচরণের দিকেই তাঁহাদের অধিকতর মনোনিবেশ থাকায় বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন সমরশক্তি অবলুপ্ত হয়।

বৈষ্ণব অনুশাসন ও প্রতিক্রিয়া
সামরিক শক্তির অবলোপ

ইং ১৭২২ সালে বাংলার নবাব জাফরআলি খাঁ বা মুরশেদকুলি খাঁ রাজস্বশাসন-ভিত্তির অধিকতর উন্নতি ও ইহা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তোডরমল পরিকল্পিত "সরকার" ব্যবস্থার স্থলে "চাকলা"র প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট হয় চাকলা বর্ধমান। বর্তমানের বর্ধমান জিলা ছাড়াও বীরভূম, হুগলি ও হাওড়া জিলার অংশ সহ বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্য চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমগ্র চাকলা বর্ধমান বাবদ রাজস্ব পরিমিত হয় ২২,৪৪,৮১২ টাকা; তন্মধ্যে বিষ্ণুপুর বাবদ দেয় রাজস্ব ধার্য হয় ১,২৯,৮০৩ টাকা। রাজা গোপাল সিং-এর রাজত্বের (ইং ১৭৩০-১৭৪৫) প্রারম্ভে এই নূতন রাজস্ব কার্যকরী করা হয় এবং এই পরম বৈষ্ণব রাজার পক্ষ হইতে যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। এতাবৎকাল মুসলমান শাসকবর্গের সহিত বিষ্ণুপুর রাজের কর প্রদানের চুক্তি বলবৎ থাকিলেও এবিষয়ে কোন বিধিবদ্ধ প্রণালী ছিল না; করের পরিমাণও ছিল কম। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে নবাব মুরশেদকুলি খাঁ বিষ্ণুপুর রাজকে করপ্রদানের জন্য কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা তাঁহার উপর কোন অশোভন আচরণ করেন নাই। কিন্তু নবাব সেরেস্তায় তখন বিষ্ণুপুর-রাজের স্থান হইল কোন করদায়ক মিত্রশক্তি হিসাবে নহে; পরগনা বিষ্ণুপুরের রাজা বা জমিদার হিসাবে।

মোগলের নয়া রাজস্ব বিধান
ও পরগনা বিষ্ণুপুর

রাজা গোপাল সিং

এই পরম ধার্মিক রাজা সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে যে তিনি যাবতীয় প্রজাগণকে ধর্মপথে চালিত করার জন্য আদেশ বাহির করেন যে মল্লভূমের প্রত্যেক অধিবাসী প্রত্যহ সন্ধ্যায় মালাজপ ও হরিনাম কীর্তন করিবে। জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এই আদেশ মানিয়া লইয়াছিল কিনা সন্দেহ, কারণ, এখনও ইহা "গোপাল সিং-এর বেগার" নামে তাচ্ছল্য ও পরিহাসের বিষয় হইয়া আছে। গোপাল সিং ও তৎপরবর্তী মল্লরাজগণের এই ধর্মোন্মাদনার আতিশয্য যে কি ফলপ্রসব করে, ইতিহাস তাহা প্রকাশ করে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনন্যসাধারণ অনুরাগ, ধর্মপরায়ণতা, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দান একদিকে যেমন রাজা গোপাল সিংকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল, অন্যদিকে আবার শাসনকার্যে শিথিলতা, সামরিক বাহিনী অবহেলা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা বিষ্ণুপুর রাজ্যকে দুর্বল ও অসহায় করিয়া তুলিল। এই সুযোগে বর্ধমানের মহারাজা বিষ্ণুপুরের ফতেপুর মহল দখল করেন।

মারাঠা আক্রমণ বা বরগির হাঙ্গামা

ইতিমধ্যে পশ্চিম দিগন্তে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হইতেছিল। ইহা ক্রমে ক্রমে পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া বাংলার পশ্চিম প্রান্তে যে দুর্গতি ও বিপর্যয় আনয়ন করে, ইতিহাসে তাহা "বরগির হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। এই "হাঙ্গামা" জনসাধারণকে এইরূপ ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে যে বহুকাল যাবৎ ইহার কাহিনী বিরাট দুঃস্বপ্নের ন্যায় তাহাদের স্মৃতিতে বিজড়িত থাকে। এই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি এখনও বহন করে শিশুভুলান ছড়া :

"ছেলে ঘুমাল
পাড়া জুড়াল
বরগি এল দেশে।"

ইং ১৭৪১ সালে মারাঠা অধিনায়ক রঘুজি ভোঁসলের অধীন চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য বাংলা ও উড়িষ্যার পশ্চিম প্রান্ত বিপর্যস্ত করে। এই মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল "বরগি" নামে। পঞ্চকোট বিধ্বস্ত ও অতিক্রম করিয়া ইহাদের অভিযান হয় বিষ্ণুপুর অভিমুখে। দুর্বল রাজশক্তির নিকট কোন বাধা না পাইয়া মারাঠা সৈন্য বিষ্ণুপুরের তোরণে উপস্থিত হয়। রাজা গোপাল সিং দুর্গতোরণ রুদ্ধ করেন ও নাগরিকগণকে লইয়া দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবরোধকারী মারাঠা সৈন্যের

গোপাল সিং-এর অহিংস নীতি

বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া তিনি নাগরিকগণকে সমবেতভাবে ভগবানের নাম কীর্তন করিতে আদেশ দেন যাহাতে বিষ্ণুপুর রক্ষা পায়। কথিত আছে যে ভগবানের নিকট এই নিবেদন ব্যর্থ হয় নাই, কারণ, ইষ্টদেব মদন মোহন স্বয়ং দুর্গপ্রাকার হইতে কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া মারাঠা বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। মারাঠা সৈন্য পলায়ন করে ও বিষ্ণুপুর রক্ষা পায়।

দুর্গ অধিকার ও ধনরত্ন অপহরণে অপারগ হইয়া মারাঠাগণ দেশের অরক্ষিত অঞ্চলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে রিয়াজ-স-সালাটিন বলেন :

"সন্নিহিত অঞ্চলের পল্লী ও নগর ধ্বংস ও বহু লোককে হত্যা বা বন্দী করিতে করিতে তাহারা ধানের গোলায় আগুন লাগাইল ; শস্যক্ষেত্রে উর্বরতার চিহ্ন রাখিল না। তারপর যখন মজুত শস্য ও শস্যাগার নিশ্চিহ্ন হইল, বাহির হইতে খাদ্য আমদানির পথও রুদ্ধ হইল, লোকে অনশন-মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষার জন্য গাছের মূল খাইতে আরম্ভ করিল। ইহাও ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইল। প্রাতে কিম্বা রাত্রিতে আহারের জন্য কিছুই রহিল না।...আকবরনগর (রাজমহল) হইতে মেদিনিপুব পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চল ও জলেশ্বর মারাঠা সৈন্যের অধিকারে আসিল। এই নরহন্তা দস্যুদল বহুলোককে কান, নাক বা হাত কাটিয়া নদীর জলে নিমজ্জিত করিয়া মারিত, আবার বহুলোকের মুখে ময়লাভর্তি বস্তা বাঁধিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিত।"

মারাঠা অত্যাচাবের বিবরণ

ইং ১৭৪২ সালে নবাব আলিবরদি খাঁ মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে কাটোয়ার নিকট যুদ্ধে পরাজিত করেন। ভাস্কর পণ্ডিত পঞ্চকোট অভিমুখে পলায়ন করেন কিন্তু পাহাড় সঙ্কুল অরণ্যময় পথে পথভ্রষ্ট হইয়া বিষ্ণুপুরে ফিরিয়া আসেন ও চন্দ্রকোনার পথে মেদিনিপুরের সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তারপর মারাঠা অভিযান কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পথে বিভিন্নরূপে অব্যাহত থাকে। একদিকে প্রতিহত হইয়া তাহারা অন্যদিকে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল। হাণ্টার সাহেবের বর্ণনায়[১] :

ভাস্কর পণ্ডিত

মারাঠা অভিযান অব্যাহত হইবার বিবরণ

(১) A. W. Hunter—Annals of Rural Bengal

"বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য সীমান্তের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। মুসলমান আমলে কোন পরিবার দরবার হইতে যত দূরে থাকিত ও সীমান্তের যত নিকটে থাকিত তত পরিমাণে নিরাপদ বোধ করিত। কিন্তু এখন নিরাপত্তা মাত্র দেশের কেন্দ্রস্থলেই মিলিত। সীমান্তবর্তী বীরভূম ও বিষ্ণুপুর রাজ্যের উপর মারাঠা আক্রমণের তীব্রতা সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয়। বলপ্রয়োগে কর আদায় প্রভৃতিতে যে সকল সীমান্তস্থিত রাজবংশ এক সময় শক্তিশালী ছিলেন তাঁহারা দারিদ্র্যের পর্যায়ে নামিয়া আসিলেন। দেশের কৃষক মারাঠা সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ হওয়ায় প্রজাগণ দেশত্যাগ করিল। বর্ধমান ছিল দেশের আরও অভ্যন্তরে; ইহার নিম্নভূমি ও নদনদী পরিবেষ্টিত অঞ্চল মারাঠা অশ্বারোহীকে বিশেষ প্রলোভিত করে নাই কিন্তু বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের শুষ্ক মাটি ও অসমতল ভূখণ্ড এই সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক ছিল সুতরাং এই সীমান্ত রাজ্য লুণ্ঠনে তাহার যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা গ্রামের পর গ্রাম সম্পূর্ণ ভাবে লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া চলিল।"

চৈতন্য সিং

এই অবস্থায় রাজা গোপাল সিং পরলোক গমন করেন ও তাঁহার স্থলে রাজা হন চৈতন্য সিং।

পরপর মারাঠা আক্রমণে ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধ নবাব আলিবরদি খাঁ ইং ১৭৫১ সালে মারাঠার সহিত সন্ধি করেন। সন্ধির চুক্তি অনুসারে তিনি কটকের

বরগির সহিত নবাবের সন্ধি

উপর প্রভুত্ব ত্যাগ করেন ও মারাঠাগণকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন। সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি কিছু পরিমাণে ফিরিয়া আসে কিন্তু রাজা চৈতন্য সিং ইহার সদ্ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। গোপাল সিং-এর ন্যায় তিনিও ছিলেন

শাসনকার্যে চৈতন্য সিং-এর অক্ষমতা

ধর্মপরায়ণ পরম ভাগবত বৈষ্ণব। কিন্তু বিষ্ণুপুরের তৎকালীন নিদারুন অবস্থার প্রতিকারে তিনি ছিলেন উদাসীন। রাজ্যশাসনে তিনি ছিলেন অপারগ। ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম আলাপনে কিম্বা ভগবৎ চিন্তায় তিনি সময় অতিবাহিত করিতেন। ধর্মার্থে তাঁহার দানও ছিল প্রচুর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দানের পরিমাণ এইরূপ বিস্তৃতি লাভ করে যে যদি কোন ব্রাহ্মণ রাজা চৈতন্য সিং-এর ব্রহ্মোত্তর ভোগ করে না বলিয়া প্রকাশ পাইত, তাহার ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিত। রাজ্যশাসনের

দায়িত্ব অনুগত মন্ত্রী কমল বিশ্বাস বা ছত্রপতির উপর অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। দেশের অবস্থা বা প্রজার দুঃখ কষ্টের প্রতি এই মন্ত্রীর দৃষ্টি ছিল না; ইহার উপর হইল নবাবের দেয় কর বৃদ্ধি। রাজা গোপাল সিং-এর সময় কর প্রথমে ধার্য হয় ১,২৯,৮০৩ টাকা, পরে মারাঠা আক্রমণজনিত ক্ষয়ক্ষতির কারণে ইহা কমাইয়া ১,১১,৮০৩ টাকা করা হয়। কিন্তু মারাঠার সহিত সন্ধির পর মারাঠা চৌথ যোগ করিয়া এই কর স্থির হয় ১,২৯,৮০৩ টাকা। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন অবস্থায় এই কর প্রদানে রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ অশক্ত।

নবাবের রাজস্ব বৃদ্ধি

পুনরায় মারাঠা অভিযান

এই অবস্থায় পুনরায় মারাঠা অভিযান আরম্ভ হয়। ইং ১৭৬০ সালে মোগল বাদশাহ শাহআলম বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনায় সৈন্যবাহিনী লইয়া মুর্শিদাবাদের দিকে অভিযান করেন। মারাঠাগণ বাদশাহের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া আসে এবং অকস্মাৎ মেদিনিপুর পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করে ও তথা হইতে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হয়। মারাঠার মূলবাহিনী এখানে শিবির স্থাপন করিয়া বর্ধমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। তখন মীরজাফর মুর্শিদাবাদের নবাব, ইংরেজ তাঁহার মিত্র। সম্মিলিত নবাবী ফৌজ ও ইংরেজ বাহিনীর উপস্থিতিতে বাদশাহের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদ আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিষ্ণুপুরে মারাঠা সৈন্যের সহিত মিলিত হন ও বিষ্ণুপুররাজের আনুগত্য গ্রহণ করিয়া মারাঠাগণের সহিত পাটনা অভিমুখে প্রস্থান করেন। পরে ইংরেজ-সৈন্য বিষ্ণুপুর অধিকার করে।

ইংরেজের বিষ্ণুপুর অধিকার

ইতিপুর্বে চৈতন্য সিং-এর দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাজসিংহাসনের একজন দাবিদার উপস্থিত হন, তিনি দামোদর সিং, রাজার একজন নিকট আত্মীয়। তখন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে। বিষ্ণুপুর রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী হইবার দাবি লইয়া দামোদর সিং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং একদল শক্তিশালী নবাবী ফৌজ সহ দামোদর সিং বিষ্ণুপুর অধিকারের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমান্তে বিষ্ণুপুরী সৈন্যবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নবাবী ফৌজ পরাজিত হয়। দামোদর সিং মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পলাশীর রণক্ষেত্রে তখন সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয় হইয়াছে ও নবাব হইয়াছেন মীরজাফর। মীরজাফরের নিকট দামোদর সিং নিজ দাবি

দামোদর সিং ও চৈতন্য সিং

উপস্থাপিত করিলে ইহা গৃহীত হয় ও অধিকতর শক্তিশালী একদল নবাবী সৈন্য-বাহিনী লইয়া দামোদর সিং বিষ্ণুপুরের দিকে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হন ও নৈশ আক্রমণে বিষ্ণুপুর দুর্গ অধিকার করেন। চৈতন্য সিং ইষ্টদেবতা মদনমোহনকে লইয়া পলায়ন করেন।

চৈতন্য সিং-এর বিষ্ণুপুর ত্যাগ

চৈতন্য সিং নবাবের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরগনা বিষ্ণুপুর, বর্ধমান ও মেদিনিপুর সহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার পূর্বেই বাঁকুড়ার কয়েকটি পরগনা—ফুলকুসমা, রায়পুর, অম্বিকানগর, শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, সুপুর ও ছাতনা—চাকলা মেদিনিপুরের অন্তর্গত হয় সুতরাং মেদিনিপুরের সহিত এই পরগনাসমূহও কোম্পানির অধিকারে যায়। মুর্শিদাবাদে চৈতন্য সিংকে কলিকাতায় গিয়া কোম্পানির আশ্রয় লইতে বলা হয়। চৈতন্য সিং মদনমোহনকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন এবং সেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিলেন। এইসময় তিনি এরূপ দুঃস্থ অবস্থায় পতিত হন যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সাহায্য লাভের জন্য গোকুল মিত্রের নিকট মদনমোহনকে গচ্ছিত রাখেন। মদনমোহনের বিষ্ণুপুর ত্যাগ সম্বন্ধে এখনও প্রচলিত আছে

কোম্পানির অধিকার

চৈতন্য সিং-এর আর্থিক দৈন্য

"কার কিছু হারিয়েছে
মদনমোহন পালিয়েছে।"

অবশেষে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রচেষ্টায় কোম্পানি চৈতন্য সিং-এর পক্ষ সমর্থন করেন। বিষ্ণুপুরে ফৌজ পাঠাইয়া দামোদর সিংকে অপসারণ করা হয় এবং চৈতন্য সিংকে একমাত্র প্রভু হিসাবে বিষ্ণুপুরের দখল দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আর স্বাধীন বিষ্ণুপুরের রাজা থাকিলেন না। ইং ১৭৬০ সালে বিষ্ণুপুর ইংরেজ কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; রাজা জমিদার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। এদিকে বিষ্ণুপুরের দুঃখ দৈন্য বাড়িয়া চলিল। মারাঠা আক্রমণে বিধ্বস্ত বিষ্ণুপুরের শাসনদণ্ড পূর্বেই শিথিল হইয়া পড়ে, তাহার উপর আসিল কোম্পানির রাজস্ব। ১৭৬২ সালে দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়া ১,৩৬,০৪৫ টাকা হয়; ১৭৬৫ সালে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া

চৈতন্য সিং-এর প্রত্যাবর্তন

জমিদারি বিষ্ণুপুর

কোম্পানির রাজস্ব ও অসহায় বিষ্ণুপুর

১,৬১,০৪৪ টাকায় দাঁড়ায় এবং পরবৎসর ইহার সহিত যোগ হয় আবওয়াব হিসাবে ৫৬,৪৫০ টাকা। এই ধার্য রাজস্ব চৈতন্য সিং কখনও দিতে পারেন নাই। পূর্ব গৌরব হইতে তিনি ইতিপূর্বেই বিচ্যুত হইয়াছেন; মারাঠা আক্রমণে নিঃস্ব রাজপরিবার কোম্পানির দাবি মিটাইতে আরও নিঃস্ব হইল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

এমন সময় আসিল এক চরম দুর্যোগ, বাংলা ১১৭৬ সালের (ইং ১৭৭০ সাল) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বাংলায় যাহা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে কুখ্যাত।

হাণ্টার সাহেব তাঁহার "Annals of Rural Bengal" বা "পল্লীবাংলার কাহিনী" নামক পুস্তকে এই দুর্ভিক্ষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এইরূপ:

মন্বন্তরের বর্ণনা

"লোকের দুর্দশা এমনভাবে বৃদ্ধি পাইল যে যাবতীয় সরকারী হিসাবকে বিপর্যস্ত করিল। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরকার এবিষয়ে তৎপর হইলেন কিন্তু তখন দেশে অন্নাভাব রোধ করিবার কোন উপায়ই ছিল না। মৃত্যুসংখ্যা ও ভিক্ষাবৃত্তি এমন ভাবে বাড়িয়া চলিল যে বর্ণনা করা যায় না। শস্যপূর্ণ পুর্ণিয়ায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অন্যান্য স্থানের অবস্থাও সেইরূপ। ইং ১৭৭০ সালের দুঃসহ গ্রীষ্মের সময় লোক মরিয়াই চলিল। কৃষক চাষের বলদ বিক্রয় করিল, পুত্রকন্যা বিক্রয় করিল; তারপর আর ক্রেতা মিলিল না। ১৭৭০ সালের জুন মাসে কোম্পানির রেসিডেণ্ট স্বীকার করিলেন যে জীবিত লোক মৃতের মাংস খাইতেছে। ক্ষুধার্ত ও পীড়িত হতভাগ্যদের অবিরাম স্রোত দিবারাত্র বড় বড় শহরের ভিতর দিয়া চলিল। বৎসরের প্রথমেই মহামারী ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পায়। ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয়ের ভীড় এক পরিত্যক্ত গ্রাম হইতে অন্য পরিত্যক্ত গ্রামে খাদ্য ও আশ্রয়ের বৃথা আশায় ঘুরিতে লাগিল; লক্ষ লক্ষ লোক জীবন বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে করিতেই জীবন হারাইল। ১৭৭১ সাল আরম্ভ হইবার পূর্বেই কৃষককুলের এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, বহু বিত্তশালী পরিবার ধ্বংস হইল। ১৭৭০ সাল হইতেই নিম্নবাংলার অভিজাত শ্রেণীর দুই-তৃতীয়াংশের ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।"

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর মারাঠা-বিধ্বস্ত বিষ্ণুপুরের সর্বনাশ সাধন করে। দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যুর পর যাহারা রহিল, তাহারা নিরাশ্রয়, ক্ষুধাপীড়িত। যে কোন

বিষ্ণুপুরের দুর্দশা

উপায়ে প্রাণ রক্ষার জন্য তাহারা তৎপর হইয়া উঠিল। পশ্চিম প্রান্তের পাহাড় ও অরণ্যবহুল অঞ্চলের অধিবাসীগণ দস্যুবৃত্তি

অবলম্বন করিল; তাহাদের সুসংবদ্ধ দল ইতস্ততঃ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত থাকিয়া সারা দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল; সাধারণ ভাষায় তাহারা পরিচিত হয় "চোয়াড়" নামে। শত শত প্রাক্তন কৃষিজীবী ক্ষুধার তাড়নায় তাহাদের সহিত যোগদান করিল। বিষ্ণুপুর কোম্পানির শাসনকেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত; রাজা নিজেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, পুঞ্জীভূত দুর্দশায় মুহ্যমান ও শাসনে অপারগ। কৃষিযোগ্য ভূমির অর্ধাংশেরও বেশী অরণ্যাবৃত হইল, ব্যবসা বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইল। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় দেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহা বর্ণনাতীত।

এই নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যেও কোম্পানি নিজ স্বার্থ পরিচালনায় দ্বিধা করেন নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে তখন বিষ্ণুপুর-রাজের স্থান দেশের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে, রাজ্যের প্রভু কোম্পানি।

কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি

মন্বন্তরের প্রথম বৎসরেই কোম্পানির একজন ইংরেজ সুপারভাইজারের কর্তৃত্বে এক হস্তবুদ প্রকরণ হয় ও ইহার ভিত্তিতে বিষ্ণুপুর-রাজ হইতে আদায়ী রাজস্ব ধার্য হয় ৩,৯৩,৭৫০ টাকা। কিন্তু এই রাজস্ব প্রদানে রাজার কোন সামর্থ্য ছিল না। ইংরেজের আশ্রয় বিষ্ণুপুর-রাজকে মারাঠা বা অন্য কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিল বটে কিন্তু ইংরেজ আমলে রাজা সৈন্যবাহিনী রাখিতে পারেন না; রাখিতে দিলেও তদ্‌বাবদ ব্যয়ভার বহনে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং প্রজার

কর আদায়ে রাজার অক্ষমতা

নিকট হইতে বর্ধিত রাজস্বহেতু অতিরিক্ত কর আদায় দূরে থাকুক, নিয়মিত কর আদায়ের পিছনে যে শক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাব কর আদায়ের পরিপন্থী হইল। তারপর কর আদায় যাহা কিছু সম্ভব ছিল, চৈতন্য সিং-এর অকর্মণ্যতায় তাহাতেও চরম অব্যবস্থা হইল। অসাধুতাও প্রশ্রয় পাইল। তাঁহার আত্মীয়স্বজন নিজ স্বার্থে জমিদারির অংশ বিশেষ ইজারা দিল; পূর্ব তারিখ দিয়া বহু লাখেরাজ সনদ বাহির হইল। ইহার উপর আবার দামোদর

দামোদর সিং বনাম চৈতন্য সিং

সিং-এর সহিত বিবাদ চৈতন্য সিংকে নিঃস্ব করিয়া দিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নবাবের সাহায্যে দামোদর সিং কর্তৃক চৈতন্য সিংকে বিষ্ণুপুর হইতে বিতাড়ণের পর কোম্পানির ফৌজ চৈতন্য সিংকে বিষ্ণুপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু দামোদর সিং নিরস্ত হন নাই। তিনি মুর্শিদাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্টের নিকট আপিল করেন।

রেসিডেন্ট আদেশনামা বাহির করিলেন যে দামোদর সিং বিষ্ণুপুর জমিদারির অর্ধাংশের হকদার। এই আদেশের বিরুদ্ধে চৈতন্য সিং বড়লাটের নিকট আপিল করেন। ইং ১৭৮৭ সালে বড়লাট চৈতন্য সিং-এর পক্ষে ডিক্রি দেন; ইহাতে দামোদর মাত্র খোরপোশ পাইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ১৭৯১ সালে অন্য একটি নূতন আদেশ বাহির হইল এবং ইহাতে দামোদর সিং অর্ধ-বিষ্ণুপুরের জমিদার বলিয়া স্বীকৃতি পান। তারপর চলিল সর্বনাশা মামলা-মোকদ্দমা। অবশেষে উভয়ের মধ্যে আপস মীমাংসা হয় এবং ইহাতে চৈতন্য সিং বিষ্ণুপুর জমিদারির অধিকাংশেরই প্রভু বলিয়া স্থির হয়। দামোদর সিং-এর সহিত বিবাদে চৈতন্য সিং গোকুল মিত্রের নিকট ১,৩০,০০০ টাকা দেনায় জড়িত হইয়া পড়েন। এদিকে কোম্পানির রাজস্ব বাকী পড়ে। রাজস্ব বাকী থাকার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন, জমিদারি ক্রোক করিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানি সাজোয়াল নিযুক্ত করেন। পরে জমিদারি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হয় কিন্তু তিনি আবার রাজস্ব বাকী ফেলিলেন ও কারারুদ্ধ হইলেন।

কারাগারে চৈতন্য সিং

বিষ্ণুপুরের বিশৃঙ্খল অবস্থা সত্ত্বেও ইং ১৭৮৬ সালের পুর্বে কোম্পানির কোন দায়িত্বশীল কর্মচারীকে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এখানে নিযুক্ত করা হয় নাই। উপদ্রব ও বিশৃঙ্খলা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে ইং ১৭৮৫ সালে এই অঞ্চলে নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোম্পানীকে সৈন্যবাহিনী তলব করিতে হয়। ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে ক্রমবর্ধমান অশান্তির বিলোপের জন্য একজন দায়িত্বশীল রাজকর্মচারীর উপস্থিতি এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। ইং ১৭৮৬ সালে পাই (Mr. Pye) নামীয় একজন ইংরেজকে বিষ্ণুপুর শাসনের ভার দিয়া পাঠান হয়। পর বৎসর বীরভূম ও বিষ্ণুপুর লইয়া একটি জিলার সৃষ্টি হয় এবং পাই সাহেব ইহার কলেক্টর নিযুক্ত হন। জিলার সদর হয় বিষ্ণুপুর। পাই সাহেব বেশী দিন বিষ্ণুপুরে থাকেন নাই কিন্তু ইহার মধ্যেই বিষ্ণুপুরের কয়েকটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল দস্যুগণ কর্তৃক লুন্ঠিত হয়। পাই সাহেবের পর কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া আসেন শের বোর্ন (Sher Bourne) সাহেব। তাঁহার সময় শাসনকেন্দ্র সিউরীতে স্থানান্তরিত হয় ও শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হয়। জিলা শাসনের জন্য

বিষ্ণুপুরের বিশৃঙ্খল অবস্থা

কোম্পানির শাসন দৃঢ়ীকরণ

কলেক্টর পাই

কলেক্টর স্বয়ং দায়ী থাকিলেও তাঁহার কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত হয়। কোম্পানির সিপাহী দেশরক্ষার জন্য মোতায়েন হয়, বহুসংখ্যক কুঠি স্থাপিত হয় ও কলিকাতার সহিত দৈনিক যোগাযোগের ব্যবস্থা ও সামরিক উদ্দেশ্যে রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণও হয়।

কলেক্টর শের বোর্ন

ইং ১৭৮৮ সাল দুর্নীতির সন্দেহে শেরবোর্ন সাহেবকে অপসারণ করা হয় ও তাঁহার স্থানে কলেক্টর নিযুক্ত হন কিটিংস্ সাহেব (Christopher Keatings)। ইং ১৭৮৯ সালে বিষ্ণুপুরে আবার অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। তখন চৈতন্য সিং রাজস্ব বাকীর দায়ে কারাগারে, কলেক্টরের প্রধান সহকারী হেসিলরিগ সাহেব (Hesilriege) রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। হেসিলরিগ সাহেব কঠোর ভাবে রাজস্ব আদায়ে মন দিলেন ও পূর্ব-বকেয়াসহ ৪,১৯,৫৩৯ টাকা আদায় করিলেন। ইতিমধ্যে দেশে লুণ্ঠন আরম্ভ হইয়াছে। পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চল হইতে দলে দলে লুণ্ঠনকারী চতুর্দিকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল, তাহাদের সহিত যোগ দিল স্থানীয় লোক। উপদ্রব ক্রমে বিদ্রোহের আকার ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমেও অশান্তি ছড়াইয়া পড়িল ও সেখানে ইলামবাজার লুঠ হইল। কিটিংস সাহেব সেনাবাহিনী তলব করিয়া বহু ক্লেশে বিদ্রোহ দমন করেন।

কলেক্টর কিটিংস্ ও হেসিলরিগ সাহেবের রাজস্ব নীতি

দেশে অশান্তি

হেসিলরিগ সাহেব তাঁহার আদায়ী ৪,১৯,৫৩৯ টাকার এক-একাদশ ভাগ মালিকানা হিসাবে বাদ দিয়া বিষ্ণুপুরের রাজস্ব ধার্য করেন ৩,৮১,৩৯৯ টাকা। পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৯০ সালে কলেক্টর বৃদ্ধ রাজাকে বন্দী অবস্থায়ই ইন্দাস আনয়ন করেন ও সেখানে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের স্বীকৃতিতে তাঁহাকে দশসালা[১] বন্দোবস্তের চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। তৎকালীন অবস্থায় চৈতন্য সিং-এর পক্ষে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বাতুলতা হইলেও তিনি ইহাতে স্বীকৃতি দেন, কারণ, তাঁহার ভয় ছিল যে অন্যথায় তাঁহার জীবনশত্রু দামোদর সিংএর সহিত জমিদারি বন্দোবস্ত হইবে।

বিষ্ণুপুরের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

হেসিলরিগ সাহেবের এই রাজস্ব ধার্য যে ভিত্তির উপর করা হয় তাহাতে

১। এই দশসালা বন্দোবস্তই পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

ছিল কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি। প্রথমতঃ তিনি চাকরাণ জমি, জায়গির, অসিদ্ধ নিষ্কর বা লাখেরাজ প্রভৃতি সম্পত্তি কর-আদায় যোগ্য বলিয়া তাঁহার হিসাবে গ্রহণ করেন, অথচ তাহা খাস করিয়া আদায়যোগ্য সম্পত্তিতে পরিণত করার কোন সম্ভাবনা তখন ছিল না। তারপর জলকর, মুনকর বা তদ্রূপ সায়ারত সম্পত্তি হইতে জমিদারের কর আদায়ের ক্ষমতা পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাও জমিদারের আদায়ী জমাভুক্ত করেন।

বন্দোবস্তে ত্রুটি

মহল বিক্রয়

রাজা চৈতন্য সিং ধার্য রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারেন নাই। বকেয়া রাজস্বের জন্য বড়হাজারী ও করিশুণ্ডা মহল রাজস্ব বোর্ডের আদেশে ইং ১৭৯১ সালে বিক্রয় হয়, ক্রেতা হইলেন বর্ধমানপতি মহারাজ তেজচন্দ্র। তেজচন্দ্রের সহিত কোম্পানির রাজস্ব ধার্য হয় ২১৪১৪৭ টাকা। অবশিষ্ট যে সদরজমা রহিল, চৈতন্য সিং তাহাও বাকী ফেলিলেন এবং ফলে কলেক্টর এই অংশ নিজ তত্ত্বাবধানে আনিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য সাজোয়াল নিযুক্ত করেন। ইং ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত জমিদারি কলেক্টরের হেফাজতে থাকে। ইতিমধ্যে ইং ১৭৯৪ সালে চৈতন্য সিং ও দামোদর সিং-এর মধ্যে পুর্বোল্লিখিত আপস মীমাংসা হইয়াছে; চৈতন্য সিং জমিদারির অধিকাংশেরই হকদার হইয়াছেন ও দামোদর সিং জামকুড়িতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তখন কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভ্রাতার একজন বুদ্ধি-বিবেচনা বর্জিত পলিত কেশ বৃদ্ধ, রাজস্ব বাকী দায়ে কারারুদ্ধ, অপরজন মৃত্যুশয্যায়, দুঃখ বা আনন্দের অনুভূতির বাহিরে।

কিটিংস্ সাহেবের আদেশে সাজোয়াল বহু লাখেরাজ ও চাকরান জমি খাস করিয়া ১৮০০০ টাকা জমা বৃদ্ধি করেন কিন্তু আদায়ের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বকেয়ার পরিমাণ বাড়িয়া চলিল। ইং ১৭৯১ সালে দুইটি মহল বিক্রয় হইবার পর রাজা ধার্য রাজস্ব কমাইবার জন্য রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন; এই আবেদন বোর্ড গ্রহণ করেন ও বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইং ১৭৯৫ সালে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১,৫০,২৭১ টাকায় নির্ধারিত করেন। তখন কলেক্টর ছিলেন ডেভিস (Davis) সাহেব। কিন্তু এই রাজস্বও চৈতন্য সিং দিতে পারেন নাই। কলেক্টর আবার জমিদারির ভার গ্রহণ করেন। ইং ১৭৯৮ সালে বকেয়া রাজস্ব মিটাইবার জন্য জমিদারির কোন কোন অংশ পাঁচটি পৃথক খণ্ডে বিক্রয় হয়; ইহা বাবদ রাজস্ব ছিল ১,০০,২৯১ টাকা। কিন্তু

কোম্পানির বিষ্ণুপুর জমিদারি গ্রহণ

অবস্থার উন্নতি হয় নাই। রাজপরিবারের অনেকে আবার গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। ইং ১৭৯৯ সালে বিষ্ণুপুরের চতুষ্পার্শ্বের বহু গ্রাম লুণ্ঠিত হইল, নগরবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা ইচ্ছা থাকিলেও বৃদ্ধ রাজার ছিল না। এই অবস্থায় জমিদারির শাসনভার-কোম্পানি গ্রহণ করেন ও সটেন (Sutten) নামীয় একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

ইহার পর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাকে বিষ্ণুপুর জমিদারি রক্ষার অতিবিলম্বিত প্রয়াস বলা যাইতে পারে। ইং ১৭৯৮ সালে জমিদারির অংশ বিক্রয়ের পর ইহার আয়তন যেমন ক্ষুদ্র হইল, রাজস্বও সেইরূপ হ্রাস পাইয়া মাত্র ৪৯,৯৭৯ টাকায় দাঁড়াইল।

বিষ্ণুপুরের অবসান

ইং ১৮০২ সালে জমিদারির মোট আদায় ৬৫,৮৯৭ টাকা ধরিয়া তাহা হইতে জমিদারের প্রাপ্য বাবদ শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে বাদ দিয়া রাজস্ব ধার্যের ফলে ইহার পরিমাণ আরও কম হইল। চাকরাণ ও অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া জমিদারির আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ইহার কোনটিই বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করিতে পারিল না। ইং ১৮০৫ সালে বর্ধমান জিলা আদালতে রাজা চৈতন্য সিং-এর বিরুদ্ধে দেনার দায়ে এক ডিক্রি হয়; দেনার পরিমাণ কম ছিল না। ডিক্রির দাবি ও ইহার সহিত বকেয়া রাজস্ব মিটাইতে তিনি হইলেন সম্পূর্ণ অশক্ত। ফলে রাজস্ব বোর্ড জমিদারি নিলাম করিয়া প্রাপ্য দাবি মিটাইবার আদেশ দেন। ইং ১৮০৬ সালে নিলাম হয় ও বর্ধমানের মহারাজা ২,১৫,০০০ টাকায় জমিদারি ক্রয় করেন। জমিদারি দশটি বিভিন্ন তৌজিতে বিভক্ত হইল। রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে বার্ষিক পেনশন দিবার ব্যবস্থা হইল।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রাচীন ভূসম্পত্তি ইহার হাত হইতে চিরকালের জন্য চলিয়া গেল। বিষ্ণুপুর রাজ্য লোপ পাইল। কিন্তু এই রাজবংশ বহু শতাব্দী যাবৎ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রজাবর্গের যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আন্তরিক ভালবাসা অর্জন করিয়াছিল, তাহা শীঘ্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যাঁহারা নিলামে জমিদারির বিভিন্ন মহল খরিদ করেন, প্রজার নিকট হইতে কর আদায়ে তাঁহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয়; এমন কি শক্তিশালী বর্ধমান-রাজের পক্ষেও খরিদি মহল দখল লওয়া ও তাহা হইতে কর আদায় এক দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করে এবং অবস্থা একসময় এইরূপ দাঁড়ায় যে মহারাজা খরিদ বাবদ টাকা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া ক্রীতমহলগুলি তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্য রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

অবশেষে যে তিনি মহলসমূহের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সমর্থ হন তাহার মূলে ছিল অর্থবল ও ক্ষমতা।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের অবসান সম্বন্ধে রবার্টসন সাহেব[১] বলেন:

রবার্টসন সাহেবের অভিমত

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান শর্ত হইল কোম্পানির সেরেস্তায় নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রদান; ইহার ব্যতিক্রমের পরিণাম নিতান্ত অশুভ। বিষ্ণুপুর-রাজ ব্যতীত দেশের অন্য কোন জমিদারের উপর আইনের দণ্ড এরূপ প্রচণ্ডভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। কিছুদিন পুর্বেও তাঁহারা ছিলেন নামে মাত্র করদ রাজা; এই কর আবার দেওয়া হইত রাজার ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী। কিন্তু এখন তাঁহার উপর এইরূপ রাজস্বের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইল যাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন একজন সুদক্ষ শাসনবিদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে অসাধ্য ছিল। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। বারশত বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর বিষ্ণুপুর রাজবংশের ন্যায় এইপ্রকার আকস্মিক ও করুণাব্যঞ্জক পতন দেশের অন্য কোন জমিদারের ক্ষেত্রে হয় নাই। রাজা চৈতন্য সিংএর দুর্বলতা, অসরল আচরণ, আত্মীয়বর্গকে শাসনে রাখার অক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনা করিলেও এই মন্তব্য না করিয়া পারা যায় না যে বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রে আইনের বিধান শিথিল করা সমীচীন ছিল এবং এই সুপ্রাচীন রাজবংশ-শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে রক্ষার পন্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজন ছিল।

"বিষ্ণুপুরের সহিত দশসালা-বন্দোবস্ত ও পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়োচিত হয় নাই। মারাঠা হাঙ্গামার পর ৩০ বৎসরও গত হয় নাই; তারপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে। ইতিমধ্যে চোয়াড় উপদ্রবে দেশ ছাইয়া যায় এবং এই উপদ্রব মারাঠা হাঙ্গামা হইতে কম ছিল না। ফলে দেশের পুর্ব সম্পদের যে ক্ষতি হয় তাহা হইতে ইহাকে পুনরুদ্ধার করা সুদূর পরাহত। এই পরিস্থিতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার, প্রজা উভয়ের পক্ষেই অকল্যাণকর। দেশের নিদারুণ অবস্থাই প্রজার নিকট হইতে কর আদায়ের একমাত্র পরিপন্থী হয় নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণহানি ঘটায়, কৃষিজমির উপর ইহার প্রতিঘাত এক অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কৃষক জমির জন্য আর জমিদারের দ্বারে

১। F. W. Robertson I. C. S.—Final Report of Bankura Settlement 1917—1924.

উপযাচক হইল না, জমিদারকেই কৃষককে জমি বন্দোবস্ত লইবার জন্য নানারূপ প্রলোভন দিতে হইল। দেশের যত কৃষক তাহাদের অনুপাতে কৃষিজমির পরিমাণ হইয়া পড়িল অনেক বেশী। ইহার ফলে হয় জমির খাজনার সহজ হার ও কৃষিজীবীর পক্ষে অভিনব স্বাধীনতা।

"বহু কারণেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে—চৈতন্য সিং ও দামোদর সিংএর মধ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া সর্বনাশা মামলা-মোকদ্দমা, দেশের বিধ্বস্ত অবস্থা, ধার্য রাজস্বের বিপুল পরিমাণ ও সর্বশেষে প্রজার নিকট হইতে যথাসময়ে কর আদায় বলবৎ করার জন্য তৎকালীন আইনে জমিদারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান না করা। রাজস্বনীতি আবার বাংলার অধিকাংশ জমিদারির তুলনায় বিষ্ণুপুরের উপর অন্যভাবে প্রয়োগ করা হয়। এখানে দশসালা বন্দোবস্তের পুর্ব হইতেই জমিদারির কর আদায়ের ভার অর্পিত হয় একজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের উপর; সুতরাং যখন অন্যান্য জমিদারের সহিত রাজস্ব ধার্য হয় পূর্বদেয় রাজস্ব বা অপ্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে, বিষ্ণুপুরে ইহা ধার্য হয় আদায় উপযোগী খাজনার পরিপ্রেক্ষিতে।"

রাজপরিবারের পরবর্তী অবস্থা

ইং ১৮০৬ সালে বিষ্ণুপুর জমিদারি নিলামে বিক্রয় হইবার পর সরকার-প্রদত্ত পেনশন ও কয়েকটি দেবোত্তর লাখেরাজ সম্পত্তির আয়ই হইল রাজবংশের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এই দেবোত্তর হইতে লভ্য হইত যৎ-সামান্য; রাজ পরিবারের ঋণের পরিমাণ ছিল এত বেশী যে ইহা পরিশোধের কোন উপায় ছিল না। ঋণভার ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পায় এবং ফলে অধিকাংশ দেবোত্তরই মহাজনের দেনা মিটাইতে হয় বিক্রয় করা না হয় বন্ধক রাখা হয়। রাজবংশের শেষ রাজা রামকৃষ্ণ সিং দেব অপুত্রক পরলোক গমন করেন; তাঁহার প্রথমা রাণী স্বামীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমণি সিংকে অবশিষ্ট সম্পত্তি যাহা ছিল দানপত্র করিয়া দেন। নীলমণি সিং আবার দেনায় এরূপ জড়াইয়া পড়েন যে এই সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদি ইজারায় বন্দোবস্ত দেন। তাহার পর সরকার প্রদত্ত সামান্য পেনশন্ ও যৎসামান্য দেবোত্তর সম্পত্তিই থাকিল জীবন ধারনের একমাত্র উপায়। রাজবংশের অন্য যে সব শাখা জামকুড়ি, ইন্দাস বা কুচিয়াকোলে আশ্রয় লাভ করেন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থারও ক্রমশঃ অবনতি ঘটে। বিষ্ণুপুরে প্রাক্তন মল্লরাজগণের বর্তমান বংশধর বাস করেন নগণ্যগৃহে; সাধারণের নিকট কিন্তু তিনি এখনও "রাজা"।

বাঁকুড়ায় সামন্ত-রাজ

কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বিষ্ণুপুর বিশেষ কোন প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই কিন্তু তদানীন্তন বিষ্ণুপুর-জমিদারির বাহিরে উপজাতীয় ও সামন্ত-রাজ শাসিত অঞ্চলের অবস্থা তাঁহাদের নিকট বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। এই কাহিনীর অবতারণার পূর্বে সামন্ত-রাজগণের পরিচয় প্রয়োজন মনে হয়।

প্রাক্-মল্লযুগে সামন্ত-রাজ্য

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মল্লরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্‌কালে এই অঞ্চলে ছিল খণ্ডজাতি বা উপজাতি শাসিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। মল্লরাজগণের প্রথম আবির্ভাবের সময় পদমপুর, লাউগ্রাম, জটবিহার, কাকাটিয়া, ইন্দাস প্রভৃতি এরূপ রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের জয় করিয়া মল্লরাজগণ ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করেন ও বৃহত্তর রাজ্যগঠনে সমর্থ হন।

মল্লরাজ শক্তি ও সামন্ত-রাজ

মল্লরাজগণের মধ্যাহ্নযুগেও রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে এই সামন্তশক্তির প্রভাব বর্তমান থাকে; ইহাদের কেহ কেহ মল্লরাজগণের বশ্যতা স্বীকার করেন, কেহ কেহ বা করেন নাই। অনেকে আবার পরে নামমাত্র মুসলমান প্রভুত্ব স্বীকার করেন। দেখা যায় যে যদিও মূলে এই সকল সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এতদ্দেশীয় অধিবাসী দ্বারা, পরবর্তীকালে ইহার কোন কোন অঞ্চল বিজিত ও অধিকৃত হয় কোন বহিরাগত ভাগ্যান্বেষী দ্বারা।

সামন্তভূম

প্রথমে বলিতে হয় সামন্তভূমের কথা। বর্তমান ছাতনা থানা ও ইহার চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল সামন্তভূম। মনে হয় যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী কোন উপজাতি দ্বারা। ছাতনা রাজবংশের কাহিনীতে সামন্ত বা সাঁওতদের কথা আছে; ইহাদেরই আরাধ্যা দেবী ছিলেন বাসুলি বা বাসলি।[১] পরবর্তীকালে কোন ব্রাহ্মণ রাজবংশ এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করে; রাজধানী হয় বাসলিনগর বা বাহুল্যা নগর। এই রাজবংশ

১। বাসলি দেবী সম্বন্ধে সংস্কৃতি ভাগ দ্রষ্টব্য

উপজাতীয় দেবী বাসলিকে অশ্রদ্ধা করায় সাঁওতগণ বিদ্রোহ করে ও রাজ্য অধিকার করে। ১৩২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে শঙ্খ রায় সামন্তভূম অধিকার করেন। তাঁহার সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে যে তাঁহার আদি বাসভূমি ছিল বাহুল্যানগর। পরে তিনি দিল্লীর বাদশাহের অধীন সেনানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন কিন্তু কোন কারণে বাদশাহের বিরাগভাজন হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও এখানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। বাসলি দেবীর আদেশে তিনি বাহুল্যানগর ত্যাগ করিয়া ছাতনায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া যে সকল রেশমের বণিক পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাতায়াত করিত তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া শঙ্খ রায় প্রভূত অর্থ অর্জন করেন।

শঙ্খ রায়

শঙ্খ রায়ের পৌত্র হামীর উত্তর রায়। তিনি রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন ও বাংলার মুসলমান শাসক হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় বাসলি দেবীর প্রীত্যর্থে ছাতনায় বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এইরূপ একটি ইষ্টকনির্মিত মন্দিরগাত্রে খোদিত আছে তাঁহার নাম—হামীর উত্তর রায় ১৪৭৬ শক।

হামীর উত্তর রায়

হামীর উত্তর রায়ের পুত্র বীর হাম্বীর রায়ের সময় ভবানী ঝারা পঞ্চকোট রাজের সাহায্যে ছাতনা আক্রমণ করিয়া রাজবংশের প্রায় সকলকেই হত্যা করে। বীর হাম্বীর রায়ের পুত্রগণের মধ্যে বারজন শিলদায় পলায়ন করেন কিন্তু পরে রাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন ও প্রত্যেকে পরপর মাত্র একমাস করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন।

বীর হাম্বীর রায়

এই সময় ফতেপুর শিকরি হইতে নিঃশঙ্কনারায়ণ নামে একজন ক্ষত্রিয় যুবক পুরী হইতে ফিরিবার পথে ছাতনায় আগমন করেন। তাঁহার উপর দ্বাদশ ভ্রাতার দৃষ্টি পড়ে ও তাঁহার সহিত ইহাদের এক কন্যার বিবাহ দিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং তাঁহাকে "সামন্তাবনিনাথ" আখ্যায় ভূষিত করেন। এই উপাধি ছাতনার রাজগণ আধুনিককাল পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন নাই।

নিঃশঙ্কনারায়ণ

মনে হয় যে এই সময় সামন্তভূম বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের প্রভাব-গণ্ডির ভিতর চলিয়া আসিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মল্লভূমের সীমারেখা পঞ্চকোট রাজ্যের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। মধ্যবর্তী অঞ্চল সামন্তভূম যে মল্ল-শক্তির প্রভাবের বাহিরে থাকিতে পারে না

ইহা সহজেই অনুমেয়। এই সময়ের মল্লরাজগণের হাম্বীর নাম গ্রহণ যে ঐ নামীয় পূর্ববর্তী বা সম-সাময়িক সামন্তভূমের রাজাদের নাম দ্বারা অনুপ্রাণিত বা তাঁহাদের বিজয়ের স্মারক ইহাও অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিঃশঙ্কনারায়ণের "সামন্তাবনিনাথ" নাম গ্রহণ বিষ্ণুপুর-রাজগণের "মল্লাবনিনাথ" নামেরই প্রতিধ্বনি মনে হয়।

বিবেকনারায়ণ

নিঃশঙ্কনারায়ণের পুত্র ছিলেন বিবেকনারায়ণ। পঞ্চকোটের রাজা গৃহবিবাদের ফলে তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া বিবেকনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে এই পঞ্চকোট রাজ ছাতনায় বাসলি দেবীর জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন। বিবেকনারায়ণ তাঁহার পুত্র স্বরূপনারায়ণের হস্তে নিহত হন।

স্বরূপনারায়ণ

স্বরূপনারায়ণের রাজত্বকালে মারাঠাগণ ছাতনা আক্রমণ করে কিন্তু এই আক্রমণ প্রতিহত হয়। কাহিনী প্রচলিত আছে যে রাজা সাতশত মারাঠা সৈন্যের শিরচ্ছেদ করিয়া সেগুলি মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরণ করেন ও নবাব সন্তুষ্ট হইয়া সমগ্র রাজ্যের জন্য নিষ্কর সনদ প্রদান করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ

স্বরূপনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কিছুদিন এই নিষ্কর সনদ ভোগ করেন। ইতিমধ্যে দেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়; লক্ষ্মীনারায়ণ মেদিনিপুর গিয়া ছাতনার জমিদারি ২১৪৪ সিক্কায় কোম্পানির নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইলেন। স্বাধীন সামন্তভূমের অবসান ঘটিল।

সামন্তভূমের অবসান

তুঙ্গভূম

পরগনা শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসমার সাধারণ পরিচয় তুঙ্গভূম নামে।

সামন্তভূমের ন্যায় এই অঞ্চলেও প্রাচীনকালে এক স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠে। পরগনা শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসমা ভিন্নও পরগনা রায়পুর, সিমলাপাল ও ভেলাইডিহা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

রাজনগর ও সামন্তশর

রাজ্যের নাম ছিল রাজনগর। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা সামন্তশর নামীয় একজন সামন্ত নৃপতি এখানে রাজত্ব করিতেন। কোন কারণে এই রাজা সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দেন এবং ফলে রাজ্য হইল রাজাহীন।[১] দেশে দস্যুতস্করের প্রাদুর্ভাব

১। মল্লরাজ পৃথ্বিমল্ল এই সময় এই অঞ্চল জয় করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হইল। এই সময় উড়িষ্যা হইতে আগত নকুড় তুঙ্গ এই অঞ্চল জয় করেন।

নকুড় তুঙ্গ

কথিত আছে যে নকুড় তুঙ্গের কোন পূর্বপুরুষ তুঙ্গদেও গণ্ডকী নদীর তীর হইতে পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন ও জগন্নাথদেবের কৃপায় পুরীর রাজা হন। তাঁহার পৌত্র গঙ্গাধর স্বপ্নে আদেশ পান যে তাঁহার পর বংশের আর কেহ পুরীর রাজা থাকিবেন না; তবে তাঁহার পুত্র নাম পরিবর্তন করিয়া অন্য দেশে যাইলে সেখানে রাজা হইবে। গঙ্গাধরের পুত্র নকুড় তুঙ্গ ধনরত্ন ও কতিপয় সৈন্যসহ সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার গুরু ও সেনাপতি শ্রীপতি মহাপাত্র, ২৫০ উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবার ও জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্তি। দশবৎসর যাবৎ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নকুড় তুঙ্গ শ্যামসুন্দরপুরের অদূরে টিকরপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন ও অবশেষে এই অঞ্চল জয় ও ছত্রনারায়ণদেব নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হন (আনুমানিক ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ)।

শ্রীপতি মহাপাত্র

নকুড় তুঙ্গ শ্রীপতি মহাপাত্রকে রাজ্যের এক অংশ দান করেন; ইহা বর্তমান সিমলাপাল ও ভেলাইডিহা পরগনা। রায়পুরের শিখর রাজাকে রায়পুর অঞ্চল দান করেন। যে সকল উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁহার সহিত আসিয়াছিল, ভূমি দান করিয়া তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। নকুড় তুঙ্গ হইতে ষষ্ঠ রাজা শ্যামসুন্দর

শ্যামসুন্দর তুঙ্গ, মুকুটনারায়ণ

তুঙ্গ বা লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের সময় রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার ভ্রাতা মুকুটনারায়ণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের অংশে যে ভাগ পড়ে তাহা বর্তমান শ্যামসুন্দরপুর পরগনা; মুকুটনারায়ণের অংশে

কোম্পানির অধিকার

পড়ে বর্তমান ফুলকুসমা পরগনা। কোম্পানির সহিত যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তখন শ্যামসুন্দরপুরের রাজা ছিলেন সুন্দরনারায়ণ দেব আর ফুলকুসমায় ছিলেন দর্পনারায়ণ দেব।

ধলভূম

পরগনা সুপুর ও অম্বিকানগর লইয়া গঠিত ছিল এই সামন্তরাজ্য। আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানে যে রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার রাজগণ ছিলেন রজক বংশীয়। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে এই বংশীয় চিন্তামণি ধোবা এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি "পাই" নামীয়

শস্যওজনের পরিমাপ প্রবর্তন করেন। এখনও এই দুই পরগনায় প্রচলিত স্থানীয় মাপ "চিন্তামণি পাই" নামে পরিচিত। তাঁহার রাজধানী ছিল সুপুর। রজকবংশের এই রাজ্য জয় করেন জগন্নাথ দেব নামে একজন রাজপুত। তাঁহার আদি-বাস ছিল রাজস্থানের অন্তর্গত ঢোলপুর। প্রচলিত কাহিনী এই যে শ্রীক্ষেত্র হইতে তীর্থ পর্যটন করিয়া স্বদেশে ফিরিবার পথে তিনি কটকে মুসলমান শাসন কর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তথায় শাজাদা বলিয়া সম্বোধিত হন[১]। তাহাতে জগন্নাথ দেব প্রার্থনা করেন যে এই উপাধি কার্যকরী করা হউক। তখন তাঁহাকে কোন রাজ্য জয় করার উপযুক্ত সৈন্যসাহায্য করা হয় এবং তিনি এই সৈন্য লইয়া সুপুর আক্রমণ করেন ও চিন্তামণি ধোবাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ধোবা রাজকে জয় করার স্মৃতি বজায় রাখার জন্য তিনি "ধবল" উপাধি গ্রহণ করেন, আবার মুসলমান শাসনকর্তা প্রদত্ত "শাজাদা" পদবীও রক্ষা করেন।

চিন্তামণি ধোবা

জগন্নাথ দেব

কালক্রমে ধলভূম দুইভাগে বিভক্ত হয়; এক অংশের রাজা হইলেন টেকচন্দ্র, তিনি সুপুরে রহিয়া গেলেন। অপর অংশের রাজা হইলেন খড়্গেশ্বর, তাঁহার রাজধানী হইল অম্বিকানগর। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সুপুর এবং অম্বিকানগর উভয়েই কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করিয়া নির্দিষ্ট রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে জমিদার শ্রেণীভুক্ত হয়।

সুপুর ও অম্বিকানগর

কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার

নকুড় তুঙ্গ যখন রাজনগর জয় করেন (আনুমানিক ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে) রায়পুরে তখন রাজত্ব করিতেন শিখর বংশীয় রাজগণ।[২] নকুড় তুঙ্গ শিখর রাজাকে স্বীকৃতি দান করেন। তৎসম্পর্কীয় কাহিনীতে শিখর রাজকে রায়পুর প্রত্যর্পণ করার উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে একজন চৌহান রাজপুত এই অঞ্চল জয় করিয়া রাজা হন; তিনিও শিখর রাজ পদবী গ্রহণ করেন। এই সময় রায়পুর

রায়পুর

শিখর রাজ

১। এই মুসলমান শাসনকর্তা মনে হয় পাঠান বংশীয় সুলতান দাউদ বা কতলু খাঁ।

২। মল্লরাজগণের কাহিনীতে আছে যে রাজা পৃথ্বিমল্ল (১২৯৫-১৩১২ সাল) রায়পুর জয় করেন। এই শিখর-রাজবংশ মনে হয় বিষ্ণুপুরের আশ্রিত ছিল অথবা পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মল্লরাজগণের প্রভাব-গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং মল্লরাজ বীর হাম্বীরের সহায়তায় মোগল সৈন্য রায়পুরের পথে উড়িষ্যার পাঠানশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করে। শিখর বংশীয় শেষ রাজার সময় মারাঠাগণ রায়পুর আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজা সপরিবারে শিখরসায়র নামীয় জলাশয়ে আত্মবিসর্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা হন রাজগুরু। অবশেষে বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের এক শাখা রায়পুরের প্রভুত্ব লাভ করেন।

কোম্পানির অধিকার

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে রায়পুর নিয়মিত রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে।

মালিয়ারা

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মালিয়ারা ছিল অরণ্য পরিবৃত, দস্যুতস্করের আশ্রয়স্থল। মানসিংহ যখন বিষ্ণুপুর রাজের সহায়তায় পাঠানগণের বিরুদ্ধে উড়িষ্যায় অভিযান করেন তাঁহার সহিত ছিলেন দেও অধূর্য। উড়িষ্যা অভিযান

দেও অধূর্য

শেষ হইল, কিন্তু অধূর্য স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া মালিয়ারায় বসতি স্থাপন করেন। অধূর্য এই অঞ্চলকে অরণ্যমুক্ত করিয়া আবাদযোগ্য করেন ও এখানে এক জনপদ গড়িয়া উঠে। তাঁহার শাসনে দেশ হইতে দস্যুতস্করের উপদ্রব দূর হইল। পরে মুর্শিদাবাদের নবাব হইতে তিনি তালুক মালিয়ারার বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন ও তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী নবাব সেরেস্তায় রাজস্ব দিতে থাকেন।

মণিরাম অধূর্য

এই বংশের তৃতীয় রাজা মণিরাম অধূর্যের সময় বিষ্ণুপুর রাজের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলে বিষ্ণুপুর রাজ বীরসিংহ মালিয়ারা আক্রমণ করিলে মণিরাম তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার পর হইতে মালিয়ারা বিষ্ণুপুরকেই কর দিতে

কোম্পানির অধিকার

থাকে। মালিয়ারা পরে ইংরেজ কোম্পানির সহিত দশসালা বন্দোবস্তে আবদ্ধ হয়; তখন ইহার জমিদার ছিলেন জয় সিং।

দেখা যায় যে উপরে যে সকল সামন্ত-শক্তির কথা বলা হইল তাহারা সকলেই কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে ও নির্ধারিত কর প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহাতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহা পর-পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইল।

তৃতীয় স্তবক

ইংরেজ শাসন

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
তুমি আজও দুঃখে
তুমি কালও দুঃখে।"

—গোবিন্দ চন্দ্র রায়

(১)

অশান্ত দিগন্ত

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে চাকলা মেদিনিপুর ও জলেশ্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত হওয়ার ফলে হুগলি নদী ও রূপনারায়ণের পশ্চিমস্থিত এক বিশাল ভূখণ্ড কোম্পানির অধিকারে আসে। মেদিনিপুর ও জলেশ্বর দুইটিই সীমান্ত প্রদেশ হওয়া বিধায় কোম্পানি দক্ষিণে ও দূর পশ্চিমে মারাঠা শক্তির সম্মুখীন হইয়া পড়েন। পশ্চিম সীমান্তে মারাঠা রাজ্য ও কোম্পানির অধিকারের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন জঙ্গলমহলের স্বাধীন সামন্তরাজগণ। পূর্ব সীমায় মেদিনিপুর ও বিষ্ণুপুর জমিদারি, পশ্চিমে সিংভূম, উত্তরে পঞ্চকোট ও দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পরিবেষ্টিত জঙ্গলমহল ছিল আয়তনে প্রায় ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ মাইল প্রশস্ত। কোম্পানির তদানীন্তন রিপোর্ট হইতে প্রকাশ পায় যে এই অঞ্চলে কৃষিযোগ্য বা আবাদি জমির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম; দেশ ছিল পাহাড়সঙ্কুল, অরণ্যবহুল; মাটি পাথর মিশ্রিত। মোগল বাদশাহ আকবরের সময় ইহা সরকার গোয়াল-পাড়ার সামিল হয়; নবাব মুরশেদকুলি খাঁয়ের সময় ইহা হয় চাকলা মেদিনিপুরের অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জঙ্গলমহলের সামন্তরাজগণ নবাব সেরেস্তার সহিত সম্পর্ক খুব কমই রাখিতেন ও স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। ইহাদের কেহ কেহ-বা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিতেন। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের ছিল অরণ্যদুর্গ, অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল যুদ্ধ। সামন্তরাজগণের পক্ষে পশ্চিমের মারাঠাশক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না।

জঙ্গলমহলের সামন্ত-রাজগণের আদিম বৈশিষ্ট্য

কোম্পানি প্রথমে তাঁহার নবলব্ধ অধিকারের দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন ও তাহার পর জঙ্গলমহলের সামন্তরাজশক্তিকে স্ববশে আনয়ন করিয়া পশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ়করণে মনোনিবেশ করেন। এই অঞ্চল আয়ত্তাধীনে আনিয়া ইহাতে কোম্পানির শাসন প্রবর্তন ছাড়াও কোম্পানির অন্য উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ববৃদ্ধি ও

কোম্পানির সীমান্ত নীতি

বাণিজ্য বিস্তার। এখানে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ, তেল, গালা, কাঠ ও গবাদি পশু। কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এই দেশের সহিত বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে ইং ১৭৬৭ সালে জঙ্গলমহলের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হয়। অভিযানের নেতা নিযুক্ত হন ফার্গুসন নামে একজন ইংরেজ সেনানী। তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে যদি কোন সামন্তরাজ কোম্পানির দাবি স্বীকার করিয়া ইহার বশীভূত হন, তাঁহার সহিত রাজস্ব ধার্য করিতে হইবে ও এই রাজস্ব নিয়মিত ভাবে জমা দিবার চুক্তিতে দখলি ভূ-সম্পত্তি তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইবে; অন্যথায় তাঁহাকে বলপ্রয়োগে অপসারণ করিয়া সম্পত্তি অন্য কোন অনুগত প্রার্থীর সহিত উপরোক্ত শর্তে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যে সামন্তরাজ কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করিবেন তাঁহার সহিত রাজস্ব নির্ধারণে ফার্গুসনকে সাহায্য করিবার জন্য কার্তিক রাম ও চন্দন ঘোষ নামে দুইজন দেশীয় লোককে নিযুক্ত করা হয়। চন্দন ঘোষ ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কৃতবিদ্য ছিলেন আর কার্তিক রাম জঙ্গলমহলের যাবতীয় রাজ পরিবার, তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তির অবস্থান ও পরিমাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। বলরামপুর নির্দিষ্ট হইল ফার্গুসন সাহেবের কর্ম-কেন্দ্র। এখান হইতে তিনি যাবতীয় সামন্ত-রাজকে বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান করিলেন আর তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিলেন যে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত না হন বা বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ না পাঠান, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করা হইবে।

জঙ্গলমহলের বিরুদ্ধে অভিযান

ফার্গুসন সাহেব

জঙ্গলমহলের সামন্তরাজগণ অনেকেই ছিলেন শক্তিশালী; কিন্তু তাঁহাদের ভিতর ঐক্য ছিল না। সুতরাং যাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করেন নাই তাঁহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন একক। কোম্পানির সেনা একটি একটি করিয়া এই সকল সামন্তশক্তিকে পরাজয় করিল; কোথায় বা একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে লাগাইয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করিল। এইভাবে ঝাড়গ্রাম, জামবনি, ঘাটশিলা প্রমুখ রাজগণের পরাজয় হইল। অম্বিকানগর, সুপুর, ফুলকুসমা, ছাতনা, মানভূম প্রভৃতি বশ্যতা স্বীকার করিল ও ইহাদের সহিত রাজস্ব ধার্য হইয়া নিয়মিত ভাবে দিবার চুক্তিতে জমিদারি বন্দোবস্ত হইল। তাহাদের

সামন্তশক্তির সাময়িক বশ্যতা স্বীকার

সামরিক বাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া হইল। এই ভাবে সমগ্র জঙ্গলমহল কোম্পানির অধিকারে আসিল কিন্তু শাসন প্রতিষ্ঠা হইল না।

সামন্তরাজগণের অনেকেই পরাজয়ের গ্লানি ও অধীনতা সহ্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোম্পানির কেন্দ্রীয়শাসন প্রচেষ্টা ছিল তাঁহাদের নিকট অবোধ্য, প্রজাগণও নানাকারণে হইয়া উঠিল অশান্ত। ফলে ইং ১৭৬৭ সাল হইতে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত সমগ্র জঙ্গলমহলে অশান্তির ধূম্রজাল ব্যাপ্ত হয়। বহুস্থানে বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ইং ১৭৮০ সালে ধলভূমের রুদ্রবংশী তাহার দলবলসহ বিষ্ণুপুর লুণ্ঠন করে। হাঙ্গামা সমগ্র জঙ্গলমহলে বিস্তৃত হয় এবং অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কোম্পানি বহুস্থানে সিপাহী সৈন্য পাঠাইয়া শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা হয় মাত্র সাময়িক।

বিদ্রোহ

রুদ্রবংশী

বিদ্রোহ দমন

জঙ্গলমহলের অধিবাসীর মধ্যে যাহারা সামরিক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত তাহাদের সংখ্যা কম ছিল না। তাহাদের সাধারণ পরিচয় ছিল পাইক নামে। সাধারণতঃ ভূমিজ, কোরা, মুণ্ডারি, কুর্মি, বাগদি, সাঁওতাল ও লোধা জাতিসমূহেরই জীবিকা ছিল পাইক বৃত্তি। বিভিন্ন সামন্তরাজগণের রাজ্য রক্ষার জন্য ইহাদের নিয়োগ করা হইত আর পরিবর্তে তাহারা ভোগ করিত রাজ-প্রদত্ত জমি। পাইক প্রথা পুরুষানুক্রমিক হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জমিও বহুপুরুষ যাবৎ একই পরিবারের অধিকারভুক্ত থাকিত। সামন্তরাজশক্তি যখন কোম্পানির বিধানে হীনবল হইয়া পড়িল, তখন পাইকগণ কর্মচ্যুত হইল বটে কিন্তু পাইকান জমি তাহাদের দখলে রহিয়া গেল। ইং ১৭৯৩-৯৪ সালে পাইকান জমি বাজেয়াপ্ত হইতে আরম্ভ হয়; পুরাতন পাইকের স্থলে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নূতন বেতনভুক পাইক নিয়োগের নীতিও গ্রহণ করা হয়। ফলে পাইক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠে; বহু রাজ্যচ্যুত বা অসন্তুষ্ট ভূতপূর্ব সামন্ত এই অগ্নিতে ইন্ধন জোগান। স্থানীয় অধিবাসীর উপর তাঁহাদের প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল এবং পাইক শ্রেণীর অসন্তোষকে কেন্দ্র করিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে তাঁহারা দ্বিধা করিলেন না। সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, ইহাই "পাইক বিদ্রোহ" নামে খ্যাত। এ সম্বন্ধে, ইং ১৭৯৯

পাইক বিদ্রোহ

সালে মেদিনিপুরের কলেক্টর কলিকাতার রাজস্ব বোর্ডকে যে লিপি প্রেরণ করেন তাহা এই :

"পাইকান জমির প্রাক্তন দখলকারগণের অভিযোগ এই যে তাহাদের কোনরূপ অপরাধ বা গাফিলতি না থাকা সত্ত্বেও সরকার শুধুমাত্র যে তাহাদের স্বত্বে ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নহে ; তাহাদের জমি হইতে উৎখাত করিয়াছেন ও কর প্রদানের নূতন নূতন দাবি উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাহারা যে কোন আবেদন নিবেদনের ফললাভের আশা ত্যাগ করিয়া যাহা অবিচারে তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে তাহা উদ্ধারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ লইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার বা ক্রোধ করিবার কিছু নাই। মেদিনিপুরের পরিস্থিতি সেখানকার দেশীয় সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার পর গুরুতর হয়। এই সৈন্যবাহিনী কোম্পানির পক্ষে বহুস্থানে লড়াই করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের উপর। জঙ্গলমহলে শান্তি স্থাপন ও কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানি এই সৈন্যবাহিনী রাখার আর কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু এই সব সৈন্য ছিল সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল। তাহারা এখন হইল বেকার। অনেকেই বিদ্রোহে যোগদান করে।"

ইতিপূর্বে মানভূমের তোমরে অসন্তোষ বহ্নি জ্বলে। তারপর মেদিনিপুরের রাণীর সহিত কর্তৃপক্ষের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাঁহার জমিদারি খাস করা হয়। পাটকুম, পঞ্চকোট, ঝালদা, বরাভূম অঞ্চলে অশান্তি ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে এই সকল জমিদারির সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় না। মেদিনিপুর-রাণীর প্রভাবশালী কর্মচারীদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয় ; অসন্তুষ্ট কর্মচারিগণ পাইকগণকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উৎসাহ দেয়। রাণী স্বয়ং তাঁহার অনুচরবর্গ ও জঙ্গলমহলের অন্যান্য সামন্তগণসহ বিদ্রোহের অধিনায়কত্ব করেন। পঞ্চকোট জমিদারি রাজস্ব বাকীতে নিলাম হওয়ায় নীলাম্বর মিত্র খরিদ করেন কিন্তু পঞ্চকোট রাজা কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে পঞ্চকোটের সীমানায় পদ প্রসারও করিতে দিলেন না। ইং ১৭৯৮ সালের মধ্যে রায়পুর, সুপুর, অম্বিকানগর অঞ্চলে বিদ্রোহ বহ্নি ব্যাপ্ত হইল। রায়পুরের বিদ্রোহের অধিনায়ক হইলেন দুর্জন সিং। দুর্জন সিং ছিলেন

বিদ্রোহের বিস্তৃতি

রায়পুরের তালুকদার। তাঁহার পূর্বপুরুষ বিষ্ণুপুর-রাজ বংশীয় ফতে সিং সপ্তদশ শতাব্দীতে রায়পুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৭ সালে রায়পুর নিয়মিত রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু ১৭৯০-৯১ সালে রাজস্ব বাকী পড়ায় কোম্পানি সাজওয়াল নিযুক্ত করিয়া জমিদারি দখল করেন। দুর্জন সিং-এর আবেদন, নিবেদন, আদালতে আপিল প্রভৃতি কিছুই গ্রাহ্য হয় না। তখন পশ্চিমসীমান্তে কোম্পানির বিরুদ্ধে অসন্তোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বলরামপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের চোয়াড়গণ বিদ্রোহ করিয়াছে। বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বাগরী পরগনার জমিদার চিত্র সিং, ফুলকুসমার তালুকদার সুন্দর নারায়ণ, মেদিনিপুরের কর্ণগড়ের রাণী, আর ধলভূমের রাজা। দুর্জন সিং বিদ্রোহে যোগ দিলেন। দুর্জন সিং তাঁহার অনুচরবর্গসহ এরূপ হাঙ্গামার সৃষ্টি করেন যে কোম্পানির সিপাহী রায়পুর অঞ্চলে প্রেরিত হয়। ১৭৯৮ সালের জুলাই মাসে তাঁহার অধীনে প্রায় ১৫০০০ পাইক রায়পুর আক্রমণ করে।

দুর্জন সিং

বাজার ও কাছারীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাপক লুণ্ঠন। পাইকগণ অবশেষে রায়পুর অবরোধ করে। স্থানীয় জমিদার হইতে কোম্পানির সিপাহী কোন সাহায্য পাইল না, অন্যদিকে বিদ্রোহী পাইকগণ সর্বপ্রকার সাহায্য পাইল। বাধ্য হইয়া সিপাহীদল পশ্চাদপসরণ করে। এই বৎসরের জুন মাসেই উপজাতীয় সর্দারগণের পরিচালনায় বহুসংখ্যক লুণ্ঠনকারী বরাভূম ও মানভূম হইতে পঞ্চকোটে প্রবেশ করিয়া ব্যাপক হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। জুলাই মাসে মেদিনিপুরের বগরী পরগনার বাগদি নেতা গোবর্ধন দলপতির অধীনে একদল বিদ্রোহী চন্দ্রকোনা আক্রমণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে নয়াবসান অঞ্চলে হাঙ্গামা হয়। ইং ১৭৯৯ সালে হাঙ্গামার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। দুর্জন সিং মেদিনিপুর জিলার উপকণ্ঠ পর্যন্ত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, সুপুর ও অম্বিকানগর আক্রান্ত হয়।

গোবর্ধন দলপতি

সর্বত্র ফৌজ পাঠাইয়া এই ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করা কর্তৃপক্ষের দুঃসাধ্য হইল। মাত্র কয়েকজন অনুচরসহ দারোগা বিদ্রোহী সর্দারগণের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারে না ; হাঙ্গামার গুরুত্ব বুঝিয়া দারোগা বড় জোর জিলা শাসককে সৈন্যবাহিনী পাঠাইতে বলিতে পারিত। সংবাদ পাইবার পর

সৈন্যবাহিনী পাঠানও হইত কিন্তু বিদ্রোহীগণ কোম্পানির সৈন্যের সহিত সরাসরি যুদ্ধ এড়াইয়া যাইত। দুর্গম ও সুদূর অঞ্চল ছিল বিদ্রোহীদের আশ্রয় স্থল; সেখান হইতে অরক্ষিত অঞ্চলের উপর অতর্কিত আক্রমণ ও লুণ্ঠন তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। সুতরাং কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি মাত্র সাময়িক ফল প্রদান করিত।

এই ব্যাপক বিদ্রোহ দমনে কর্তৃপক্ষের বিশেষ বেগ পাইতে হয়। বিদ্রোহের ফলে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইং ১৮০৫ সালে বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনিপুর, বাঁকুড়া ও বর্তমান পুরুলিয়ার অংশ লইয়া গঠিত হয় "জঙ্গলমহল" নামে নূতন এক জনপদ। ইহার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সদর স্থাপিত হয় বাঁকুড়া শহরে। রাজস্ব পরিশাসন কিন্তু বর্ধমানের সহিত যুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থা চলিল ইং ১৮৩২ সাল পর্যন্ত।

বিদ্রোহ দমন ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন

ইং ১৮৩২ সালে বাঁকুড়ায় আবার অশান্তির আগুন জ্বলিয়া ওঠে। জঙ্গলমহলের ভূমিজদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করিয়া যে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় তাহার মূল কারণ হইল সংলগ্ন বরাভূম পরগনায় উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। গঙ্গানারায়ণ ছিলেন এই পরগনার মালিকি স্বত্বের একজন দাবিদার। এই বিষয় লইয়া আদালতে যে মোকদ্দমা হয় তাহার রায় হয় গঙ্গানারায়ণের বিপক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বরাভূম ও ইহার সংলগ্ন অম্বিকানগর, রায়পুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা প্রভৃতি অঞ্চলের যাবতীয় ভূমিজ সম্প্রদায় তাঁহার সহিত যোগদান করে। তাহাদের আক্রমণের সম্মুখে পুলিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিল, যাবতীয় সরকারী কর্মচারী পলায়ন করিয়া বাঁকুড়া শহরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছু সময়ের জন্য গঙ্গানারায়ণ উপরোক্ত অঞ্চলের প্রভু হইয়া ব্যাপক লুণ্ঠন ও ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আনয়ন করিয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীগণ পাহাড়ে ও জঙ্গলে আশ্রয় লয়। কোম্পানির সিপাহী সেখানে তাহাদের অনুসরণ করিলে তাহারা সিংভূমে পলাইয়া যায়। বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এই বিদ্রোহ "গঙ্গানারায়ণের হামলা" নামে পরিচিত।

ভূমিজ বিদ্রোহ— গঙ্গানারায়ণের হামলা

এই হাঙ্গামার ফলে শাসনব্যবস্থার আবার পরিবর্তন হয়। ইং ১৮৩৩

সালের বিধান অনুসারে বর্তমান বাঁকুড়া জিলার পশ্চিমাংশ হয় নবসৃষ্ট মানভূম জিলার অন্তর্গত। বর্তমান বাঁকুড়া শহরসহ পূর্বভাগের কোতুলপুর পর্যন্ত অঞ্চল লইয়া পশ্চিম বর্ধমান জিলা গঠিত হয়। গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামার পর বাঁকুড়ায় আর কোন উল্লেখযোগ্য বিশৃঙ্খলা হয় নাই, কিন্তু কর্তৃপক্ষ উপজাতীয়দের উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের এক প্রবল বাহিনী নিকটস্থ ছোট নাগপুর অঞ্চলে সক্রিয় থাকায় বাঁকুড়াস্থিত শেখাবতী রেজিমেণ্ট ও ভূমিজ এবং সাঁওতালদের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়, ফলে কর্তৃপক্ষেব ইহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

শাসন ব্যবস্থার পুনরায় পরিবর্তন

জঙ্গলমহলের প্রাক্তন স্বাধীন সামন্ত রাজবংশের পরিণাম অপ্রীতিকর। ইং ১৮৩৩ সালের ১৩ বিধান বা রেগুলেশন অনুসারে জিলাব পশ্চিমভাগস্থিত জঙ্গলমহল অঞ্চল মানভূমের সহিত যুক্ত থাকায় কোম্পানির সাধারণ আইন কানুন এখানে বলবৎ ছিল না। ইং ১৮৭২ সালে ছাতনা বাঁকুড়া জিলার সহিত যুক্ত হব, অন্যান্য মহলগুলি ইহার সাত বৎসর পর এই জিলার অন্তর্গত হয়। প্রচলিত রাজস্ব বিধান সমূহ এই অঞ্চলের উপর প্রযোজ্য হয় ও ইহার সহিত প্রাচীন সামন্ত রাজবংশের অবলুপ্তির পথ উন্মুক্ত হয়। আভ্যন্তরীণ শাসন কার্যে এই সামন্তরাজগণ হইয়া পড়িয়াছিলেন শিথিল ও অনুপযুক্ত, রাজস্ব আদায় ব্যাপারেও তাঁহারা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। নগদ অর্থের প্রলোভনে জমিদারির অধিকাংশ অত্যধিক সেলামি আদায়ে কিন্তু নামমাত্র জমায় মধ্যস্বত্বাধিকারীর সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা নিজেদের সর্বনাশের পথ সুগম করেন। সুতরাং প্রায় সবগুলিই দেনার দায়ে বিক্রিত হয়, রক্ষা পাইল মাত্র ছাতনা, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা। কিন্তু ছাতনার আর্থিক অবস্থা এমন হইয়া পড়ে যে রাজস্ব বাকীর জন্য সরকারের তত্ত্বাবধানে যাইতে হয়।

সামন্ত রাজশক্তিব পবিণতি

সুপুরের পতন হয় প্রথম, দেনার দায়ে জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে ডিক্রি হয়। ডেপুটি কমিশনার ড্যালটন (Dalton) সাহেব কিছু অংশ রাজপরিবারের জন্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইহার নয় তরফকে পৃথক করিয়াছিলেন; ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল এক একটি তৌজি।

ইহাদের পাঁচটি ডিক্রির দায়ে বিক্রয় হয়। ইং ১৮৮৯ সালে মর্টগেজ ডিক্রিজারীতে অম্বিকানগর বিক্রয় হয়। এই বৎসর সেস্‌ বাকী রাখার জন্য শ্যামসুন্দরপুর বিক্রয় হয়। রায়পুর জমিদারি বিক্রয় হয় ইং ১৯১৩ সালে মর্টগেজ ডিক্রিজারীতে ও ফুলকুসমা ইং ১৯১৫ সালে মনি ডিক্রিজারীতে। এক ফুলকুসমা ভিন্ন সবগুলি খরিদ করেন বহিরাগত বাঙ্গালী।

ম্যয় ভুখাছঁ

"ওকাতেম্ চালাঃ কানা" (১)

"নামাল"

রায়পুর হইতে যে পথ শিলাই নদী অতিক্রম করিয়া বাঁকুড়া শহরের দিকে গিয়াছে, প্রতিবৎসর চাষের মরশুমে দেখা যায় যে শ্রেণীবদ্ধ সাঁওতাল পরিবার চলিয়াছে সেই পথ ধরিয়া উত্তর দিকে। ইহাদের মধ্যে আছে পুরুষ, নারী, শিশুসন্তান, সঙ্গে সামান্য তৈজসপত্র। ইহারা যাইতেছে বর্ধমান বা হুগলি জিলায়—নামালে—কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য। শত শত সাঁওতাল পরিবার এই ভাবে জিলার বাহিরে যায় প্রতিবৎসর, চাষের কাজ—ধান রোপণ, ধানকাটা—শেষ হইলে আবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। দেশে যদি বা কাহারও সামান্য কৃষিজমি থাকে, জীবনধারণের পক্ষে তাহা নিতান্ত অপর্যাপ্ত। অথচ এই রায়পুর অঞ্চল কৃষি-সমৃদ্ধ। ১৭৬৭ সালে যখন ফার্গুসন সাহেব জঙ্গল-মহলে সামরিক অভিযান পরিচালিত করেন, রায়পুর পরগনার সাধারণ কৃষকের স্বচ্ছল অবস্থা তাঁহাকে মুগ্ধ করে। তাঁহার বর্ণনায়, আবাদি জমির পরিমাণ এখানে জঙ্গলমহলের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেক বেশী, রায়পুর দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী পরগনা। কিন্তু তারপর শতাব্দী অতীত না হইতেই দেখা যায়, অধিবাসীগণ দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট। শুধু রায়পুর কেন, বাঁকুড়ার অন্যান্য বহু অঞ্চলের সাধারণ কৃষক প্রজার যে পরিচয় আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিল তাহা নিতান্তই অপ্রীতিকর ও হতাশাব্যঞ্জক। উনবিংশ শতাব্দী শেষ না হইতেই বাহিরের জগতে বাঁকুড়ার কুখ্যাতি হইল ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট পরিচয়ে। ইহা হইল দীর্ঘ শোষণের পরিণতি। শোষণের প্রথম অধ্যায়ে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে ইংরেজ কোম্পানির দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের নীতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৎপর হয় কৃষি-জমি লোলুপ সম্প্রদায় বিশেষ।

কোম্পানি শাসনের প্রথম প্রতিক্রিয়া

---

(১) কোথায় যাচ্ছ গো? কথাটি সাঁওতালি।

বিষ্ণুপুর ও জঙ্গল মহলে শাসন-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানি বাণিজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ইতিপূর্বেই কোম্পানি বাংলা দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অবাধ স্বাধীনতা লাভ করেন। কোম্পানি-অর্জিত বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করিতেও কোম্পানির অধস্তন কর্মচারিগণ ত্রুটি করিলেন না। ক্রমে গবর্নর হইতে নিম্নস্তরের ইংরেজ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন; অনেকে আবার নিজেরাই কোম্পানি গঠন করিয়া জিলায় জিলায় ইংরেজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। ১৭৬৫ সালে ট্রেডিং এসোসিয়েশন (Trading Association) নামে ইংরেজ বণিকগণের এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির যাবতীয় ইংরেজ কর্মচারী হইলেন ইহার সভ্য। লবণ ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ দেখিয়া বণিক সভা আদেশ জারী করিলেন যে এদেশে যত লবণ উৎপন্ন হইবে তাহার সমুদয় স্থানীয় প্রতিনিধি বা কুঠিয়ালের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে, পরে ইহা অধিকতর মূল্যে দেশীয় মহাজনদের নিকট বিক্রয় করা হইবে। মহাজনগণ ইহার উপর লাভ রাখিয়া জনসাধারণকে বিক্রয় করিবেন। ফলে লবণের মূল্য যাহা দাঁড়াইল, সাধারণের নিকট তাহা হইল অত্যধিক। বণিক সভার কার্যপ্রণালী ও লবণের এই একচেটিয়া ব্যবসায় কোম্পানির বিলাতস্থিত ডিরেক্টরগণ প্রথমে অনুমোদন করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে কোম্পানির কর্মচারিগণ এই লাভজনক ব্যবসায় কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না, তখন তাঁহারা ইহার স্বীকৃতি দান করিলেন তবে লবণের সর্বোচ্চ দাম নির্দেশ করিলেন মণ প্রতি পাঁচ টাকা। ১৭৭৯ সালের এক আইন দ্বারা দেশবাসীর পক্ষে লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ হয়। ১৭৮১ সালে কোম্পানি লবণ-বিভাগ স্থাপন করেন ও ইংরেজ কর্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে লবণ তৈয়ারী আরম্ভ হয়। এই সকল বিধানের ফলে যাহারা এ যাবৎ লবণ প্রস্তুত বা লবণের ব্যবসায় দ্বারা অন্নসংস্থান করিত, তাহারা হারাইল জীবিকার উপায়।

কোম্পানির শোষণ নীতি

লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়

তারপর আরম্ভ হয় দেশীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের প্রচেষ্টা। বস্ত্রশিল্পকে করায়ত্তে আনিবার উদ্দেশ্যে কোম্পানির কর্মচারিগণ দেশীয় তন্তুবায় শ্রেণীর মধ্যে দাদন প্রথা প্রচলিত করেন। তন্তুবায়দের সহিত ব্যবস্থা হইল যে নির্দিষ্ট মূল্যে ও সময়ের মধ্যে

দেশীয় তাঁত শিল্প ধ্বংস

নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতী-বস্ত্র সরবরাহ করিতে হইবে। অবস্থার সুযোগ লইয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ অনেক সময় তন্তুবায়কে নিজ স্বার্থবিরোধী চুক্তিনামায় স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিতেন; ইহার জন্য শারীরিক উৎপীড়ন করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। বস্ত্রের ন্যায্য দাম যাহা হওয়া উচিত, তন্তুবায় পাইত তাহা অপেক্ষা কম, অনেক সময় প্রাপ্য মূল্য এত কম ধরা হইত যে কাঁচা মাল ক্রয়ের ব্যয়ও আদায় করা হইত না। আবার উৎপীড়নের ভয় দেখাইয়া তন্তুবায়কে অন্য কাহারও জন্য বস্ত্র উৎপাদনে নিষিদ্ধ করা হইত। রেশম বস্ত্র সম্বন্ধেও এই নীতি অবলম্বন করা হয়। কাহিনী প্রচলিত আছে যে বলপ্রয়োগে কোম্পানির স্বার্থে বস্ত্র উৎপাদন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু তন্তুবায় নিজ নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলে। কাহিনী অতি-রঞ্জিত হইতে পারে কিন্তু ইহা সত্য যে কোম্পানির কর্মচারিগণের উৎপীড়নে তন্তুবায় শ্রেণী বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

ইহার পর যে অধ্যায়ের সূচনা হয় তাহা দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উপর সুগভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া বংশানুক্রমে তাঁত চালাইয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করিত তাহাদের সর্বনাশ সাধন করে। এতাবৎ কোম্পানি দেশীয় বস্ত্রজাত দ্রব্যাদি বিলাতে রপ্তানি করিতেন। এদেশে প্রস্তুত তাঁত ও রেশম বস্ত্রের চাহিদা ছিল সেখানে প্রচুর। ইতিমধ্যে বিলাতে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিলাতের বস্ত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য আইনের সাহায্যে বাহির হইতে বস্ত্রাদির আমদানি নিষিদ্ধ হয়। উন্নত ধরনের যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া বিলাতের শিল্পী-গোষ্ঠী বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সাধন করে। ফলে বিলাতে এ দেশীয় বস্ত্রাদির চাহিদা কমিয়া যায় ও তৈয়ারী মালের পরিবর্তে কাঁচা মাল রপ্তানির উপরই কোম্পানির অধিকতর দৃষ্টি পড়ে। তারপর আরম্ভ হয় মানচেস্টার হইতে এদেশে সূতী-বস্ত্র আমদানির পরিকল্পনা। যন্ত্র পরিচালিত তাঁতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানচেস্টার হইতে উৎপন্ন হইতে থাকে প্রচুর পরিমাণে কম মূল্যের সূতী-বস্ত্র; এই শ্রেণীর সূতী-বস্ত্রে বাজার ছাইয়া যায়। ১৭৮৬ হইতে ১৭৯০ সালের মধ্যে যে পরিমাণ সূতী-বস্ত্র মানচেস্টার হইতে এদেশে আমদানি হয়, তাহার বাৎসরিক মূল্য গড়ে হয় ১২ লক্ষ পাউণ্ড; ১৮০৯ সালে ইহা দাঁড়ায় এক কোটি চুরাশী লক্ষ পাউণ্ড।

রেশম ও চিনি শিল্পে হস্তক্ষেপ

রেশম শিল্পের অবনতি বিষ্ণুপুর রাজবংশের দৈন্য অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়; কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়

এই শিল্পকেও গ্রাস করে। চিনির ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইয়া কোম্পানি দেশীয় চিনি উৎপন্নকারী ও চিনি ব্যবসায়ীর স্বার্থে হস্তক্ষেপ করেন। কালক্রমে ইংরেজ বণিকের দৃষ্টি পড়ে উর্বর শস্য ক্ষেত্রের উপর। যে ভাবে তাঁহারা কৃষক নির্যাতন দ্বারা শস্য উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়াইলেন তাহা হইল নীল চাষ। নীল চাষের প্রসারের জন্য নীলকর সাহেবগণ কৃষককে তাহার উর্বর জমিতে নীল চাষ করাইতে বাধ্য করিত; তাহাদেরই ধার্য মূল্যে জন্মা-অজন্মা, হাজা-শুকা প্রভৃতির বিচার না করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে নীলের গাছ লইবার অধিকারী ছিল তাহারা। কৃষকের কোন লাভ হইত না, ইহার পরিবর্তে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বকেয়া প্রাপ্য বাবদ সে নীলকরের নিকট ঋণগ্রস্ত থাকিত।

নীলচাষ

কোম্পানির বণিকগণ যে-সকল কেন্দ্র হইতে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন তাহাদের সাধারণ নাম ছিল "কুঠি"। "কুঠি-র তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে থাকিতেন একজন ইংরেজ, তাঁহাকে বলা হইত "কুঠিয়াল সাহেব"। জিলায় এইরূপ বহু কুঠি ছিল। একটি প্রধান কুঠি ছিল সোনামুখীতে, ইহার অধীন ছিল ৩১টি আড়ং বা বাজার। পাত্রসায়র ছাড়াও বীরভূমের সুরুল ও ইলাম বাজার ছিল এই সব আড়ং-এর মধ্যে। সোনামুখী, বিষ্ণুপুর ও পাত্রসায়রে চিনির কারখানাও স্থাপন করে কোম্পানির কর্মচারিগণ। ইংরেজ-শাসক-গোষ্ঠী-পুষ্ট কুঠিয়াল ছিল অসামান্য প্রতাপশালী; তাহার অত্যাচার উৎপীড়নেরও সীমা ছিল না। হাণ্টার সাহেব তাঁহার Annals of Rural Bengal অর্থাৎ "পল্লী বাংলার কাহিনী" পুস্তকে এইরূপ একজন কুঠিয়ালের পরিচয় দিয়াছেন—তিনি হইতেছেন সোনামুখী কুঠির বড় সাহেব চিপ্‌। হাণ্টার সাহেবের কথায়

কুঠিয়াল সাহেব

"সর্বশ্রেণীর শিল্পজীবী ছিল তাঁহার বেতনভুক। তিনি যখন এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে যাতায়াত করিতেন, উমেদারদলের সুদীর্ঘ সারি তাঁহাকে অনুসরণ করিত। এই মিছিল যখন কোন পল্লীর মধ্য দিয়া যাইত, স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ সন্তানকে উঁচু করিয়া ধরিত, যাহাতে সাহেবের পাল্‌কি দর্শনে ধন্য হয়, আর গ্রামবৃদ্ধগণ তাহাদের সর্বশক্তিমান অন্নদাতাকে মাথা নত করিয়া অভিবাদন জানাইত। যদি কোন শিশুর উপর সাহেবের পাল্‌কির ছায়া পড়িত, তাহাকে মনে করা হইত পরম ভাগ্যবান।"

দেখা যায় যে কোম্পানির শাসন প্রবর্তনের পর অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই দেশের

শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। যে সকল শ্রেণীর শিল্প-বাণিজ্যই প্রধান অবলম্বন ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে হইল বৃত্তিহীন। ইহার ফলে কৃষি-জমির দিকে তাহারা আকৃষ্ট হইতে লাগিল আর ইহার ফলে কৃষিজমির উপর অস্বাভাবিক ভার-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়া এক অপ্রীতিকর অবস্থা আনয়ন করিল।

দেশীয় শিল্পের অবনতির কুফল

মল্ল-শাসনের যুগ হইতেই কৃষক প্রজা তাহার কৃষিজমিতে কয়েকটি বিশেষ অধিকার অর্জন করিয়া আসিতেছিল। আবার রাজ প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর দানাদি দ্বারা কোন কোন বিশেষ সম্প্রদায় যে বিশাল ভূমির অধিকারী হইলেন তাঁহারা কৃষিকার্যে অপারগ হওয়ায় নিজ নিজ ভূমি আবাদ করিতে বা কৃষি-কার্যের উপযোগী করিতে এই সব বন্দোবস্ত করেন মূল কৃষিজীবীর সহিত, কৃষক প্রজার পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক চুক্তিতে। এই চুক্তি আরও সহজ ও সরল হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর। মন্বন্তরে লোক ক্ষয়ের ফলে আবাদি জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ায় অনেক কম। সুতরাং নূতন নূতন সুবিধা প্রদানে প্রজা পত্তন ও অঞ্চলের বাহির হইতে কৃষক সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করা ভিন্ন উপায় থাকিল না। এই সুবিধাগুলি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত কালকেতুর উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়ঃ—

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে কৃষক প্রজা

"শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বাহি দিও কর।
হাল পিছে একতঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
খন্দে নাহি নিব বাড়ি রহে বসে দিও কড়ি
ডিহীদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ী নানাভাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট দেশে।"

কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশের শাসন সময় দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। বিষ্ণুপুরের উপর ইহার প্রতিক্রিয়ার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া

সমগ্র বিষ্ণুপুর নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জমিদারের সহিত চিরস্থায়ী স্বত্বে বন্দোবস্ত হয়, যেমন হয় বাংলার কোম্পানি শাসিত অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে। জমিদারি প্রথা কৃষক প্রজার পক্ষে অনুকূল হয় নাই। জমিদারগণ সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পর হইতেই স্বার্থান্বেষী হইয়া পড়েন। নিজ নিজ খাস জমির আয়তন বৃদ্ধি, আত্মীয়স্বজনের স্বার্থ ও অধিকতর লাভ ক্লাম্য হইতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই।

কৃষক প্রজা, বিষ্ণুপুর অঞ্চল

তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে কৃষক প্রজার জমির উপর। আইন তখন ছিল জমিদারের পক্ষে, সরকার রাজস্ব আদায়ের নিশ্চিত ব্যবস্থার স্বার্থে জমিদারের পৃষ্ঠপোষক। জমিদারগণ প্রচলিত আইনের সুবিধা লইতে কার্পণ্য করিলেন না, আর ইহার ফলে বহু স্থায়ী পুরাতন কৃষক কৃষিজমি হারায়, ও তাহাদের স্থলে আমদানি হয় নূতন অস্থায়ী কৃষক বর্ধিত খাজানার স্বীকৃতিতে। জমিদারগণ স্বনামে বা বেনামীতেও বহু প্রজার জমি আত্মসাৎ করেন। ইহার উপর আবির্ভাব হয় নানাপ্রকার অতিরিক্ত আদায় বা আবওয়াবের চাপ। এইসব কারণে এমন এক পরিস্থিতি উপস্থিত হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি জেমস্ মিল্ মন্তব্য করেন যে জমিদারি শাসনই দেশের ক্রমবর্ধমান ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতির কারণ। লর্ড হেষ্টিংস অভিমত দেন "আমাদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা সারা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রায় অধিকাংশই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতিত। আইন এই নির্যাতনকে স্বীকৃতিদান করে, কারণ, যে নীতি অনুসরণ করা হয় তাহাতে বিবদমান কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য প্রজার বিরুদ্ধে ও জমিদারের স্বপক্ষে আইনের প্রয়োগ হয়।" ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন কৃষক প্রজাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই ; ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন কৃষকের বহু অধিকারকে স্বীকৃতি দান করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে কিন্তু সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীকে রক্ষা করিতে পারে নাই। এসম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে।

খণ্ডজাতি বা উপজাতি প্রধান পশ্চিম অঞ্চলে কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। কিন্তু এই শাসনের ফলে এমন

একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা জমিদার বা প্রজা কাহারও পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। স্বাধীন সামন্তগণের আমলে এই অঞ্চলের সাধারণ কৃষক-জীবন ছিল সহজ ও সুখী। প্রতি গ্রামে ছিল গ্রাম-প্রধান বা মণ্ডল। মণ্ডল প্রজা ও

উপজাতিপ্রধান অঞ্চল—
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া

রাজার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিত। জমি বন্দোবস্ত, খাজনা আদায় প্রভৃতি ছিল তাহার দায়িত্ব। যখন কোন অঞ্চল অরণ্যমুক্ত করিয়া চাষাবাদের জন্য বন্দোবস্তের যোগ্য বিবেচিত হইত, মণ্ডল প্রতি প্রজার মধ্যে জমি ভাগ করিয়া দিত, রাজার প্রতিনিধি হিসাবে প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিত, চাষ আবাদের সুবিধার জন্য জলাশয় খনন করিত। বিনিময়ে মণ্ডলকে দেওয়া হইত কিছু জমি, ইহাকে বলা হইত মান-জমি। এদিকে আবার জঙ্গল মহলের সামন্তরাজগণ বাহিরের কোন প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া একরূপ স্বাধীন ভাবে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের ভূমি সংক্রান্ত বিধিও ছিল সরল, সহজ। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই এই অঞ্চলের চিরাচরিত ভূমিশাসন ব্যবস্থার উপর দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সহিত। পরাজিত সামন্তরাজগণের সহিত কোম্পানির যে রাজস্ব চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহার ভিত্তি হইল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বিষ্ণুপুর রাজ্যের ন্যায় জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রেও এই বন্দোবস্ত মঙ্গলদায়ক হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান শর্ত হইল নিয়মিত ভাবে ও ধার্য সময়ে কোম্পানির সেরেস্তায় রাজস্ব প্রদান, অন্যথায় তালুক নিলামে বিক্রয়। প্রাচীন সামন্তবর্গের পক্ষে নিয়মিত ভাবে ধার্য সময়ে রাজস্ব জমা দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল, এই ব্যবস্থায় তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাঁহারা আবহমান কাল একরূপ স্বাধীনভাবে চলিয়া আসিয়াছেন, বহির্জগতের সহিত ঘনিষ্ট যোগাযোগের অভাবে যাঁহারা ব্যবসায়িত্মিকা বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই নববিধান হইল অস্বস্তিকর, আর সৃষ্টি করিল এক অনিশ্চয় অশান্ত পরিবেশের। আবার বাহিরের সহিত সংস্পর্শ তাঁহাদের মধ্যে আনিল অনভ্যস্ত বিলাস ব্যসন। ফলে অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন ও বাস্তব জ্ঞানে শক্তিমান বহিরাগতদের প্রভাবে পড়িতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই। এই অঞ্চলে ইহাদের আগমন হয় ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই। তাহাদের বুদ্ধি ছিল প্রখর, বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন, অর্থবলও ছিল পর্যাপ্ত। স্থানীয় সামন্ত বা জমিদার শ্রেণীর অর্থাভাব তাহারা মিটাইল অতিরিক্ত সুদে অবাধ ঋণ প্রদানে। কিন্তু অমিতব্যয়ী ভূস্বামীগণ এই ঋণভার পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলেন। তখন

সুবিধা বুঝিয়া তাহারা জমিদারির বিভিন্ন অংশ নিজেদের সুবিধাজনক স্বত্বে ঋণগ্রস্ত ভূস্বামী হইতে বন্দোবস্ত লইয়া কৃষক-প্রজার উপরিস্থ মালিক হইয়া বসিল। এই ভাবে জমিদার ও কৃষক-প্রজার মধ্যে সৃষ্ট হয় এক শ্রেণীর মধ্য-স্বত্বাধিকারী। দেশের কৃষক-প্রজার সহিত কোন স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ না থাকায়, তাহাদের স্বার্থের দিকে ইহাদের দৃষ্টি সেই পরিমাণে ছিল না যেমন ছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দিকে, যাহার মূলে ছিল অদম্য ভূমিলিপ্সা। ইহারা ক্রমে ক্রমে গ্রাম-মণ্ডলের প্রভাব বিনষ্ট করিল, মানজমি হইতে মণ্ডলকে বিচ্যুত করিল, অথবা মানজমি মণ্ডলের সহিত খাজানায় বন্দোবস্ত করিল। আবার প্রজার উপরিস্থ মালিক হইয়া যে অধিকার পাইল তাহার ফলে হইল প্রজার খাজানা বৃদ্ধি ও এই বাবদ অতিরিক্ত আয় নিজের স্বার্থে নিয়োগ।

ইহার সহিত জড়িত হয় আর এক অধ্যায়। দেশে আবির্ভূত হয় নূতন এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে সাধারণতঃ শিল্পী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসা-জীবী প্রভৃতি সম্প্রদায় হইতে। পুর্বে বলা হইয়াছে ইংরেজী শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার কি ভাবে দেশের এক শ্রেণীকে কৃষিজমির দিকে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য করে। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সহিত আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দেশের অনেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, সরকারী উচ্চপদেও প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আবার বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেই বহু বাঙালী নূতন নূতন ব্যবসায়ে অগ্রগামী হন। ইঁহারা দেখিলেন যে উদ্‌বৃত্ত অর্থ সুষ্ঠু, সহজ ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নিয়োগ করার পক্ষে ভূমি হইল উপযুক্ত ক্ষেত্র। ইঁহারা ভূমিতেই মনোনিবেশ করেন। জমিদারি বা তাহার অংশ ক্রয়, উপরিস্থ মালিক হইতে অধস্তন স্বত্বে বন্দোবস্ত গ্রহণ, নিলামের মাধ্যমে জমি ক্রয়, জমিদার হইতে খাস-জমি বন্দোবস্ত, প্রজার জমি কবলার সাহায্যে হস্তগত করা প্রভৃতি উপায়ে ইঁহারা প্রভূত ভূ-সম্পত্তি অর্জন করেন। মহাজনি ব্যবসায়ও বিনা আয়াসে ভূ-সম্পত্তি লাভের এক প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া পরিগণিত হয়। অধিকাংশ উচ্চ বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বিত্তশালী পরিবার ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করে মহাজনি ব্যবসায়। কৃষককে অসময়ে অতিরিক্ত সুদে ঋণ দান, ঋণ পরিশোধের অক্ষমতায় তাহার জমি হস্তগত করা হইল এই শ্রেণীর অনুসৃত নীতি। কার্যসূচীতে যে বহুস্থানে অসাধুতার প্রশ্রয় দেওয়া হইত তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন রবার্টসন তাঁহার বাঁকুড়ার

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও ভূমিচ্যুত কৃষিজীবী

জরিপ ও স্বত্ব লিখনের চূড়ান্ত বিবরণীতে।[১] ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা হইল "ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী দেশের অধিকাংশ অর্থ হস্তগত করিয়া ভূ-সম্পত্তি অর্জনে নিয়োগ করিয়াছে; জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর সাধারণ প্রবৃত্তিই হইল—চিরস্থায়ীস্বত্ব-বিশিষ্ট কৃষক প্রজাকে অস্থায়ী প্রজায় রূপান্তর করা।"[২] আবাদি জমি কৃষক প্রজার হস্তচ্যুত হইয়া এমন এক শ্রেণীর মধ্যে আত্মগোপন করিল যাহারা চাষী হওয়া দূরে থাকুক কৃষক সম্প্রদায়ভুক্তই ছিল না; ইহাদের অনেকে আবার বহিরাগত। সুতরাং প্রসার লাভ করিল সাঁজা ও ভাগ প্রথার, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার আংশিক খাজানা ও আংশিক সাঁজা প্রথায়। এই ভাবে জমি বন্দোবস্তের সময় উর্বর জমি রাখা হইত মালিকের নিজ দখলে আর ইহা আবাদের জন্য নিযুক্ত হয় ভাগচাষী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব কৃষকপ্রজা। নিকৃষ্ট জমি বন্দোবস্ত হয় সাঁজায় কিন্তু উর্বর জমির উৎপন্ন শস্যের হারে। ফলে কৃষক প্রজার অবস্থা যায় অবনতির দিকে। উপরিস্থ মালিকের প্রাপ্য ফসলের অংশ মিটাইয়া কৃষকপ্রজার যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে তাহার সাংবৎসরিক আহার জুটিত না, ফসলের উৎপাদন উৎকৃষ্ট হইলেও না। অনেকে হইল ভূমিহীন।

ভাগ ও সাঁজা প্রথার প্রসার

দেখা যায় যে ১৯৫৪ সালের জমিদারি গ্রহণ আইন বলবৎ হইবার পূর্বে জিলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের কৃষককুলের এক বৃহৎ অংশ সাঁজা প্রথায় জমি চাষ করিত। এই প্রথানুযায়ী কৃষককে জমি চাষ বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দিতে হইত উপরিস্থ মালিককে। দেয় শস্যের হার ছিল অত্যধিক, শস্যহানি বা অজন্মা বিচারে আসিত না। অনাদায়ে জমি খাস করিয়া অন্য প্রজার সহিত বন্দোবস্ত হইত যদি না মহাজনের নিকট হইতে অতিরিক্ত সুদে শস্য ঋণ গ্রহণে ঘাটতি পূরণ করা হইত। উপরিস্থ মালিকও সময় সময় মহাজন হইয়া দাঁড়াইত। ফলে সাধারণ কৃষক প্রজার জীবন হয় দাসের জীবন, যেখানে নিজের ও পরিবার-বর্গের অন্নসংস্থানের উপায় নির্ধারণই ছিল একমাত্র চিন্তা। অনাবৃষ্টি, অনিয়মিত বৃষ্টি বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে শস্যক্ষয়জনিত অভাবের ছায়া অন্য কাহারও উপর সেইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নাই যেমন করিত কৃষক প্রজার উপর।

কৃষিজীবীর দুরবস্থা

(১) Final Report of Survey and Settlement—Bankura
(২) ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্ট

সুতরাং দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব এই অঞ্চলে যে একরূপ চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে তাহা স্বাভাবিক।

প্রথম ব্যাপক খাদ্যাভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ইং ১৮৬৬ সালে। ১৮৬৬ সাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত জিলায় যে সকল খাদ্যাভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে গড়ে প্রায় ৫ বৎসর অন্তর হইয়াছে ইহাদের আবির্ভাব; কোনটির রূপ বহু ব্যাপক ও ভয়াবহ, কোনটি আবার বহুব্যাপক না হইলেও নিতান্ত উদ্বেগজনক। গড়ে ৫ বৎসর অন্তর নিদারুণ খাদ্যাভাবের পরিচয় পশ্চিম বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই সব খাদ্যাভাবের তীব্রতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে একটি বিষয় বেশ পরিষ্কার হইয়া প্রকাশ পায় এবং তাহা হইল যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইহার জন্য দায়ী হইলেও তীব্রতার বৃদ্ধি উৎসাহিত করিয়াছে মহাজন শ্রেণী ও অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়ের উদাসীনতা আর মজুত খাদ্যশস্য যাহা ছিল অধিকতর লাভের আশায় তাহা বাহিরে রপ্তানি করা। বিগত শতাব্দীতে জিলার যে তিনটি নিদারুণ খাদ্যসঙ্কট দুর্ভিক্ষের আকারে প্রকাশ পায় তাহাদের পিছনে ছিল এই রহস্য। এই তিনটি দুর্ভিক্ষের একটি হয় ১৮৬৬ সালে, একটি ১৮৭৪ সালে ও অন্যটি ১৮৯৭ সালে। তিনটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ সাঁওতাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উপর ইহাদের দারুণ প্রতিক্রিয়া এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করে যেমন করে পরবর্তী ১৯১৫-১৬ সালের দুর্ভিক্ষ।

খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ

ইং ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বিশেষ অনুভূত হয় জিলার পশ্চিমাংশে। দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ অনাবৃষ্টি হইলেও নির্বিচারে জিলার বাহিরে ধান চাউল রপ্তানি ইহার তীব্রতা বৃদ্ধি করে। পূর্ব বৎসর মেদিনিপুর ও মানভূম অঞ্চলে শস্যহানির জন্য বাঁকুড়া হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য এই সব স্থানে চালান যায়। ফলে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ইং ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে টাকায় ৩২ সের হইতে ২৫ সের ওঠে। আগষ্ট মাসে ইহা হয় টাকায় ২২ সের। সেপ্টেম্বর মাসে বোঝা যায় যে অপর্যাপ্ত বৃষ্টির জন্য আমন ধানের ফলনের আশা কম। তখন চাউলের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়া টাকায় ১৫ সের হয়। ইং ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই মূল্য বলবৎ থাকে, তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে হয় ১৩ সের, এপ্রিলে ১১ সের, মে মাসে ১০ সের, জুন মাসে

দুর্ভিক্ষ—১৮৬৬ সাল

সাড়ে ৭ সের, জুলাই মাসে ৬ সের ৯ ছটাক, আগষ্ট মাসে ৬ সের, সেপ্টেম্বর মাসে ৫ সের ৪ ছটাক। একদিকে শস্যহানি, অপরদিকে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য-মূল্য দেশে নিদারুণ অন্নাভাব সৃষ্টি করিল; অখাদ্য ও কুখাদ্য আহার যে পরিস্থিতি আনয়ন করিল তাহা হইতে আসিল মহামারীর প্রকোপ। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেখা দিল চরম বিপর্যয়। ক্ষুধার তাড়নায় ইহাদের অনেকে শিশু-সন্তান পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিল, অনেকে আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। অন্নাভাবে মৃত্যুর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইল। এই দুর্ভিক্ষে সাঁওতাল প্রমুখ কয়েকটি উপজাতি ধ্বংসপ্রায় হয়; যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদের বহুসংখ্যক দেশত্যাগ করিল; অনেকে আবার নিজ নিজ কৃষি জমি হস্তান্তর করিয়া অধস্তন প্রজা বা ভাগদারে পরিণত হইতে বাধ্য হইল। দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বিষ্ণুপুর অঞ্চলেও অনুভূত হয় ও বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় শ্রেণী সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ভিক্ষে সরকার পক্ষ হইতে খয়রাতি সাহায্য দান ও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু এই পরিকল্পনা গ্রহণের বিলম্ব হেতু কোনরূপ সাহায্য পৌঁছিবার পূর্বেই বহু সংখ্যক লোক হয় দেশত্যাগ করে না হয় ইহলোক পরিত্যাগ করে।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ জিলার পূর্বাঞ্চলে সমধিক বিস্তার লাভ করে নাই কিন্তু এই অঞ্চলের জন্য অন্য একটি দুর্দৈব অপেক্ষা করিয়াছিল। এই দুর্দৈব উপস্থিত হইল মহামারীর আকারে; মহামারীর প্রধান উপসর্গ ছিল অবিচ্ছেদী প্রবল জ্বর ও পরিণাম ছিল কোনরূপ চিকিৎসার অবকাশ না দিয়া মৃত্যু সংঘটন। ইতিপূর্বে এই মহামারী বর্ধমান জিলার এক বিস্তৃত জনপদ ধ্বংস করে। বাঁকুড়ার পূর্বাঞ্চলে ইহার প্রবেশ হয় সন্নিহিত এই বর্ধমান জিলা হইতে। এই কাল ব্যাধি "বর্ধমান জ্বর" আখ্যায় বহুকাল যাবৎ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ব্যাধির উৎপত্তির কারণ সঠিক নির্ণয় করা যায় না কিন্তু দেখা যায় যে, যে-সকল অঞ্চলে নৈসর্গিক বা অন্য কোন কারণে স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, বা যে সকল স্থান প্রাকৃতিক কারণে নিম্ন, বদ্ধ জলায় পরিপূর্ণ, সেইরূপ অঞ্চলেই এই ব্যাধির প্রসার হইয়াছে সমধিক। ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র বিষ্ণুপুর মহকুমা এই মহামারীর কবলে পড়ে; ইং ১৮৭২ সাল হইতে ইং ১৮৯১ সাল পর্যন্ত এই ব্যাধিজনিত মৃত্যুসংখ্যা এই মহকুমায় এইরূপ অধিক হয় যে জন্ম সংখ্যার মাত্রা অতিক্রম করে।

"বর্ধমান জ্বর"

তারপর ব্যাধির সন্ত মারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় কিন্তু নৈসর্গিক কারণে ইহার প্রকোপ এই অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ বর্তমান থাকিয়া অধিবাসীকে দুর্বল ও নিস্তেজ করিয়া দেয়। পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চ ও শুষ্কভূমিতে এই ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে নাই।

দুর্ভিক্ষ—১৮৭৪ সাল

ইং ১৮৭৪ সালে জিলা আর একটি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। ইহার পূর্ববর্তী দুই বৎসরের আংশিক শস্যহানি ও তৎসহ জিলার বাহিরে অবাধ খাদ্যশস্য রপ্তানি এই দুর্ভিক্ষের কারণ। বৎসরের প্রথম হইতেই খাদ্য পরিস্থিতি গুরুতর হয়, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা অবলম্বন মার্চ মাসেই আরম্ভ হয়; মে মাসের শেষদিকে দৈনিক প্রায় ১১০০০ হাজার ক্ষুধার্ত যথারীতি সাহায্য পাইতে থাকে। ইহা ভিন্ন প্রায় ৪০০০ হাজার লোক স্টেট রিলিফে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়। তারপর অবস্থার অবনতি ঘটে। বৃষ্টির স্বল্পতা হেতু চাষ আবাদ পিছাইয়া গেল; ক্ষেত মজুর কাজ পাইল না; সঙ্গে সঙ্গে চাউলের মূল্য-ও বৃদ্ধি পাইল। অবস্থাপন্ন কৃষক ভাগদার বা ক্ষেত মজুরকে ধান্য ঋণ দেওয়া বন্ধ করিল। ভিক্ষুকের ভিক্ষা বন্ধ হইল, সাধারণের দুর্দশার সীমা রহিল না। জুলাই মাসে প্রায় ৪০০০০ হাজার দুর্দশাগ্রস্তকে খয়রাতি সাহায্য দিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পরে অবশ্য বৃষ্টিপাতের সহিত চাষের অবস্থার উন্নতি হয়; ধানের উৎপাদনও ভাল হয় এবং সংকটের অবসান হয়।

ইহার পর আসিল অন্য একটি নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। ইং ১৮৯৭ সালে জিলায় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা ইং ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের ন্যায়ই হয় ব্যাপক ও ভয়াবহ।

দুর্ভিক্ষ—১৮৯৭ সাল

ইং ১৮৯৫ সালে অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের জন্য জিলার প্রায় সর্বত্র আংশিক শস্যহানি হয়। ইং ১৮৯৬ সালে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহাও আমন ধানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলে আমন ধানের গড় উৎপাদন প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। গঙ্গাজলঘাটি, শালতোড়া, মেজিয়া, সোনামুখী, রায়পুর, ও সিমলাপাল অঞ্চলে ধানের উৎপাদন গড়ে এক চতুর্থাংশ হয় কিনা সন্দেহ; তালডাংরা ও বরজোরা থানায় হয় ছয় আনা, ছাতনা অঞ্চলে পাঁচ আনা। বাহিরে অবাধ রপ্তানির সহিত উৎপন্ন ফসলের স্বল্পতা মিশিয়া এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করিল এবং ইং ১৮৯৭ সালের প্রথমেই বোঝা গেল যে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। ভিক্ষুক ও ক্ষুধার্ত বেকার ক্ষেত মজুরের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইল। মে মাস হইতেই সরকারের পক্ষ হইতে ত্রাণ কার্য-সূচী গৃহীত হয়,

পরে ইহার বিস্তার হয়। জিলার যে অঞ্চল সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত হয় তাহার পরিমাণ প্রায় ১১০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪,১৩,০০০। যাহারা সরকারী সাহায্য লাভ করে তাহাদের মধ্যে বাউরি, বাগদি, হারি, খয়রা ও সাঁওতালের সংখ্যাই ছিল সমধিক। দৈনিক প্রায় ৭০০০ দুঃস্থ পরিবার খয়রাতি সাহায্য পায়, বহু সংখ্যক আবার টেস্ট রিলিফ মাধ্যমে সাহায্য লাভ করে।

এই বৎসরেই আবার দেখা দেয় প্রবল বন্যা ; দামোদর ও কাঁসাই নদীতে প্রবল জলস্ফীতি ইহার কারণ। দামোদর তীরে প্রায় ৪-৫ হাজার একর আবাদি জমি বালুকাবৃত হয়, বহু গ্রাম ভাসিয়া যায় ও এক বিশাল অঞ্চলে সম্পূর্ণ শস্যহানি ঘটে।

---

(৩)

শেষ অঙ্ক

বর্তমান শতাব্দীর পূর্বেই বাঁকুড়া পরিচিত হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট, ক্ষয়িষ্ণু, অনুন্নত অঞ্চল নামে। কয়েক বৎসর অন্তর শস্যহানি বা অন্য কোন নৈসর্গিক বিপদ, সাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব, ব্যাধির প্রকোপ—ইহাই হইল জিলার সাধারণ চিত্র।

ক্ষয়িষ্ণু বাঁকুড়া

বর্তমান শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে হইতেছে ১৯০৭ সালে রায়পুর, ওঁদা, খাতরা প্রভৃতি অঞ্চলে দারুণ শস্যহানি ও ইহার ফলে তীব্র খাদ্যাভাব ; ১৯১৫-১৬ সালে দুর্ভিক্ষ, ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী, ১৯৩৪ সালে খাদ্যাভাব, ১৯৪১ সালের বন্যা, ১৯৪৩ সালে প্রবল দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৪ সালে মহামারী। ১৯০৭ সালের তীব্র খাদ্যাভাব উপক্রত অঞ্চলে ১৯০৮ সালের শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকিয়া বহু লোকক্ষয় ঘটায়। ১৯১৫-১৬ সালের দুর্ভিক্ষেও বহু লোকক্ষয় হয় ; খাদ্যাভাবের পীড়নে প্রায় ৫০০০ আদিবাসী উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা বাগানে শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয় (১)। এইসময় যে সঙ্কটত্রাণ কার্য-সূচী সরকার গ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে শুভঙ্করী দাঁড়ার সংস্কার অন্যতম। ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে জিলার লোকক্ষয়ের হার জন্মহারকে অতিক্রম করে। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে জিলার পূর্বপ্রান্তে ম্যালেরিয়া প্রকোপের ফলে বহু প্রাণহানি হয়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৪ সালের মহামারী ওঁদা, গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া, শালতোরা, জয়পুর, সোনামুখী, পাত্রসায়র অঞ্চলের জনসংখ্যা হ্রাস করিয়া দেয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ "পঞ্চাশের মন্বন্তর" (বাং ১৩৫০ সাল) নামে কুখ্যাত। সারা বাংলাদেশে ইহার করাল ছায়া পড়ে। অনেকে এই দুর্ভিক্ষকে "মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ" আখ্যা দেন। দেশে খাদ্যশস্যের প্রকৃত অভাব ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপানি আক্রমণ আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার

---

(১) এই সময় বহু সাঁওতাল পরিবার মিশনারী সম্প্রদায়ের উৎসাহে জলপাইগুড়ি জিলার আলিপুরদুয়ারে শামুকতলায় বসতি স্থাপন করে। এই বসতি সাঁওতাল কলোনি নামে পরিচিত হয়।

ইহার এক বিরাট অংশ ক্রয় করিয়া গুদামজাত করেন। এদিকে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির সহিত খাদ্যশস্য চলাচলের পথে হয় বিঘ্ন। খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণের ক্রয়শক্তির বাহিরে যায় ও ফলে নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণী অনশনের সম্মুখীন হয়। সরকার হইতে ত্রাণ কার্য-সূচী গৃহীত হইলেও বহু হতভাগ্যকে অনশন মৃত্যু বা দেশত্যাগের হাত হইতে রক্ষা করা যায় নাই।

খাদ্যাভাব ও দেশত্যাগ

জিলার প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষের সহিত জড়িত আছে ব্যাপক দেশত্যাগের কাহিনী—পিতৃপুরুষের ভিটামাটি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া সুদূর নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। এই দেশত্যাগ যে কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহা নিম্নের তথ্য প্রকাশ করিবে :

সময়				দেশত্যাগী লোকসংখ্যার পরিমাণ
ইং ১৮৮২ সাল হইতে	ইং	১৮৯১	সালের মধ্যে	৮৩৯৬০
,, ১৮৯২	,,	১৯০১	,,	১২৪৪০৬
,, ১৯০২	,,	১৯১১	,,	১১৯০০০
,, ১৯১২	,,	১৯২১	,,	১২২০০০
,, ১৯৪২	,,	১৯৫১	,,	৯৩১৪৭

প্রধানত: সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীগণই ইহার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পুর্বে তাহারা যাইত আসাম বা জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের চা বাগানে। বর্ধমান ও ধানবাদ শিল্পাঞ্চলের উন্নতি ও প্রসারণের পর তাহারা সেইদিকে আকৃষ্ট হয়।

ইং ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর হইতে প্রপ্রীড়িত আদিবাসীদের স্বার্থে বিশেষ আইন প্রণয়নের কথা সরকার চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, দারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে ইহারা বহু সংখ্যায় দেশত্যাগ করে, অনেকে আবার নিজেদের জমি জমা হস্তান্তর করিয়া সাঁজা প্রজায় বা ভাগদারে পরিণত হয়। কিন্তু সরকারের চিন্তাধারা কোন কার্যকরী ফল প্রসব করে নাই। তারপর কয়েকটি দুর্ভিক্ষে ইহারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইং ১৯১৫-১৬ সালের দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আদিবাসীদের রক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন এবং ইহার ফলে ইং ১৯১৮ সালে ইহাদের জমি জমা হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিয়া বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের এক বিশেষ বিধি লিপিবদ্ধ হয়। যেসব জমি তখন পর্যন্ত আদিবাসীদের অধিকারে ছিল, তাহার রক্ষা বিষয়ে এই বিধি ফলপ্রসূ হয় বটে কিন্তু তাহাদের

অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে তাহাদের রক্ষা করার এই বিধান যথেষ্ট হয় নাই। তাহাদের এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না যাহার উপর তাহারা নির্ভর করিতে পারে অসময়ে। অজন্মা বা শস্যহানির সময় প্রয়োজন খাদ্যশস্যের, চাষের জন্য প্রয়োজন হয় বীজ। অথচ জমিজমা হস্তান্তরের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঋণ গ্রহণ দ্বারা খাদ্যশস্য বা বীজ সংগ্রহের পথে সৃষ্টি করিল বাধা। ফলে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চলিল দেশত্যাগ—সাময়িক বা চিরকালের জন্য।

নবযুগের সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই সারা দেশে এক নূতন চিন্তাধারার সূচনা দেখা যায়। ইহা হইতে জন্মলাভ করে রাষ্ট্র-চেতনা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত দেশবাসী পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়াছে। ইহার ফলে যে দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয় তাহা সাহিত্য, কাব্য ও সংবাদপত্রকে প্রভাবান্বিত করিয়া যুব সম্প্রদায়ের উপর এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। এই দেশাত্মবোধ হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাব। কিন্তু কংগ্রেসের তৎকালীন কার্যক্রম, আবেদন-নিবেদনের কর্মসূচী, ইহার চরমপন্থীদের হতাশ করে। তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে দেশকে ইংরেজ শাসনের প্রভাব হইতে মুক্ত করার সঙ্কল্প পোষণ করিতেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যে স্বদেশীযুগের প্রবর্তন করে, সন্ত্রাসবাদীগণ সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৯০৬ সাল হইতে বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদ এক বিশিষ্ট আকৃতি ধারণ করে। জিলায় জিলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

জাতীয় কংগ্রেস

সন্ত্রাসবাদ

বাঁকুড়া সন্ত্রাসবাদীদের একটি কেন্দ্র হইয়া উঠে। সরকারী শাসনবিভাগও তৎপর হয়। সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে বহু যুবক ধৃত হন। বিনাবিচারে আটক, সন্দেহে গ্রেপ্তার প্রভৃতি দমন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অনেকে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ করেন। এই অবস্থা কয়েক বৎসর চলে। পুলিশী নির্যাতন চরমে উঠে, আর ইহার নিদর্শন স্বরূপ "সিন্ধুবালা" ঘটিত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার বহুকাল যাবৎ স্থানীয় অধিবাসীদের মনে জাগরিত ছিল। পুলিশ সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে "সিন্ধুবালা" নামে দুইটি ভদ্রমহিলাকে ধৃত করিয়া ইহাদের উপর যে নির্যাতন চালায় তাহাতে দেশবাসীর মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বঙ্গভঙ্গ

রহিত হওয়ার পরেও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধান্তে শাসন-তান্ত্রিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় ইংরেজকে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীগণ এই ধারনা পোষণ করেন নাই। যুদ্ধের পর প্রত্যাশিত শাসন-তান্ত্রিক সুবিধা লাভ হয় নাই এবং দেশবাসীর অসন্তোষ চরমে উঠে। এই অবস্থায় কংগ্রেস যে কর্ম-পন্থা অবলম্বন করে তাহা হইল সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন। ইহার ফলে সন্ত্রাসবাদ সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঁকুড়া এই আন্দোলনে যোগদান করে। স্কুল, কলেজ পরিত্যক্ত হয় এবং ইহাদের পরিবর্তে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ব্যবহার-জীবীগণ আদালত ত্যাগ করেন, গ্রামে গ্রামে চরকা প্রতিষ্ঠিত হয় ও কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্র আত্মপ্রকাশ করে। ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলে। জাতীয় বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশের অস্তিত্ব শীঘ্রই লোপ পায়; যে কয়টি অবশিষ্ট থাকে অমরকাননের দেশবন্ধু বিদ্যালয় তাহাদের অন্যতম। বিদেশী বস্ত্র ও সৌখীন দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য বহু নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হন। এই সময়কার এক বিশেষ ঘটনা ১৯২৬ সালে সরোজিনী নাইডুর বাঁকুড়ায় আগমন ও বিশাল জনতার নিকট হইতে অভিনন্দন গ্রহণ। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির গ্রেপতার উপলক্ষে বাঁকুড়ায় সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

ইহার পর নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইবার জন্যই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক, কংগ্রেস আন্দোলন বাঁকুড়ায় স্তিমিত হইয়া পড়ে। এই সুযোগে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আবার আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩১ সাল হইতে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বাঁকুড়ায় প্রবল হইয়াছে। বাঁকুড়া-গঙ্গাজলঘাটি রাস্তার উপর কাঞ্চনপুর জঙ্গলে মেল (ডাক) ডাকাতি হয়। ১৯৩২ সালে বিষ্ণুপুরের মহকুমা হাকিমকে হত্যার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। স্ত্রী-বাহিনী কর্তৃক দুইটি থানা অধিকারের প্রয়াসও হয়। ১৯৩৪ সালে কোতুলপুর থানার মীর্জাপুরে আবার সরকারী ডাক লুণ্ঠন হয়। বাঁকুড়া শহরে বাংলার লাট এণ্ডারসন সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এই সব ঘটনার পিছনে সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন ও যুগান্তর দলের হাত ছিল

সন্ত্রাসবাদের পুনরাবির্ভাব

বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তখন সরকারের নিকট বাঁকুড়া বিপজ্জনক এলাকা; বঙ্গীয় নিরাপত্তা আইনের ধারাগুলি এখানে বলবৎ করা হয়।

ইহার পর আসিল এক অভিনব গণ-আন্দোলন। ১৯৩৫ সালে সাইমন কমিশনের সুপারিশ, গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির ভিত্তিতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটি ভারতীয় শাসন সংস্কার আইন গ্রহণ করেন। এই আইন ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে কার্যকরী হয়। কংগ্রেস শাসনতন্ত্র হস্তগত করার উদ্দেশ্যে ইহাতে সম্মতি দেয় ও নির্বাচনে জয়ী হইয়া অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। সাইমন কমিশন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার সময় হইতেই যাবতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। এমন সময় আসিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরেজ ও মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার প্রশ্নে কংগ্রেস প্রস্তাব করে যে, যে-গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকার যুদ্ধে অবতীর্ণ, ভারতকে অবিলম্বে সেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে; অন্যথা যুদ্ধে কোন সাহায্যদান করা হইবে না। বৃটিশ সরকার এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় যাবতীয় কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ইহার পর কংগ্রেসী আন্দোলন যে ভাবে প্রকাশ পায় তাহা হইল "Quit India" অর্থাৎ "ভারত ছাড়" আন্দোলন। এই আন্দোলন গণ-বিপ্লবের রূপ নেয়। ছাত্রগণ আবার স্কুল, কলেজ ছাড়িল; অফিস-আদালত পরিত্যক্ত হইল; আবগারী দোকান, পোস্টাফিস প্রভৃতিতে পিকেটিং চলিল; বিষ্ণুপুরের মহকুমা আদালতে জাতীয় পতাকা উড়িল; কোথাও বা রেলগাড়ী চলাচলের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইল। ইংরেজ সরকার এই বিপ্লব কঠোর হস্তে দমনে অগ্রসর হইলেন। কংগ্রেস অবৈধ ঘোষিত হইল; নেতাগণ কারারুদ্ধ হইলেন; উপদ্রুত অঞ্চলে পিউনিটিব ট্যাক্স অর্থাৎ পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইল; সোনামুখী ও বেতুরের অভয় আশ্রম সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইল; শতশত কর্মী ধৃত হইলেন। অশেষ নির্যাতনে এই আন্দোলন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে বাধ্য হইল।

কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠন ও ইহা পরিত্যাগ

"ভারত ছাড়" আন্দোলন

১৯৪৫ সালে যুদ্ধের শেষে বৃটিশ মন্ত্রীসভা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন। ইহার ফলে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত খণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভ

এই স্বাধীনতা দেশবাসীকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি দিল কিন্তু জনগণের এক বৃহৎ অংশকে সামাজিক ও আর্থিক পীড়ন হইতে মুক্তি দিতে এতাবৎ সক্ষম হয় নাই।

জমিদারি প্রথার অবসান

স্বাধীনতা লাভের সাত বৎসর পরেই দেশে জমিদারি প্রথার অবসান ঘটে। জমিদারি প্রথা বিলোপের ভূমিকা ইংরেজ আমলেই প্রস্তুত হয়। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে কি ভাবে কৃষক সম্প্রদায় কৃষিজমি হারাইয়া দৈন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের উৎপীড়নে এই সম্প্রদায় যেভাবে নির্যাতিত হয় তাহা ইংরেজ শাসকের দৃষ্টি বহির্ভূত হয় নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির স্থির অভিমত হয় যে জমিদারি প্রথা যুগ ধর্মের অনুপযোগী, অকল্যাণকর ও দেশের উন্নতির পরিপন্থী। ১৯৩৮ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশন অনেক বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে আসেন যে জমিদারি প্রথার বিলোপ হওয়া উচিত। বিলোপের সুপারিশও কমিশন করেন কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য অনিবার্য কারণে এই সুপারিশ আশু কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে ১৯৫৪ সালে যে আইন প্রবর্তিত হয় তাহা দ্বারা মাত্র জমিদারি নহে, যাবতীয় মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন সাব্যস্ত হয়। এই আইন কার্যকরী হইতে বিলম্ব হয় নাই। এই ভাবে মধ্যযুগীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এক-নায়কত্বের স্মারক একটি প্রথার অবসান ঘটে।

———

তৃতীয় পর্ব

সংস্কৃতির ধারা

"অমল মৃদুল-দ্যুতি কত না রতন
গভীর সাগরতলে আঁধারে লুকায় !
কত না কুসুম রাশি
সলাজ সুধার হাসি
ফুটে থাকে থরে থরে গোপনে বিজনে
তৃষিত মরুর বায়ে সৌরভ বিলায়।"

Elegy—Grey

(১)

বৈষ্ণব অনুশাসনের পূর্বে

আদিবাসী, জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় এই জিলায়। বিভিন্ন ধর্ম, আচার ও প্রভাবের বন্যা ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু প্রত্যেকেই সংস্কৃতির উপর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে।

প্রাগ-আর্যসংস্কৃতি ও ইহার প্রভাব

আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে এই অঞ্চলে যে প্রবল এক আর্যেতর জাতির প্রাধান্য ছিল তাহার পরিচয় ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই জাতি অষ্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষীর একাধিক শাখার অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব ভারতে আর্য সংস্কৃতি বিস্তৃতির পরও বহুকাল পর্যন্ত এই অঞ্চল আর্য সভ্যতার বহির্ভূত থাকে। উত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় সভ্যতার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে এক স্বতন্ত্র সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে এবং এই কারণে ধর্ম ও আচারগত জীবনে বহিরাগত কোন প্রভাব বহুকাল পর্যন্ত কার্যকরী হইতে পারে নাই। পরবর্তীকালে উন্নততর সভ্যতার প্রতিঘাতে ও অন্যান্য কারণে এই আর্যেতর জাতির বহুশাখা এই অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাগ্-আর্য জাতির বংশধরগণ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাগদি, সাঁওতাল, ডোম, মাল, ধীবর, বাউরি প্রভৃতির সংখ্যা পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে এখানে বেশী। আবার জিলার অনন্যসাধারণ অবস্থানের জন্য এখানকার রাজগণ বাহিরের কোন কেন্দ্রীয় শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকায় প্রাগ্-আর্যসংস্কৃতির বহু নিদর্শন এখানে বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এই সংস্কৃতির অনেকগুলি পরে আর্যসংস্কৃতি কর্তৃক গৃহীত হয়।

ছাতনার শিলাস্তম্ভ

প্রথমে উল্লেখ করা যায় শিলাস্তম্ভের কথা। ছাতনায় এই শিলাস্তম্ভ আছে বহু, ইহাদের উচ্চতা ৪ ফুট হইতে ৫ ফুট। ছাতনার অদূরে মৌলবনিতে এই জাতীয় যে শিলাস্তম্ভ আছে তাহা মল্লেশ্বর শিবলিঙ্গরূপে পূজিত হয়। এই শিলাস্তম্ভগুলি সম্বন্ধে কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রকৃতপক্ষে এগুলি স্মৃতিস্তম্ভ বা বীরস্তম্ভ।

দক্ষিণ ভারতে ও পূর্বভারতের অনেক উপজাতির মধ্যে এই ভাবে মৃতব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে। যেমন আছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের হো ও মুণ্ডা জাতির মধ্যে। এ সম্বন্ধে ড্যালটন (Dalton) সাহেব বলেন (১):

"প্রত্যেক হো বা মুণ্ডারী গ্রামের অবস্থান বৃহদাকার সমাধিশিলার সমষ্টি দ্বারা পরিচিত। এই শিলাগুলি মৃতব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হয়। মুণ্ডা ও হো জাতির দেশে এই প্রকার যে সকল সমাধি শিলা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সেগুলি সব সময় একই সরল রেখায় অবস্থিত।"

ছোটনাগপুরের শিলাস্তম্ভগুলির সহিত বাঁকুড়ার শিলাস্তম্ভের সাদৃশ্য আছে। ছোটনাগপুরের সংস্কৃতি ধারার সহিত প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। অনেকে মনে করেন যে এই জাতীয় শিলাস্তম্ভই পরবর্তীকালে শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

তারপর বলা যায় প্রাগ্-আর্য প্রকৃতি পূজা ও দেবদেবী পূজার কথা। কালক্রমে এই সব পূজা উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়ও গ্রহণ করিয়াছে। জিলার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে উপজাতীয় ও বর্ণহিন্দু উভয়েই বৃক্ষ ও অন্যান্য নৈসর্গিক বস্তুর পূজা করে। প্রাগ-আর্য দেবদেবী চণ্ডী, মনসা, ভৈরব, কুদ্রা, বরম প্রভৃতি বর্ণহিন্দুর নিকট সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। ইহাদের অনেকেই হিন্দু সংস্কৃতিতে স্থান পাইয়াছে। প্রাগ-আর্য ধর্ম অনেকের মতে ধর্মঠাকুরে পরিণত হইয়া আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। তন্ত্রের কয়েকটি ধারাও গৃহীত হইয়াছে প্রাগ-আর্য আচার অনুষ্ঠান হইতে। বন্য দেবতার নিকট মাটির হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি উৎসর্গ দিবার প্রাগ্-আর্য প্রথা বর্তমানে প্রায় সর্বশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। শক্তি ও বীরত্বের জন্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিপোষক হিন্দুসম্প্রদায় আর্য-সংস্কৃতি বহির্ভূত সম্প্রদায়ের নিকট ঋণী। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে অশ্বারোহী ধনুর্বাণধারী যে মল্লবীরগণের চিত্র পোড়ামাটিতে খোদাই করা আছে তাহা হইতেছে তখনকার বীর যোদ্ধা বাগ্দি, ডোম প্রভৃতির চিত্র। আর যে সকল নাম-পরিচয়হীন শিল্পীবৃন্দ পোড়া ইটের উপর সাধারণ লোকের ইতিহাসের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহারা যে মূলে আর্য-সংস্কৃতির বাহিরে ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাগ-আর্য দেবদেবী প্রভৃতি

(১) ড্যালটন সাহেব বিগত শতাব্দীতে ছোটনাগপুরের কমিশনার ছিলেন।

ভারতের পূর্বাংশে আর্য-সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ হয় উত্তর-বিহারে। তারপর ইহার বিস্তার প্রথম পুণ্ড্রবর্ধনে বা উত্তরবঙ্গে ও পরে মগধ বা দক্ষিণ বিহারে। দক্ষিণ বিহার হইতে আর্য-সংস্কৃতি ক্রমশঃ দক্ষিণ ও পূর্বে প্রসারিত হইয়া সুহ্ম-রাঢ়ের প্রান্তদেশে প্রাগ-আর্য আদিবাসীর সংস্পর্শে আসে; আর্য ভাষাভাষীগণের নিকট তাহারা পরিচিত হয় কদাচারী ও অশিষ্ট সংজ্ঞায়। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামের সময়েও এই অঞ্চলের নিম্নজাতি এইভাবে পরিচিত ছিল:

আর্য-সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রাগ-আর্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাত

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।"

কিন্তু প্রাগ-আর্য যুগে এই অঞ্চলে এক বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আমরা গঙ্গা-দামোদরের সভ্যতা আখ্যা দিতে পারি। পূর্বে যে গঙ্গারিডি রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে মনে হয় ইহাই ছিল এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। সভ্যতার বাহক প্রাগ-আর্য নিষাদ জাতির কোন শাখা বা দ্রবিড় ভাষা-ভাষী কোন জাতি—যাঁহারাই হউন না কেন, তাঁহারা সমৃদ্ধিশালী কৃষি-পল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন, নগর পত্তন করিয়াছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন। বর্ধমান জিলার অজয়-তীরে রাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থান খনন করিয়া এই প্রাচীন-সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে; মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যও এই অর্ধবিস্মৃত সভ্যতার পরিচয় দেয়।

আর্য-সভ্যতা ও কৃষ্টি এই জিলায় প্রবেশ করে তিনটি ধারায়—জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য। কোন্ ধারা যে কোন্ সময় অনুপ্রবেশ করে তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক বেগলার সাহেব ইং ১৮৬২-৬৩ সালে সন্নিহিত পুরুলিয়া জিলায় ও তমলুক হইতে গয়া পর্যন্ত প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন পাইয়াছেন ও সেই সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক এবং পাটলিপুত্র, গয়া, রাজগীর ও বারাণসীর মধ্যে সুরক্ষিত সংযোগ পথ বর্তমান ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি ছিল তমলুক হইতে ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা রঘুনাথপুর, তেলকুপি, ঝরিয়া, গয়া, রাজগীর হইয়া পাটলিপুত্র বা বর্তমান পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজপথটির উভয় পার্শ্বে এবং বহুস্থানে তিনি অনেক

বেগলার সাহেবের মত

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষাৎ পান। ইহা তেলকুপিতে যে স্থানে দামোদর নদ অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বহু নিদর্শন কিছুদিন পুর্ব পর্যন্তও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত কিন্তু দামোদরের নিম্ন প্রবাহে পঁচেট বাঁধ নির্মাণের পর এগুলি জলমগ্ন হইয়াছে। অপর এক রাজপথ তমলুক হইতে সোজা বাহির হইয়া এই জিলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অম্বিকানগর এবং ইহার অদূরবর্তী পরেশনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরেশনাথ হইতে এইপথ কাঁসাই নদীর বরাবর বুধপুর পর্যন্ত গিয়া পশ্চিমদিকে স্থবর্ণরেখা তীরে দুল্‌মি ও আরও পশ্চিমে বাঁচি, পালামউ প্রভৃতি স্থান হইয়া বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই রাজপথের উভয় পার্শ্বেও বেগলার সাহেব প্রাচীন পুরাকীর্তির বহু নিদর্শন দেখিয়াছেন এবং সেগুলি এখনও আছে। বেগলার সাহেব মনে করেন যে এইসব হইতেছে প্রাক্তন অরণ্যবহুল প্রদেশে আর্য-সংস্কৃতির অগ্রদূত বিক্ষিপ্ত উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ। তাঁহার অনুমান এই যে বিভিন্ন উপজাতি বাহির হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পুর্বেই আর্যসভ্যতা এখানে প্রবেশ করে। কিন্তু পরে বহিরাগত উপজাতিদের আক্রমণে ধ্বংস হয়।

ছোটনাগপুর বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার ড্যালটন সাহেব কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে আদি আর্য-সভ্যতার বাহক এই উপনিবেশগুলির ধ্বংস-সাধন বহিরাগত কোন উপজাতির আক্রমণ দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু এই সব উপনিবেশ গড়িয়া উঠে বিজিত উপজাতিদের মধ্যে শান্তি-পুর্ণ ভাবে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারের উদ্দেশ্যে। পরে যখন আর্য-সভ্যতার বাহকদের ভাবধারার পরিবর্তন হয় ও উপজাতিদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়, ইহারা আর্যসভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও খুব সম্ভব ঘোর যুদ্ধের পর এই সংস্কৃতির বাহকদের নিঃশেষ করে। তাহাদের দুর্গ, নগর, মন্দির আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ড্যালটন সাহেব বলেন যে, তাঁহার এই অনুমান অসঙ্গত নহে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ইংরেজ যুগের ভূমিজ বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহের উল্লেখ করেন।

ড্যালটন সাহেবের মত

জিলার পশ্চিমভাগের ও সন্নিহিত পুরুলিয়া জিলার প্রাচীন পুরাকীর্তির —আর ইহার মধ্যে জৈন পুরাকীর্তির সংখ্যাই অধিক—ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে যে, যে-অঞ্চলের উপর মুসলমান আক্রমণের কোন কথাই উঠিতে পারে না, সেখানে প্রাচীন মন্দির, বিগ্রহ বা জনবসতির

ধ্বংসসাধন কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের বহু পূর্ব হইতে এই অঞ্চল ছিল বিভিন্ন উপজাতি বা খণ্ডজাতির বাসস্থান। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাালটন সাহেবের অনুমান প্রত্যাখ্যান করা যায় না। দেখা যায় আর্য-সভ্যতার বিভিন্ন ধারার এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ পরবর্তীকালে হইলেও ভারতীয় কেন্দ্রীয় সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে বা অন্য কোন কারণে আর্য-সংস্কৃতি বহুকাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের উপর বিশেষ কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং সুদীর্ঘকাল ইহা নিজস্ব লৌকিক আর্যেতর সংস্কৃতিরই পোষক থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হি-য়েন রাঢ়দেশের সংলগ্ন দক্ষিণ অঞ্চল তাম্রলিপ্তির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কোন অঞ্চলের উল্লেখ করেন নাই। সপ্তম শতাব্দীতে অন্য একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইয়ুয়াং-চোয়াং এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন কিন্তু তাঁহার লিখিত বিবরণীতে রাঢ় বা তৎসংলগ্ন অঞ্চল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। মনে হয় যে, যে সকল প্রাগ-আর্য জাতি এখানে বসবাস করিত তাহাদের ধর্ম ও আচারগত জীবনে বহুকাল পর্যন্ত বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই এবং বহুকাল যাবৎ এই সকল জাতি নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কার পালন করিতে থাকে। পরে তন্ত্র মাধ্যমে এই ধর্ম ও সংস্কার আর্য-সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে।

উপরোক্ত মত ও ধারনা সম্বন্ধে মন্তব্য

আর্য-সভ্যতার সংস্কৃতি ধারার মধ্যে জৈন ধর্ম যে এই জিলায় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই ধর্মের উৎপত্তি স্থান সন্নিহিত দক্ষিণ-বিহার অঞ্চল। এই স্থান হইতেই ইহা চতুর্দিকে প্রসারিত হয় এবং সংলগ্ন পুরুলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এই ধর্ম এক সময় এই জিলার অংশ বিশেষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে বেগলার সাহেব বর্ণিত প্রাচীন রাজপথ বা নদীপ্রবাহ অনুসরণ করিয়া এই ধর্মের অনুপ্রবেশ হয় বলিয়া অনুমান। জিলায় যে সকল প্রাচীন জৈন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে পরেশনাথ কুমারী ও কাঁসাই নদীর সংযোগস্থলের নিকটেই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই পরেশনাথ বেগলার সাহেবের তাম্রলিপ্ত বারাণসী রাজপথের উপরেই অবস্থিত। পুরাতত্ত্ববিদ্ দিক্ষিত মহাশয় (K. N. Dikshit)

জৈন ধর্ম

হারমাসরা গ্রামে এক বৃহদায়তন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি ও ইহারই অদূরে এক জৈন মন্দির আবিষ্কার করেন। হারমাসরা হইতে শিলাবতী বা শিলাই নদী বেশী দূর নহে এবং অনেকে মনে করেন যে এই নদীপথে অগ্রসর হইয়া পশ্চিম দেশাগত জৈন ধর্ম প্রচারকগণ হারমাসরাতেও একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে সোনাতোপল, বহুলাড়া ও ধরাপাটের প্রাচীন দেবালয়গুলির স্থাপত্য-কীর্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই সকল স্থান প্রাচীনকালে জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল। ধরাপাটের পুরাতন মন্দিরটি নাই বটে, কিন্তু বর্তমান মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে প্রস্তরনির্মিত তুইটি জৈন. তীর্থঙ্করের মূর্তি খোদিত আছে; নিকটেই আর একটি জৈন মূর্তি হিন্দুরীতি অনুসারে পুজিত হয়। সোনাতোপলের মন্দিরে এখন কোন বিগ্রহ নাই। বহুলাড়ার মন্দির বর্তমানে সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির নামে পরিচিত; শিব জ্ঞানে যাঁহাকে পুজা করা হয় তিনি কিন্তু জৈন তীর্থঙ্কর পরেশনাথ। মন্দিরের গর্ভগৃহে রক্ষিত আছে পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথের মূর্তি। মন্দিরটি মনে হয় জৈন যুগেই নির্মিত হয়; মন্দির সংলগ্ন ধ্বংসাবশেষ অপসারিত করিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জৈন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন তেলকুপি পথের উপর অবস্থিত ছাতনার মৌলবনির মল্লেশ্বর শিবের চতুষ্পার্শ্বে আছে বহু জৈন নিদর্শন। শালতোড়ার অদূরস্থ বিহারীনাথ পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত একটি মন্দিরের বিগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেন যে এই বিগ্রহে জৈন তীর্থঙ্কর ও ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুর এক অভিনব মিলন সাধিত হইয়াছে: এখানে একটি জৈন ধর্মকেন্দ্র ছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।[১]

উপরোক্ত দেবালয়গুলির নির্মাণকাল পণ্ডিতগণের মতে পাল-যুগে: পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে খৃষ্টীয় দশম শতকে। তখন কিন্তু পালরাজগণের প্রত্যক্ষ শাসনভুক্ত বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে জৈন-ধর্ম ম্লান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাংলার এই প্রত্যন্ত প্রদেশে জৈন-ধর্ম নিজ-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করে বটে কিন্তু সফলকাম হয় নাই। ইহার একটি কারণ হইতেছে যে জৈন-ধর্ম ইহার উচ্চ আদর্শ ও কৃচ্ছ্রসাধনাদির জন্য জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। অন্যদিকে তৎকাল প্রচলিত উদার বৌদ্ধ মতবাদ স্থানীয় প্রচলিত লৌকিক ধর্ম ও ভাবধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া যে অভিনব সহজগ্রাহ্য জন-সংস্কৃতির সৃষ্টি করে তাহাতে জনসাধারণ জৈনধর্মের প্রতি আর আকৃষ্ট হয়

(১) অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকুড়ার মন্দির

না। তারপর বিষ্ণুপুরের উদীয়মান মল্লরাজ-শক্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষক হইবার পর জৈন-ধর্মের যে গৌরব অবশিষ্ট থাকে তাহাও সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া যায়। এই সময় বহুলাড়ার ন্যায় অনেক জৈন দেবালয় পরিণত হয় শৈব মন্দিরে।

উপরে যে বৌদ্ধ মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহার মূলভিত্তি হইল মহাযানবাদ। মহাযানবাদের সহিত তথাগত বুদ্ধের মূল মতবাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বুদ্ধ ছিলেন জ্ঞানবাদী; তাঁহার বাণীতে তিনি জ্ঞানবাদেরই মহিমা প্রকাশ করিয়া ইহাকেই নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাযানবাদের মধ্যে প্রধান স্থান পাইয়াছে ভক্তি, বহু দেবদেবীর উপাসনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহাযানবাদকে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের বিকৃতি বলা যায়। দেবদেবীর মধ্যে অনেকেই স্থানীয় বা লৌকিক; আবার বহির্জগতের সংস্পর্শে আসার পর তথাকার বহু দেবদেবীও মহাযানবাদ গ্রহণ করিয়াছে। সকল দেবদেবীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন ভগবান বুদ্ধদেব, তাঁহার অধিষ্ঠান স্বর্গের পরম স্থানে। এই যে ভক্তিবাদ ইহার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন [১] যে তাঁহার ধারণা—প্রেরণা লাভ হইয়াছে ভগবদ্ গীতা হইতে। তাঁহার মতে এই প্রেরণাই মূল বৌদ্ধমতের কর্মত্যাগ ও জ্ঞানমার্গকে ধ্যান-ভক্তি ও করুণাবিধায়ক ধর্মে রূপান্তর করে আর এই রূপান্তরিত ধর্ম সমগ্র এশিয়ার কৃষ্টির উপর এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে।

বৌদ্ধ মহাযানবাদ

এই মহাযানবাদের রূপ পরিগ্রহ করিয়াই বৌদ্ধ ধর্ম এই অঞ্চলে তথা সমগ্র রাঢ় প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে। বাংলার পাল-রাজবংশের বৌদ্ধ রাজগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া এই দেশ শাসন করেন। তাঁহারা যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিতেন ইহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। পাল রাজগণের পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে মহাযানবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারপর এই বৌদ্ধ রাজশক্তির পোষকতায় মহাযানবাদ দেশের প্রায় সর্বশ্রেণীকে স্পর্শ করে। পালরাজ বংশের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে এই ধর্মমত লৌকিক শক্তিবাদের সংস্পর্শে আসিয়া যে নবরূপ পরিগ্রহ করে তাহা হইতে আবির্ভাব হয় বৌদ্ধ তন্ত্র। মহাযানবাদী তন্ত্রে আঞ্চলিক বহু দেবদেবী স্থান পাওয়ায় পালরাজগণের সময় জনসাধারণের এক মূল অংশ হয় বৌদ্ধ-পন্থী অথবা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন। রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাঁকুড়ার আদিবাসী কল্পিত বহু লৌকিক দেবদেবী মহাযানবাদে গৃহীত হয়।

বৌদ্ধ তন্ত্র

১। Arabinda—Essays on the Gita

উপরে যে শক্তিবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, বহু পণ্ডিত মনে করেন যে ইহা বাংলার নিজস্ব, বহু প্রাচীন কালেই ইহার আবির্ভাব। প্রখ্যাত পণ্ডিত উড্রফ (Sir John Woodroffe) বলেন (১) যে বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান ও মহাযানবাদের সহিত বাংলার আদি অধিবাসী পরিকল্পিত শক্তিবাদ যুক্ত হইয়া যে ভাবধারার সৃষ্টি করে, তাহাই আত্মপ্রকাশ করে বৌদ্ধ তন্ত্ররূপে। মতান্তরে মহাযানবাদ পূর্ব প্রচলিত তন্ত্রবাদ গ্রহণ করে। যাহা হউক, দেখা যায় যে এই তন্ত্রবাদ পালযুগে ও পালোত্তরযুগে বাংলায় সংস্কৃতি জীবনে এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। কালক্রমে আদিম তন্ত্রবাদ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে গৃহীত হয়, ইহার কারণ বৌদ্ধমত প্লাবিত দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ইহা পরে আলোচিত হইল।

দেখা যায় যে পালরাজগণের রাজত্বকালেই ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলনে বাঁকুড়ার অংশ বিশেষ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ধর্মঠাকুর ও ধর্ম পূজার পরিচয় এই অধ্যায়ের শেষভাগে দেওয়া হইয়াছে। এই দেবতার প্রকৃত পরিচয় ও তাঁহার উপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও অনেকের মতে ধর্মপূজা বৌদ্ধ স্তূপ পূজারই প্রতীক; এই বৌদ্ধ স্তূপকেই দেবতার আসন দিয়া ধর্মঠাকুরের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ধর্ম-পূজা বৌদ্ধ ধর্ম প্রসূত, বৌদ্ধ ধর্মের শেষ বিকৃতি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের মহিমা কীর্তন করিয়া যে সমৃদ্ধ ধর্মমঙ্গল সাহিত্য গড়িয়া ওঠে, তাহাতে দেখা যায় যে ধর্মপূজার একজন বিশিষ্ট প্রবর্তক ছিলেন রামাই পণ্ডিত। রামাই পণ্ডিত ছিলেন পালরাজ ধর্মপালের সম-সাময়িক, জাতিতে ছিলেন ডোম, নিম্নবর্ণ। তাঁহার রচিত ধর্ম-পূজা পদ্ধতিকে "শূন্য পুরাণ" নামে অভিহিত করা হয়। "শূন্য পুরাণ" নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধমতের শূন্যবাদের ইঙ্গিত প্রকাশক। রামাই পণ্ডিতের ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল, বহু প্রখ্যাত পণ্ডিতের মতে, জয়পুর থানার শলদা-ময়নাপুর। রামাই পণ্ডিতের ও পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের ধর্মঠাকুর হইতেছেন গণ-দেবতা; স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। দেবতার পূজার সহিত যুক্ত ছিল গাজনের প্রচুর আড়ম্বর ও জনসাধারণের অপূর্ব-উৎসাহ। ধর্মঠাকুরের উপাসনাকে যদি বৌদ্ধ-ধর্ম প্রসূত বলিয়া স্বীকার করা হয়, দেখা যায় যে পালরাজগণের রাজত্বকালে মহাযানবাদ যখন তন্ত্রমাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, বৌদ্ধ ধর্মের স্তূপ পূজা

ধর্ম-পূজায় বৌদ্ধ উপাদান

১। Sir John Woodroffe—Principles of Tantra

ধর্ম-পূজা রূপে জনসাধারণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া সৃষ্টি করিল এক অদ্ভুত প্রেরণা। রাঢ়ের এই অঞ্চলে জৈন বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতির সহিত বৌদ্ধ ভাবধারার প্রসারের প্রয়াসে পার্থক্য দেখা যায়। জৈন ধর্মের বাহকগণ ছিলেন দক্ষিণ মগধের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল রাজ-সহায়তাপুষ্ট। কিন্তু বৌদ্ধ ভাবধারা বিকাশের পিছনে ছিল প্রধানতঃ জনগণ, আদিবাসী উপাদান। মনে হয় যে এই কারণেই এই অঞ্চলে বৌদ্ধ মূর্তি বা বৌদ্ধ মন্দিরের আড়ম্বর গড়িয়া ওঠে নাই।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম

শুশুনিয়া লিপি হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম দামোদরতীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চক্র-স্বামী বিষ্ণুর উপাসনা পুষ্করণ রাজ-বংশের সহিত লোপ পায় নাই। পরবর্তীকালের মল্লরাজগণ প্রধানতঃ শিবশক্তির উপাসক হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্যান্য অনেক দেব-দেবীর ন্যায় এই দেবতাকে শুধু যে গ্রহণ করেন তাহা নহে, অনেকে আবার ইঁহাকে উচ্চ স্থান প্রদান করেন। রাজধানীর নাম রাখা হয় এই দেবতার নামানুসারে। কয়েকজন মল্লনৃপতি যে নাম গ্রহণ করেন, যেমন কানু, যাদব, মাধব, কৃষ্ণ, বনমালি, যদু, রাম, গোবিন্দ, তাহা হইতে মনে হয় যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বিষ্ণুদেবতা এই রাজবংশে প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান থাকেন। রাজবংশের কুলদেবতা হইতেছেন অনন্তদেব, বিষ্ণুর অন্য একটি নাম। এই দেবতার প্রভাবে ধরাপাটের জৈন মন্দির পরবর্তীকালে বিষ্ণু দেবালয়ে রূপান্তরিত হয়।[১] বিষ্ণুর সহিত পৌরাণিক শিবও প্রবেশ করেন এবং এই দেবতা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেন আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতকের একেশ্বর মন্দিরই তাহার নিদর্শন। কিন্তু ইতিমধ্যে তন্ত্রের প্রসার হইয়াছে। বৌদ্ধ মহাযানবাদ ও তন্ত্রের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। কথিত আছে যে রাঢ় অঞ্চলে পালরাজশক্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বে আদিশূর নামীয় কোন নৃপতি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বৈদিক ধর্ম জীবিত করার প্রয়াস পান,

---

(১) বিষ্ণুপুরের "দশাবতার তাস" সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে ইহার প্রবর্তন হয় প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে প্রথম মল্লরাজগণের সময়। সেই পুরাতন যুগেও তাঁহারা বিষ্ণু দেবতাকে গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। পরবর্তীকালে মল্ল-রাজবংশে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত যে বৈষ্ণবধর্ম গৃহীত হয়, তাহার সহিত পৌরাণিক বিষ্ণু-উপাসনার প্রভেদ আছে।

কিন্তু ইহা সফল হয় নাই। উদার বৌদ্ধ মতবাদ, আচারানুষ্ঠান ও সুখসাধ্য তন্ত্রের সংস্পর্শে আসিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাতে দুঃসাধ্য ও অপ্রীতিকর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন গ্রহণীয় না হইবারই সম্ভাবনা। এই অবস্থায় তান্ত্রিক ধর্মগত আচার ব্যবহার, উপাসনা পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে গৃহীত হইতে বাধ্য হয়; অন্যথা ইহার আত্ম-রক্ষার কোন উপায় ছিল না। এই অবস্থায় সৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্র।

ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র

পালযুগের শেষভাগে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্ম ও বৌদ্ধ মহাযানবাদ ও তন্ত্র পরস্পর পরস্পর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্ম পালরাজসভায় প্রবেশ করে আবার বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান, মন্ত্রযান, প্রভৃতির আচারানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি স্পর্শ করে। বৌদ্ধ দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান পান, বৌদ্ধ স্তূপ ধর্মঠাকুররূপে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে প্রবেশ করে, আদিবাসী কল্পিত গাজন শিবের গাজনে পরিণত হয়। তখন উচ্চবর্ণের সকলেই, তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা মহাযানবাদী বৌদ্ধই হউন, তন্ত্রের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে শৈবতন্ত্র ও শিবশক্তির আরাধনা প্রসার লাভ করে। জনসাধারণের মধ্যে চণ্ডী, মনসা, বাসলি প্রভৃতি যে সকল দেবতা পূজিত হইতেন তাহারা সকলেই প্রাগ-আর্য আদিবাসী কল্পিত। পরবর্তীকালে সেনরাজগণের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে সংস্কার হয় তাহার ফলে বহু আর্যেতর দেবতা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ও পুরাণের মধ্যে আত্মগোপন করেন। একদিকে তন্ত্র ও পুরাণ অপরদিকে পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যের প্রচেষ্টায় আর্যেতর দেবতাগণ ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হন।

বৌদ্ধতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের মিলন

যে সকল প্রাগ-বৈদিক দেবতা আর্য-সংস্কৃতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ইতিপুর্বেই সক্ষম হন, তাঁহাদের মধ্যে শিব প্রধান। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইবার পুর্বেই ইহা প্রাগ-আর্য শৈব ধর্মের সংস্পর্শে আসে সুতরাং এখানে প্রথম হইতেই যে শৈব ধর্মের বিকাশ হয় তাহার সহিত আর্যেতর সমাজের উপাদান পুর্বেই মিশ্রিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু উপাদানও শৈব ধর্মের সহিত মিশিতে আরম্ভ করে। পৌরাণিক শিবরূপ পরিকল্পনার সহিত বুদ্ধ বা জৈন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শের সাদৃশ্য আছে ইহা কেহ কেহ মনে করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন বাংলার এই প্রত্যন্ত প্রদেশে

প্রাচীন শিব ঠাকুর

উপজাতি অঞ্চলে প্রবেশ করে, শিবকে কল্পনা করা হইল আদিবাসীদের প্রধান উপাস্য দেবতা, রক্ত পিপাসু, ভয়ঙ্কর, উপযুক্ত পূজা না পাইলে মহা অনিষ্টকারী।

শিবের ভৈরবরূপ

শিব সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা, সাধারণের এই মনোভাব, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। শিবের ভৈরবরূপ কল্পনা জনসাধারণ ত্যাগ করিতে পারিল না। এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক শিব মন্দিরের অঙ্গনে "ভৈরব থান" আছে। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের বহু স্থানে বার্ষিক শিব পূজায় বা চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবমূর্তির সম্মুখে পশু বলি দেওয়া হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রাগৈতিহাসিক লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান গাজন পরে পরিণত হইয়াছে শিবের গাজনে।

মনসা

মনসা পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে আদি-অকৃত্রিম বিষাক্ত সর্প ভীতি হইতে আদিম সর্প পূজার জন্ম হয়। গভীর অরণ্যে অন্যান্য জন্তু হইতে সর্বাপেক্ষা ভয় ছিল সর্পের। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে জিলার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে মনসা পূজার প্রচলন সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে ও তাহাদের মধ্যে এই দেবীর প্রতিপত্তি অসামান্য হইবে, তাহা স্বাভাবিক মনে হয়। বাউরি, বাগদি, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি সকলেরই প্রধান উপাস্য মনসা। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "বাংলার জনগণের মধ্যে আদিবাসী উপাদান" (Aboriginal elements in the population of Bengal) প্রবন্ধে বলেন:

"অর্ধ হিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় বর্ণহিন্দুর উপাস্য দেবতার মধ্যে কয়েকটি দেবদেবী যোগ করিবার গৌরব লাভ করিতে পারে; মনসা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। অর্ধ-আদিম অধিবাসী বর্ণহিন্দুর দেবদেবীকে সত্যিকার পূজা করা অপেক্ষা সম্মান প্রদর্শনই বেশী করে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার সর্বাপেক্ষা অপ্রগতিশীল বা প্রগতিশীল হিন্দুভাবাপন্ন আদিম অধিবাসীর মধ্যে মনসা পূজার সর্বত্র প্রচলন। কয়েকদিন ধরিয়া এই পূজা চলে আর ইহার সহিত যুক্ত হয় অভূতপূর্ব আড়ম্বর, আমোদপ্রমোদ, গীতবাদ্য। আদিম অধিবাসী সম্প্রদায়ের এই পূজা বর্ণহিন্দু সমাজে প্রবেশের কারণ চাঁদ সদাগরের কাহিনীর মধ্যে নিহিত আছে ও এই কাহিনী বহুপুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কাহিনীতে আছে যে সদাগর কিছুতেই দেবীর পূজা করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার বাণিজ্য ধ্বংস হইল, সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র বাসরঘরে সর্পদংশনে প্রাণ হারাইল। তারপর

মহাদেব সর্পদেবীর শক্তি বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে এই ঘটনার স্থান নির্দেশ করা হয় দামোদরের তীরে আর এই দামোদরই বাংলার প্রথম হিন্দু বসতি ও আদিবাসী অঞ্চলের সীমারেখা ধরা যাইতে পারে। কোন্ সময় যে মনসা পূজা এই সীমারেখা অতিক্রম করিয়া হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করে বলা যায় না। কিন্তু এখনও বর্তমান অর্ধ-হিন্দু-ভাবাপন্ন মনসার প্রাচীন ভক্তগণ দেবীকে যে বিপুল উৎসাহ ও সর্বাত্মক আনন্দোৎসবের সহিত পূজা করে তাহার তুলনায় বর্ণহিন্দুসমাজে দেবীর পূজা নগণ্য।"

বৌদ্ধ জাঙ্গুলি দেবী

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে জাঙ্গুলি নামে এক দেবীর উল্লেখ আছে। মহাযানমতে এই দেবী অতি প্রাচীনা। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্রগ্রন্থ সাধন-মালায় এই দেবীর পূজা প্রকরণ ও মন্ত্র সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে সর্প-দেবী মনসা বা বিষহরির সহিত এই দেবীর সাদৃশ্য ও মূল সম্পর্ক আছে ইহা অনেকের বিশ্বাস। সাধন মালায় দেবীকে হংসবাহনা সর্পের বিস্তৃত ফণাতলে আসীনা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। বাংলাদেশে প্রচলিত মনসার একটি ধ্যানে তাঁহাকে হংসারূঢ়া বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস তাঁহার কাব্যে মনসাকে জাগুলি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের ধর্ম পূজা বিধানে মনসা বা বিষহরির স্তোত্রে তাঁহাকে জাগুলি বলা হইয়াছে। পালরাজগণের সময় পর্যন্ত বাংলার সমাজে মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রভাব অব্যাহত থাকে। সুতরাং এই সময় পর্যন্ত সমাজে যে প্রাচীন সর্পদেবী জাঙ্গুলির পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সেনরাজগণের সময় যখন এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্ম নানাভাবে আত্মগোপন করে; বৌদ্ধ দেবদেবীও নূতন পরিচয়ে আবির্ভূত হন। সম্ভবতঃ পাল রাজত্বের অবসান ও সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সময় জাঙ্গুলি দেবী মনসা নামে পরিচিত হন ও পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে গৃহীত হন।

মনসা পূজা প্রচলনের কাহিনী হইতে মনে হয় যে যেখানে প্রাচীন লৌকিক ধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছে, সেখানেই হইয়াছে বিরোধ। লৌকিক দেবতা নিজ শক্তি বলেই নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল, কোন তান্ত্রিক দেবী চণ্ডী নামে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবেশ করেন ইহা কেহ কেহ অনুমান করেন।

তাঁহাদের মতে আর্যেতর কোন সমাজ হইতে চণ্ডিকা বা চণ্ডী দেবী উক্ত ধর্মে গৃহীত হইয়াছেন ; "চণ্ডী" শব্দটিই অনার্য ভাষা হইতে আসিয়াছে ও পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে। পুরাণে চণ্ডীকে বিন্ধ্যবাসিনী, কান্তার-বাসিনী, কোকামুখী নামে যে পরিচয় দেয় তাহা হইতে এই দেবীর উদ্ভব আর্যসংস্কৃতি গণ্ডির বাহিরে বলিয়াই নির্দেশ করে। বাংলার প্রচলিত ঐন্দ্রজালিক তন্ত্র চণ্ডীকে "হাড়ীর ঝি" নামেও উল্লেখ করে। হাড়ী জাতি আর্যেতর এবং কেহ কেহ মনে করেন যে কোন হাড়ী জাতির কন্যা তন্ত্র প্রভাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় লোক সমাজে দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে ও পরে চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যায় যে বহুকাল যাবৎ চণ্ডী "ডাকিনী দেবতা" পরিচয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে উপেক্ষিতা হইয়াছেন। কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সাধু ধনপতির স্ত্রী লহনা তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী খুল্লনার চণ্ডী পূজা সম্বন্ধেই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন :

চণ্ডী

"তোমার মোহিনী বালা
শিখিয়া ডাইনী কলা
নিত্য পুজে ডাকিনী দেবতা।"

"ডাকিনী" শব্দের অর্থ হইতেছে যে-নারী পিশাচ সিদ্ধা।

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে তিব্বতি ভাষায় "ডাক" শব্দের অর্থ হইল প্রজ্ঞা বা জ্ঞান, তাহারই স্ত্রী-লিঙ্গে ডাকিনী। ডাকিনীরা নানারূপ তান্ত্রিক আচার দ্বারা কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জনসাধারণের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। চণ্ডীর মৌলিকরূপ যাহাই হউক না কেন তিনি যে আদিতে একজন লৌকিক দেবতা ছিলেন ও পরে বৌদ্ধ তন্ত্রে গৃহীত হন ইহা অনেকের অভিমত। পুরাণ ও পরবর্তীকালের মঙ্গল-কাব্যের মাধ্যমে এই দেবী কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা হন। মঙ্গল কাব্যের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে কালী বা কালিকা দেবী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। তন্ত্রের ভিতর দিয়াই এই দেবী ক্রমে পৌরাণিক আখ্যানে প্রবেশ করেন। চণ্ডীর ন্যায় কালীও যে প্রাগ্-আর্য সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান লাভ করেন ইহা অনেকে মনে করেন। তন্ত্রসারে কালীর যে ধ্যান আছে—

কালী

"ক্ষুৎকামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তি
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি"

অথবা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে কালীর যে রূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে

"অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললন ভীষণা
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপুরিত দিঙ্‌মুখম"

তাহাতে এই দেবীর বিশিষ্ট আর্যেতর প্রকৃতি ইঙ্গিত করে। বহু শতাব্দী পর কিন্তু রাঢ়ের সাধকগণ কালীতে মাতৃরূপ আরোপ করিয়া এক বিচিত্র ভাব-ধারার প্রবর্তন করেন।

চণ্ডীর আবির্ভাবের পূর্বে বাসলি বা বাসুলি দেবীর পুজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই দেবীর প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত কিন্তু কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে মূলে তিনি ছিলেন মানবী, নিত্যা নামীয় কোন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর সিদ্ধা বা ডাকিনী। চণ্ডিদাস প্রসঙ্গে জানা যায়

বাসুলি বা বাসলি

"শালতোড়া গ্রাম অতি পিঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাসুলি নিত্যা সহচরী
বসতি কর়য়ে তথা॥"

এই বাসলিই চণ্ডিদাসের প্রেমতত্ত্বের গুরু

"চণ্ডিদাস কহে সে এক বাসুলি
প্রেম প্রচারের গুরু
তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গাইল
পীরিতি হইল সুরু।"

বাঁকুড়ায় সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় মনে করেন যে বাসুলি বা বাসলি হইতেছেন বৌদ্ধ তন্ত্রের "বজ্রেশ্বরী"; "বজ্রেশ্বরী" নাম ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া বাসলিতে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক বাসলি যে আদিতে একজন গ্রাম দেবতা ছিলেন ও পরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান পান এ বিষয়ে অনেকেই এক মত। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন (১):

(১) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস

"মধ্যযুগে বাংলার বিশেষতঃ রাঢ়ের সমাজে বাসুলির বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল। প্রাক্ চৈতন্য যুগের অনন্ত বড়ু চণ্ডিদাস বাসুলিরই সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন পুঁথিতে বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন তন্ত্রে বাসুলিকে মহাবিদ্যাসমূহের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মূলতঃ বাসুলি গ্রাম্য দেবতা, পরবর্তীকালে তাঁহার উপর পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ ইনি হিন্দু ও বৌদ্ধ পূজায় স্থান পাইয়াছেন। সমাজে পৌরাণিক দেবতাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পৌরাণিক পার্বতি ও বাসুলি অভিন্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই থাকুক না কেন, তিনি যে প্রথমতঃ চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র দেবতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বাসুলির সহিত চণ্ডী আসিয়া মিলিত হন। নিম্নলিখিত ধ্যান ও আবাহন মন্ত্রের মধ্যে উভয় দেবতার একত্র সংমিশ্রণ অনুভব করা যায় :—

বাসুলির ধ্যান মন্ত্র

ওঁ আয়াতা স্বর্গ লোকাদিঃ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপুরে
সিন্দুরাভাস সন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাসুলি পাতু সা নঃ।
ওঁ বাসুল্যৈ নমঃ॥

আবাহন মন্ত্র

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গল চণ্ডিকাম
সরিতীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসম প্রভাম।
রক্তবস্ত্র পরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম
অষ্টতণ্ডুল দুর্বাক্তাং অর্চয়েন্মঙ্গলকারিণীম।
অসিদ্ধ সাধিনীং দেবীং কালীং কল্মষ নাশিণীন্
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।

দুইটি এক দেবতার নয় : প্রথমোক্ত বাসুলির, দ্বিতীয়টি চণ্ডীর। মূলতঃ দুইজন এক দেবতা ছিলেন না।"

এই আর্যেতর দেবী কিভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান লাভ করেন তাহা ছাতনা রাজবংশের কাহিনী হইতে উপলব্ধি হয়। বাসলি আদিতে ছিলেন সামন্ত বা সাঁওতদের উপাস্য দেবী। কেহ কেহ মনে করেন যে সাঁওতগণ ছিল

সাঁওতাল সম্প্রদায়ভূত। পরবর্তীকালে কোন ব্রাহ্মণ রাজবংশ এই অঞ্চল অধিকার করে। তাহাদের রাজধানী ছিল বাসলি নগর বা বাহুল্যা নগর। এই রাজবংশ উপজাতীয় দেবী বাসলিকে অশ্রদ্ধা করায় সামন্তগণ বিদ্রোহ করে ও রাজ্য অধিকার করে। ইহার পর শঙ্খ রায় নামে একজন ক্ষত্রিয় সামন্তভূম জয় করেন। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও এই রাজা বাসলি দেবীর ভক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হন; ইহা নিম্নের কাহিনী হইতে প্রকাশ পায়। বাহুল্যা নগরের রক্ষয়িত্রী দেবী বাসলি তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া "বোল পোখরিয়া" নামীয় পুষ্করিণী সমন্বিত ছাতনায় বাস করিতে আদেশ দেন ও বলেন যে দুই পুরুষ পর তিনি তথায় আসিবেন। শঙ্খ রায় এই আদেশ পালন করেন। শঙ্খ রায়ের পৌত্র হামীর উত্তর রায় ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পরিপোষক। বাসলি দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে বলেন যে একদল ব্যবসায়ীর সহিত পেষণী প্রস্তর আকারে তিনি ছাতনায় আসিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে ঐ শিলা চাহিয়া লইয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজা দেবীর আদেশ প্রতিপালন করেন ও মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় শিলা স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে বাসলি এখানে দেবীরূপে পুজিতা হইয়া আসিতেছেন। জনশ্রুতি আছে যে দেবীর আদেশে দুইজন ব্রাহ্মণ যুবক দেবীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন; ইঁহারা দুই ভাই দেবিদাস ও চণ্ডিদাস। দেবিদাস দেবীর পুজক হন আর চণ্ডিদাস তাঁহার পুজোপহার সংগ্রহ করিয়া ভোগের ব্যবস্থা করিতেন ও দেবীর আদেশে সাধন ভজন ও পদ রচনা করিতেন:

"নাণুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাস্থলি বসয়ে যথা॥
নাগুরের মাঠে পত্রের কুটীরে
নিরজন স্থান অতি।
বাস্থলি আদেশে চণ্ডিদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি॥"

চণ্ডিদাস ও বাস্থলি বা বাসলি প্রসঙ্গে বাঁকুড়া জিলার ছাতনা ও বীরভূম জিলার নাণুরকে পরিবেষ্টন করিয়া বহু তর্কজালের অবতারণা হইয়াছে। ইহার গহন অরণ্য ভেদ করিয়া দুইজন চণ্ডিদাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, একজন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডিদাস, অন্যজন হইলেন দ্বিজ চণ্ডিদাস। ইহাদের মধ্যে বড়ু চণ্ডি-

চণ্ডিদাস প্রসঙ্গ

দাস বাসলির সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে মনীষীদের অভিমত এই যে ছাতনার বাসলি মূর্তিই হইতেছে প্রকৃত বাসলির মূর্তি। ইহাই বড়ু চণ্ডিদাস-পুজিত বাসলি। নাণুরে যে দেবীর পুজা হয় তাহার সহিত পুর্বোল্লিখিত ধ্যান মন্ত্রের সামঞ্জস্য নাই। "নাণুরের বাসলির মূর্তি বৈদিক সরস্বতীর মূর্তি, বাসলির নহে। পরবর্তীকালে দ্বিজ চণ্ডিদাসের নাণুরে বড়ু চণ্ডিদাসের জনশ্রুতির যখন প্রচার লাভ করে, বড়ু চণ্ডিদাসের সহিত বাসলির সংস্রব হইতে স্থানীয় এই প্রাচীন সরস্বতী মূর্তি বাস্থলি নামেই পরিচিত হইতে লাগিল। এই চণ্ডিদাস মনে হয় ছাতনার; তাঁহার সহিত নাণুরের দ্বিজ চণ্ডিদাসের সংস্রব নাই।" (১)

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে নিত্যা দেবী বিরাজিত শালতোড়া গ্রাম ছাতনারই অদূরস্থিত। শ্রদ্ধেয় সত্যকিঙ্কর সাহানার মতে ছাতনার কোন অংশ নাণুর নামে পরিচিত ছিল।

ছাতনার বাসলি যে মাত্র ছাতনার দেবী ছিলেন তাহা নহে। আজও বাসলি দেবী সমগ্র ছাতনা বা সামন্তভূম পরগনার রক্ষয়িত্রীরূপে পুজিতা হইয়া আসিতেছেন।

ধর্মঠাকুর

ধর্ম-ঠাকুরের পূজা যে আদিতে সমাজের নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর যাহারা প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম-পূজার উপাসক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তাহাদের অন্যতম। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্ম-মঙ্গলে বলিয়াছেন

"তবে আগু পুজা দিল আসোয়া চণ্ডাল
মদ্যের পুষ্করিণী দিল মাংসের জাঙ্গাল।"

ব্রাহ্মণ্যানুশাসন বহুকাল যাবৎ এই প্রত্যন্ত ভাগের নিম্ন শ্রেণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই সুতরাং তন্ত্রানুমোদিত শিবশক্তি প্রভৃতির উপাসনা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করিলেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধর্মপূজা প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া বর্তমান থাকিল।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্ম-প্রসূত, বৌদ্ধ ধর্মের শেষ বিকৃতি। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্র হইতে ইহার দেবদেবী যথাসাধ্য গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু কয়েকটি শক্তিশালী বৌদ্ধ দেবতাকে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর

(১) মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষভট্টাচার্য

তালিকায় স্থান দিতে পারে নাই; ধর্ম ঠাকুর এইরূপ একজন দেবতা। বৌদ্ধ ত্রিশরণ "বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ"; এই ত্রিশরণের দ্বিতীয়টি হইতেছে মূল ধর্ম। পরে নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট "ধর্ম" বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক স্তূপে আরোপিত করা হয়। বহুস্থলে কূর্মাকৃতিতে ধর্মের পরিচয়; এই কূর্ম ক্ষুদ্রাকার স্তূপ ছাড়া আর কিছু নহে। স্তূপের মধ্যে কুলুঙ্গীর ন্যায় যে পাঁচটি স্থান আছে উহা পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের প্রতীক। বাঁকুড়ার শালদায় একটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি ধর্মঠাকুররূপে পুজিত হয়। ধর্ম উপাসকগণ জানে না যে তাহারা এক মহান কৃষ্টির উত্তর-সাধক আর কি গৌরবময় অতীত হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে তাহাদের "ধর্ম" পাইয়াছে।

ইহা হইল পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহা গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে ধর্ম কথাটি কূর্ম-বাচক আর্যেতর অষ্ট্রিক শব্দের সংস্কৃতরূপ আর ইহার পূজাও আর্যেতর সমাজ হইতে আসিয়াছে। আবার কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে ধর্ম-ঠাকুর বৈদিক দেবতা বরুণের পরবর্তী সংস্করণ বা ধর্মপুজা কোন আদিম জাতির সূর্য-পুজা ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেন—

"ধর্ম-ঠাকুরের পুজা বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম অনুষ্ঠান, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে—বর্ধমান বিভাগে—সীমাবদ্ধ। কিন্তু একদা যে এই পুজা সমগ্র বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ—পুর্ব ও উত্তরবঙ্গে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে দেল বা পাট পুজা হয় তাহা ধর্ম-ঠাকুরের গাজনের অনুষ্ঠান বিশেষের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। ধর্ম পুজার মৌলিক রূপ এ দেশে অষ্ট্রিক জাতি দ্বারাই আমদানি হইয়াছিল। পরে ভারতবর্ষের এই পুর্ব প্রান্তে ধর্ম অনুষ্ঠানের মিশ্রণে এই ক্ষীণ অনার্য বীজ ধর্ম-ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে ও গাজনের আড়ম্বর অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।"

ধর্মঠাকুর আদিতে বাগদি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায় কর্তৃক পুজিত হইলেও বর্তমানে তাঁহার পুজা যাবতীয় হিন্দুসম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে ধর্ম ঠাকুরের পুজার ব্যাপক প্রচারে বাঁকুড়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ধর্মপূজার প্রচলনে বাঁকুড়ার স্থান

পুর্বে বলা হইয়াছে যে শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের বাস ছিল শলদা ময়নাপুর। ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনের পিতা কর্ণসেন ছিলেন ময়নার রাজা। এই ময়না বা ময়নাপুর

যে কোতুলপুর থানার ময়না তাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। এখানেই রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় রামাই পণ্ডিতের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার নির্দেশে চাঁপাইয়ের ঘাটে শালে ভর দেন। ধর্মের প্রসাদে রঞ্জাবতী যে পুত্র-সন্তান লাভ করেন, তিনি লাউসেন—ধর্ম-মঙ্গলের অপূর্ব সৃষ্টি। লাউসেন যেখানে নিজ দেহ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ধর্মঠাকুরের আহুতি দেন তাহার নাম হাকন্দ। ময়নায় হাকন্দ পুখর নামে এক বিশাল জলাশয় আছে। ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত কাহিনী, ধর্ম পূজার প্রবর্তন ও প্রসার এক অতীত যুগের কাহিনীর ইঙ্গিত করে যখন গণ-দেবতা ধর্ম নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন আর ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল অনেকের মতে এই ময়না। ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি ঠাকুরের পূজারী ডোম পণ্ডিতগণ রামাই পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। ময়নাপুরকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকের বিস্তৃত অঞ্চলে ধর্মপূজার প্রবল প্রতিপত্তি দেখা যায়। প্রাচীন বহু ধর্মঠাকুরের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁহার ধর্মমঙ্গলে এইরূপ অনেক ধর্মঠাকুরের পরিচয় দিয়াছেন:

"প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর
স্থানে স্থানে মূর্তিভেদ মহিমা বিস্তর।
বেলডিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি একমনে
অসংখ্য প্রণতি শীতল সিংহের চরণে।
ফুল্লরের ফতেসিং বৈতলের বাঁকুড়া রায়
শুদ্ধভাবে বন্দি দোঁহে নত হয়ে কায়।
সিয়াসের কালাচাঁদ ক্রিদাসের বাঁকুড়া রায়
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়।
গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ স্বর্ণ সিংহাসনে
বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপ নারায়ণে।
দেপুরে জগৎ রায়ে জোড় করি কর
গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তারপর।"

বিষ্ণুপুরের শাঁখারী পাড়ায় বৃদ্ধাক্ষ বা বুড়া ধর্ম নামে যে ধর্মঠাকুর আছেন তাঁহার পূজা বিষ্ণুপুর রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই প্রচলিত বলিয়া কথিত হয়। মল্লভূমের আদি রাজগণ এই ধর্মঠাকুরকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। এই সকল ধর্মঠাকুর ভিন্ন আরও অনেক ধর্মঠাকুর আছেন; তাঁহাদের মধ্যে

বালসির নবজীবন, পানখাই-এর রন্তক রায়, পয়সার পঞ্চানন, আধাকুলির আঁধারকুলি, বেলিয়াতোড়ের ধর্মঠাকুর উল্লেখযোগ্য।

মূলে ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই, একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তরই এই নামে পুজিত হয়। কিন্তু কোথায় বা তাঁহাকে কূর্মাকৃতিতে দেখা যায়। মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণ (ইন্দাস থানা), বালসির নবজীবন (ইন্দাস থানা), পানখাই-এর রন্তক রায়, সিয়াসের কালাচাঁদ বা বংশীধর (কোতুলপুর থানা) কূর্মাকৃতি। ধর্মঠাকুরের এক এক স্থানে এক এক রূপ। রিসলি (Risley) সাহেব তাঁহার "Tribes and castes in Bengal" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে পশ্চিম বাংলার ডোম সম্প্রদায় মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট নরাকৃতি ধর্মঠাকুরের পুজা করে। আবার মানিকরাম গাঙ্গুলি গোপালপুরের কাঁকড়াবিছা ধর্মঠাকুরের বন্দনা করিয়াছেন; সম্ভবতঃ এই ধর্মঠাকুর কাঁকড়াবিছার আকৃতির ছিলেন।

ধর্মঠাকুরকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হয়। রূপরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গলে বর্ণনা দিয়াছেন:

"ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি
ধবল বরণে বাড়ী ঘর
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনি লোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর।"

যাহারা ধর্মঠাকুরের পুজা করিয়া থাকে তাহারা প্রধানতঃ ডোম শ্রেণীর লোক। পুজারীর উপাধি পণ্ডিত; দেয়াসি নামেও কোথায় কোথায় পরিচিত। ধর্মপুজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত জাতিতে ডোম ছিলেন। যেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য আছে, সেখানে বাৎসরিক পুজা অনুষ্ঠানে বর্তমান কালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হন বটে কিন্তু একমাত্র পুজা ছাড়া এই পুরোহিতের দেবতার উপর আর কোন অধিকার থাকে না। এই অধিকার দেয়াসির। ডোম ভিন্ন অন্য কয়েকটি নিম্নশ্রেণীও দেয়াসির কাজ করে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পুজা সাধারণতঃ বৈশাখী পুর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়; আবার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ী পুর্ণিমায়ও কোন কোন স্থানে হয়। গাজন বাৎসরিক ধর্মপুজার এক বিশিষ্ট অঙ্গ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্মপুজার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে। গাজনের উৎসবে গ্রামের জনসাধারণ জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে যোগদান করে। পুর্বে গাজনের সহিত যুক্ত ছিল চড়ক। চড়কে শরীরের নানা স্থানে শলাকাবিদ্ধ অবস্থায় ভক্তগণ বংশদণ্ডের উপর দোলায়মান থাকিত। এই প্রক্রিয়া আদি

ধর্মপূজার কৃচ্ছ্রসাধনেরই পরিচায়ক ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত খৃষ্টান মিশনারীগণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তখন সারেঙ্গা অঞ্চলের সাঁওতালগণের মধ্যে এইরূপ চড়কের প্রচলন ছিল।

মল্লরাজগণের লোক-ধর্ম প্রীতি

মল্লরাজগণের আদি ধর্ম-বিশ্বাস যাহাই থাকুক না কেন তাঁহারা ছিলেন লৌকিক ধর্মের পোষক। এই ধর্মের বহু দেবদেবী মহাযানবাদে গৃহীত হইয়া পরে তন্ত্রমাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে স্থান লাভ করে। মনসাদেবী ও ধর্মঠাকুরের প্রীত্যর্থে তাঁহারা বহু নিষ্কর জমি দান করেন, আবার ভৈরব, বরম প্রভৃতি লোক দেবতার পূজা ও উৎসবে উৎসাহ দান করিয়া গণসংযোগ রক্ষা করিতেন। তান্ত্রিকতার প্রসারের সহিত শক্তি উপাসনাও মল্লরাজ বংশে প্রবেশ করে এবং ইহার সহিত শক্তিপূজার নানারূপ লৌকিক প্রচলনও লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী, চণ্ডী, দুর্গা প্রভৃতি তৎকাল প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। শোনা যায় যে, মৃন্ময়ী দেবীর সম্মুখে নরবলি দেওয়া হইত। জনসাধারণের মধ্যে মনসা, চণ্ডী বা ধর্মঠাকুরের আখ্যান ও উপাসনা যে গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি করিত, কালক্রমে মনসামঙ্গল, চণ্ডিমঙ্গল, ও ধর্ম-

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গলের প্রভাব তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়া এই সকল দেবদেবীর পূজা ও তৎসম্পর্কীয় আচার অনুষ্ঠান সমাজ জীবনে এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মল্লভূম অঞ্চলে কয়েকজন ধর্মমঙ্গল রচয়িতা আবির্ভূত হন এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাহাদের পরিচয় পর-অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের জন্মস্থান মল্লভূমসংলগ্ন রাঢ় অঞ্চল। রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মঙ্গলকাব্য-সমূহের প্রভাব মাত্র মল্লভূমবাসীকেই নহে মল্লভূমের বাহিরে বাঁকুড়ার অন্যান্য অঞ্চলকেও অভিভূত করে। এই মঙ্গলকাব্য প্রচলিত লোকধর্ম ও তৎসম্পর্কীয় কাহিনীর বাহক এবং ইহার বৈশিষ্ট্য হইল প্রথমতঃ ইহা যে-যুগের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত তাহা হইল অর্ধ-ঐতিহাসিক এক পুরাতন যুগের ; দ্বিতীয়তঃ মধ্যযুগে জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম-বিশ্বাস ছিল তাহা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—

"মঙ্গলকাব্যে যে সমস্ত দেবদেবীর স্তবগান করা হইয়াছে তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে শান্ত ও উগ্ররস বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে ও ইহারা সকলেই ধর্মক্ষেত্রে

নূতন আগন্তুকরূপে জনসাধারণের মধ্যে নিজ পূজা প্রচারের জন্য উৎকট ও অশোভনরূপে আগ্রহশীল। এই নবাগত দেবদেবী গোষ্ঠীর মধ্যে চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর মোটের উপর শমরস প্রধান। চণ্ডীদেবীর চরম পরিণতিতে যদি বা কোন অনার্য উপাদান মিশ্রিত থাকে, তথাপি মোটের উপর ইহার পৌরাণিক রূপটিই আর্যধর্মের যুগ-যুগান্তরবাহী সহজ ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানস-গঠন যখনই সর্বভারতীয় আদর্শ হইতে স্বাতন্ত্র্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই দৈবশক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনা করা ইহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। চণ্ডী এই স্বভাবধর্মের অনুকূল ও পরিপোষকরূপে শীঘ্রই বাঙ্গালীর ধর্ম-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দয়াময়ী অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রবল হইয়া উঠিল। ·· ···এই মিশ্রগুণসম্পন্না দেবীর জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে মুসলমান শাসনের প্রারম্ভিক যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বৌদ্ধতন্ত্র হইতে উদ্ভূত এই ভীমকান্তগুণের সমাবেশ তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থার সমর্থন পাইয়া জীবনের একটি প্রধান অভীপ্সার বিষয় হইল। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার ও ইহার প্রতিবিধানে আত্ম ও রাষ্ট্রশক্তির অপ্রাচুর্যের হেতু মানুষ নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, ঐশ্বর্যের জন্য অতিমাত্রায় দৈবশক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িল। বিশেষ দেবীর পূজা করিলে অভাব-অনটন, সাংসারিক আধি-ব্যাধি, শত্রুর অভিভব ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এইরূপ একটি বিশ্বাস সার্বজনীন হইয়া উঠিল।······ সর্বোপরি এই অকৃপণ প্রসাদ বর্ষণের মূলে আছে মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা ও সন্তান-বাৎসল্য।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ সম্বন্ধে অভিমত

"ধর্মঠাকুর যদিও বিষ্ণুর অবতার রূপে হিন্দু-দেব-পরিমণ্ডলে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার চরিত্র হইতে বহিরাগত আগন্তুকের চিহ্ন সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার পূজা পদ্ধতি ও চরিত্র পরিকল্পনায় আর্যেতর প্রভাব এতই সুস্পষ্ট, তাঁহার প্রতিবেশ ও প্রতিষ্ঠান-ভূমির মধ্যে এমন একটা উদ্ভট অসাধারণত্ব বিদ্যমান, এমন কি তাঁহার আবির্ভাবের মধ্যে এমন একটা কুণ্ঠিত অপরিচয়ের অস্পষ্টতা পরিব্যাপ্ত, যাহাতে তিনি ঠিক হিন্দু-ধর্ম সংস্কারের অনুমোদিত দেবতত্ত্বের অন্তর্লীন হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি অন্ত্যজ সমাজের খিড়কি দরজা দিয়া হিন্দুর পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিলেও

তাঁহার বিরুদ্ধে কোন তীব্র বিদ্রোহ ও উগ্র প্রতিবাদ প্রধূমিত হইয়া উঠে নাই।

"মনসাদেবী কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহার দেবত্ব স্বীকৃতি প্রচলিত সংস্কার ও ঔচিত্য বোধের প্রতি এরূপ রূঢ় আঘাত হানে যে ইহা মানুষের মনে ভক্তিবৃত্তির সমর্থন বঞ্চিত।……তিনি মানবের অবিমিশ্র ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, ভক্তির মধ্যে যে ভয়ের অংশ বিদ্যমান তাহাই তাঁহার পূজার পাদপীঠ রচনা করিয়াছে। ……মনসাদেবীর প্রতি এই অপ্রশমিত বিরোধ বাঙ্গালী কবির পক্ষে এক হিসেবে বিশেষ হিতকর হইয়াছে, তাঁহার কল্পনায় উদ্দীপ্ত পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়-সংকল্পের প্রতীক চাঁদ সদাগরের সৃষ্টি-প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। ……মনসাদেবীর দ্বিতীয় অবদান বেহুলা চরিত্রের সতীত্বদৃপ্ত মাধুর্য।"

ইহার পূর্বেই তন্ত্রোক্ত ধর্মের অবনতির সূচনা হইয়া গিয়াছে। অবনতির সহিত এই ধর্মের বিকৃতি হয়। এক শ্রেণীর নিকৃষ্ট তন্ত্র আবির্ভূত হইয়া দৈহিক ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির সহিত পরাজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় যুক্ত করিয়া নানাবিধ গুহ্য সাধন ও প্রক্রিয়ার বিধান দিল। ইহা হইতেই রূপ পায় "সহজ সাধন" প্রক্রিয়া :

তন্ত্রোক্ত সাধনের অবনতি

"বাসলি আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডিদাসে কিছু কয়
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়।
ছাড়ি যপতপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে
… … …
ভজন তোমার রজক ঝিয়ারী
রামিনী নাম যাহার।"

বিকৃত তন্ত্রধর্ম ও তদোচিত আচার, অনুষ্ঠান প্রায় সর্বশ্রেণীকে স্পর্শ করে। ফলে যাহা ছিল পূর্বে সহজ পূজা তাহা হইল উৎকট। ইহার উপর কটাক্ষ করিয়া বৈষ্ণব কবি নরোত্তম বলিয়াছেন :

"করয়ে কুক্রিয়া জত কে কহিতে পারে
ছাগ-মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে।"

(২)

বৈষ্ণবযুগ ও পরবর্তীকাল

মল্লরাজগণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁহারা অন্যান্য বহু সমসাময়িক সামন্তরাজগণের ন্যায় নিজেদের বহিরাগত বলিয়া পরিচয় দেন নাই। যদিও বাগ্‌দি বা মালজাতির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহারা "বাগদি রাজা" নামে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন, যাবতীয় প্রত্যন্ত দেশবাসী জাতি ও উপজাতির উপর তাঁহাদের প্রভাব ছিল অসাধারণ। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বাগদি, ডোম, উপজাতি লইয়া গঠিত ছিল তাঁহাদের সামরিক বাহিনী; পাল বা সেনরাজগণের "খস-মালব-হুণ-কুনিক-কর্ণাট-লাট" প্রভৃতির ন্যায় কোন ভাগ্যান্বেষী, বিদেশী, বেতনভুকের ইহাতে স্থান ছিল না। সামরিক বাহিনীতে ছিল রাজ্যের সর্বজাতি, সর্বশ্রেণীর লোক, রাজ-পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া কর্মকার, কুম্ভকার, সাধারণ কৃষিজীবী, উপজাতীয়গণ পর্যন্ত। রাজা যে প্রজাবর্গের প্রতিনিধি ইহা প্রমাণ করাইবার জন্যই মনে হয় মল্লরাজগণ অতি সাধারণভাবে থাকিতেন; রাজভবন গঠিত ছিল খড়ের চালের গৃহে, অট্টালিকায় নহে। তাঁহাদের বিজয় অভিযানেও এই সরল অথচ সক্রিয় জীবনধারা পরিলক্ষিত হয়:

মল্লরাজগণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

"অয়ঃপাত্রে পয়ঃ পানং চিপিটকঞ্চ চর্বণম্
শয়নমশ্বপৃষ্ঠে চ মল্লরাজস্য লক্ষণম্।"

সদা যুদ্ধেরত মল্লরাজ লৌহনির্মিত ঢালে জলপান করিতেন, সঙ্গে যে চিড়া থাকিত তাহা চর্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন আর অশ্বপৃষ্ঠেই নিদ্রা যাইতেন।

ইহাতে যে কর্মশক্তি ও কর্মোন্মাদনার আলেখ্য পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তারপর ইহা ম্লান হইয়া যায়। অনেকের মতে ইহার কারণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ ও ইহার আতিশয্য।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশে এক নূতন যুগের সূচনা করে। অধ্যাত্ম সাধনার উৎকর্ষ ছাড়াও এই যুগে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, কাব্য ও কৃষ্টির আবির্ভাব দেখা যায় তাহা অতুলনীয়। বিকৃত তন্ত্রের প্রভাবে যখন ধর্ম ও জীবন "কুক্রিয়ায়" আচ্ছন্ন, তখন চৈতন্যের বাণী আনিল এক অভিনব নব-

চৈতন্যোক্ত বৈষ্ণবধর্ম

চেতনা। বাহ্যিক অন্ধ-আচার-অনুষ্ঠানের মরুবালি যেখানে ন্যায়, ধর্ম ও বিচারের পথ গ্রাস করিতেছিল, সেখানে প্রবাহিত হইল বিনয়, ভক্তি ও ভগবদ প্রেমের ভাগীরথী ধারা।

চৈতন্য-ধর্ম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে মল্লভূমের রাজধর্ম হিসাবে গৃহীত হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর উপাসনা খৃষ্টীয় চতুর্থ-শতকে দামোদর-তীরে প্রচলিত দেখা যায়। মল্লরাজ বংশও যে এই দেবতার উপাসক-মণ্ডলীতে স্থান গ্রহণ করেন তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় রাজধানীর "বিষ্ণুপুর" নাম আরোপণে, কয়েকজন মল্লরাজের বিষ্ণুবাচক নাম গ্রহণে এবং ধরাপাটের প্রাচীন জৈন মন্দিরকে বিষ্ণু মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠা করায়। এই বিষ্ণু হইতেছেন পৌরাণিক বিষ্ণু অথবা "মহাভারতের" কৃষ্ণ বাসুদেব, বৃন্দাবনের প্রেম-ভক্তি বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণ নহেন। "ভাগবত"এর বৃন্দাবনলীলা রসিক শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই অঙ্কুরিত হইতেছিল এবং ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর ছাতনার বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" পুঁথি, প্রায় সম-সাময়িক বর্ধমানের কুলিনগ্রামের মালাধর বসু রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" পুঁথি ও আরও পুর্ববর্তী জয়দেব গোস্বামীর রচনা হইতে। কথিত আছে যে চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির বিশেষ সমাদর করিতেন। এই সকল রচনা চৈতন্য-প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগামী দূত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ জীবনে ইহাদের স্পর্শ প্রতিফলিত হয় নাই। কাহিনী প্রচলিত আছে যে পরমশাক্ত বীর হাম্বীরও ভাগবত পাঠ শুনিতেন; তাঁহার নিকট ভাগবত-পাঠ শ্রবণ তৎকাল প্রচলিত অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ ছিল না।

বাঁকুড়ায় প্রাক্ বৈষ্ণবযুগে বিষ্ণু উপাসনা

রাজা বীর হাম্বীরের চৈতন্য-ধর্ম গ্রহণের সহিত এক কাহিনী জড়িত আছে। শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবাচার্যগণ গৌড়ে অর্থাৎ বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের সুষ্ঠু প্রচারের জন্য বহু মূল্যবান বৈষ্ণব পুঁথিসহ শ্রীনিবাস আচার্যকে গৌড়ে প্রেরণ করেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে ছিলেন নরোত্তম ও আর একজন বৈষ্ণব গোস্বামী। গভীর অরণ্য পার হইয়া তাঁহারা মল্লভূমির গোপালপুর গ্রামে রাত্রি যাপন করেন ও গভীর নিদ্রামগ্ন হন। এই সময় বীর হাম্বীরের অনুচরগণ শকট-বাহী পুঁথিগুলি

চৈতন্যধর্মের অনুপ্রবেশ শ্রীনিবাস আচার্য ও বীর হাম্বীর

লুণ্ঠন করে। শ্রীনিবাস প্রভৃতি সকলে ইহাতে সম্পূর্ণ অভিভূত ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হন। শোকে মুহ্যমান শ্রীনিবাস উন্মাদের ন্যায় লুণ্ঠিত পুঁথির অনুসরণ করেন ও বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। বৈষ্ণব কবি নিত্যানন্দ দাসের "প্রেমবিলাসে" এই কাহিনীর পরিচয় আছে :

"পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুর
নিজদেশ বলি বাড়ে আনন্দ প্রচুর।
মালিয়ারা বলি গ্রামে ভৌমিক হয়
রহিলা স্বচ্ছন্দে তাহে হইয়া নির্ভয়।
গোপালপুর এক গ্রাম অতি মনোহর
সেই স্থানে রাত্রে বাস আনন্দ অন্তর।

— — — —
— — — —

এথা ত আচার্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া
একদিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিয়া।
কারে নাহি জানে তিঁহো তারে নাহি জানে
বাউলের প্রায় কেহো করে অনুমানে।
কভু ভিক্ষা মাগি খায় কভু জলপান
কোথা রহেন কোথা যান নাহি স্থানাস্থান।
দশদিন নগর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া
একদিন বৃক্ষতলে আছেন বসিয়া।"

অবশেষে একজন সুদর্শন ব্রাহ্মণ-যুবকের সাক্ষাৎ পান। যুবক তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া অভিভূত হন এবং ইঁহারই সহায়তায় শ্রীনিবাস রাজসভায় প্রবেশ করিতে পান। রাজ-সভায় ভাগবত পাঠ হয় ; রাজার নিকট ভাগবত পাঠ হয়, ব্যাখ্যা করেন রাজ-পণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী। কিন্তু এই ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রীনিবাসের মনঃপুত হইল না।

"ভাগবত পড়ে পণ্ডিত রাজা তাহা শুনে
অর্থ করে ভালমন্দ কিছুই না জানে।"

কয়েকদিন এই ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীনিবাস আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না

"রাস পঞ্চাধ্যায়ী পড়ে সদর্থ না জানে
বসিয়া শ্রীনিবাস ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে।"

রাজাকে বলিলেন যে ব্যাখ্যা ঠিক হইতেছে না, তিনি ব্যাখ্যা করিবেন। রাজার অনুমতি লইয়া তিনি ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদভাগবত পাঠ ও বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়।

"শ্রীমুখের অর্থ শুনি পাষাণ মিলয়
রাজা কান্দে হস্ত দিয়া আপন মাথায়।"

অবশেষে মল্লরাজ পরিজনসহ শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন।

"রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল ধ্যানাদিক যত
শিক্ষা করাইল শ্রীরূপের গ্রন্থ মত।"

বীর হাম্বীর চৈতন্য-প্রবর্তিত এই বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। নরহরি চক্রবর্তীর "ভক্তি রত্নাকর"এ বলা আছে যে "কালাচাঁদ"এর বিগ্রহ তিনিই নির্মাণ করেন ও শ্রীনিবাস আচার্য দ্বারা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-কার্য সমাধা করান। কালাচাঁদের মন্দির নির্মিত হয় পরবর্তী রাজা রঘুনাথ সিংএর সময়। "মদনমোহন" বিগ্রহও রাজা বীর হাম্বীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও ইঁহার মন্দির নির্মিত করেন দুর্জন সিং।

বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে বীর হাম্বীর

"শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদাম্ভোজেষু তৎপ্রীত্যয়ে
মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্মলে
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্ধং স্বচেতোহলিনা
শ্রীমদ্দুর্জনসিংহ ভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা।"

কথিত আছে যে তিনি তীর্থযাত্রা পরিক্রমায় বৃন্দাবন গমন করেন ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভাবধারা বিষ্ণুপুরে প্রচলন করেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব রীতিতে বিষ্ণুপুর বিভূষিত হয়, জলাশয়ের নামকরণ হয় বৃন্দাবনের স্মৃতিতে— যমুনা, কালিন্দি, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড; গ্রামেরও নামকরণ হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে—দ্বারকা, মথুরা। তাঁহার সময়ে রাস, দোল প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসব বিষ্ণুপুরে প্রচলিত হয়। বহু বৈষ্ণব পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রাজ গ্রন্থাগার শোভিত করে। বীর হাম্বীর বৈষ্ণব সঙ্গীতও রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকরে যে সকল সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে, ইহাদের দুইটি বীর হাম্বীরের রচিত:

পদকর্তা বীর হাম্বীর

(১) "প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলে মনের আশ
তোমা বিনু গতি নাহি আর।

আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিট
ঘুচাইলে রাজ অহঙ্কার ॥

— — —

— — —

যমুনার কুলে যাই তীরে সখি ধাওয়া ধাই
রাধাকানু বিলসয়ে সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া ব্রজপুর সদা ধীয়া
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥”

(২) “শুনগো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব যে গো উচাটন
প্রেম করি খোয়াইনু পরাণি ॥

— — —

— — —

শাশুরী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়।”

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে মল্লরাজগণ হইলেন পরম-ভাগবত বৈষ্ণব। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকও হইলেন তাঁহারা। মল্লরাজগণ, এমন কি রাজ-প্রাসাদের মহিলাগণ পর্যন্ত, বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন; অনেকে আবার বৈষ্ণবগীতিও রচনা করেন। রাজা বীর হাম্বীর যে একজন পদকর্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন ইহার পরিচয় পুর্বে দেওয়া হইয়াছে। রাজা গোপালসিং শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল পুঁথি রচনা করেন। মল্লভূমের অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের কবিরাজ মহাশয়দের পুর্বপুরুষ কবিপতি বল্লভদাস ও গোকুলদাস মোহান্তের নাম উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের সহিত প্রকৃতপক্ষে মূল গৌড়ীয় বা বাংলা

বৈষ্ণব অনুশাসনে মল্লরাজগণ

পদকর্তা বীর হাম্বীর

গোপালসিং

সংস্কৃতির সহিত মল্লভূম তথা বাঁকুড়া ও মানভূম—বর্তমান পুরুলিয়া ও ধানবাদ—অঞ্চলের গভীর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।[১] এই সংস্কৃতির বাহকদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইল। মল্লরাজগণের ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দান প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে ও তাঁহাদের অনুকরণে ছাতনা ও অন্যান্য সামন্তবর্গ ব্রহ্মোত্তর দানাদি দ্বারা স্বীয় রাজ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের এই প্রান্তে এমন কবি কমই ছিলেন যিনি মল্লরাজবংশের সুখ্যাতি করেন নাই। এই দান হইতে বিধর্মীয় মুসলমান সম্প্রদায় পর্যন্ত বাদ যায় নাই। মল্লরাজগণের উদার ধর্মভাব বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পূর্বেই পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্মের প্রবেশ হয় তাহাদের গৌরবময় যুগেই। বাংলার অন্যান্য বহু অঞ্চলের ন্যায় ইহার পিছনে কোন সামরিক অভিযান লক্ষিত হয় না। ধর্ম-প্রচারের বাহক ছিলেন মুসলমান সাধু—পীর, দরবেশ, ফকির সম্প্রদায়। এই ধর্মের উপর কোনরূপ বিজাতীয় ব্যবহার করা হয় নাই। শোনা যায় যে কুরমণ শা নামে একজন মুসলমান ফকির রাজা বীর হাম্বীরের রাজ-সভায় উপস্থিত হন; রাজা তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমি দান করেন। কুরমণ শা যেখানে বসবাস করেন সেই স্থান এখনও তাহার নামানুসারে কুরমণতলা নামে পরিচিত; তাঁহার সমাধিস্থলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে এখনও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। লৌকিক দেবতা মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতির প্রীত্যর্থেও মল্লরাজগণ বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের উদারতা ও দানাদি কীর্তি

ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দানাদি দ্বারা যে সকল উচ্চবর্ণের স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা হয় তাঁহারা ছিলেন কৃষিকার্যে অপারগ। শাস্ত্রীয় বিধানও ছিল এই সকল শ্রেণীর স্বহস্তে কৃষিকার্য পরিচালনার বিপক্ষে। সুতরাং রাজ-প্রদত্ত ভূমি আবাদ করিতে বা কৃষিকার্যের উপযোগী করিতে যে সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিতে হইল তাহারা হইল মূল কৃষিজীবী, সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোক। অবস্থানুগতিকে যে চুক্তিতে ইহাদের সহিত কৃষিজমি বন্দোবস্ত হয়, কৃষক-প্রজার পক্ষে তাহা হইল সহজ ও সুবিধাজনক। এই চুক্তি আরও সহজ ও সরল

ব্রহ্মোত্তরাদি দান কৃষিজীবনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

(১) লেখক পুরুলিয়া জিলার অভ্যন্তরে বহু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী দেখিয়াছেন। ইহাদের অনেকেরই আগমন মল্লভূম হইতে।

হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর। মন্বন্তরের ফলে আবাদি জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা হইল কম সুতরাং নূতন নূতন সুবিধা প্রদানে প্রজা পত্তন ও বহিরাগত কৃষকসম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করা ভিন্ন উপায় থাকিল না। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সহিত এই অবস্থার যে পরিবর্তন হয় তাহার পরিচয় পুর্বে দেওয়া হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মল্লরাজগণের কয়েকটি চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনে। প্রতিবৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিনে রাজা সামন্ত-বর্গ ও উপজাতি লইয়া যে "আখান শীকারে" বাহির হইতেন, তাহা পরিত্যক্ত হয়। দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমীর দিনে মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে যে অসিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইত তাহা মাত্র বাহ্যিক ক্রীড়ায় পরিণত হয়। দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানেও পরিবর্তন আসে। শক্তি পরিচায়ক ও পৌরুষ ব্যঞ্জক উৎসবের স্থান অধিকার করে বৈষ্ণবোচিত রাস, দোল ও অন্যান্য মহোৎসবাদি। কিন্তু সাধারণ লোকসমাজে এই পরিবর্তন যে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নাই তাহার উল্লেখ পরে করা হইল।

বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবে রাজবংশের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠান

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে মল্লরাজগণের আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহোৎসব শক্তি পুজায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেখানে একসময় নরবলি হইত বলিয়া কিংবদন্তি আছে, সেই দুর্গোৎসবে পশুবলি পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইল এবং আজ পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়। বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে দুর্গাপূজা যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সহিত বাংলার অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত পুজার এইরূপ পার্থক্য বর্তমান যে তাহা অতি সাধারণ দর্শকেরও মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া পারে না এবং মনে হয় যে ইহা হইতেছে শক্তিদেবীকে বৈষ্ণব অনুশাসনের ভিত্তিতে রূপায়ণের প্রয়াস। এই দুর্গোৎসবের একটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী বিনয় ঘোষ মহাশয়।[১]

"বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদের দুর্গোৎসব অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়। জিতাষ্টমীর পরের নবমীতে প্রথমে আসেন "বড় ঠাকরুণ।" রূপোর পাতে মহিষ-মর্দিনী মূর্তি—নাম 'বড় ঠাকরুণ'। রাজগৃহেই থাকেন এবং নবমীর দিন রাজার ঘর থেকে তাঁকে এনে কৃষ্ণবাঁধে স্নান করিয়ে, নবপত্রিকাসহ পুজো করে 'দুর্গামেলায়' প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবপত্রিকা—ধান্য, মান, রম্ভা, কচু, হরিদ্রা,

(১) পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ

জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক। নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। বড় ঠাকরুণকে এনে মৃন্ময়ী তলার সামনে শিরীষ গাছের তলায় স্থাপন করে "পাটে" পুজো করা হয়। পরে মেলার উপর পুজা হয়। তারপর থেকে প্রতিদিন নিত্যপুজা হতে থাকে। চতুর্থীর দিন আসেন "মেজ ঠাকরুণ" একটি ঘট মাত্র। গোপালসায়র থেকে রাজপুরোহিত ঘটে জল ভরে নিয়ে আসেন। পরে পুজা হয় মেজঠাকরুণের। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর রাজপুরোহিত ক্ষীরকুল তলায় যান। ক্ষীরকুল একরকম ফলের গাছ, রাজবাড়ীর পিছনেই ক্ষীরকুল তলা। এই ক্ষীরকুল তলায় আগে বিষ্ণুপুরের রাজাদের অভিষেক হ'ত।......এই ক্ষীরকুল তলায় রাজ-পুরোহিত ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর যান রাজারাণীকে দুর্গার পট দেখাতে। একে 'পট দর্শন' বলে। ঘরের ভিতর থেকে খোপের ফাঁক দিয়ে রাজা ও রাণী পট দর্শন করেন। তারপর দুর্গাপট নিয়ে রাজপুরোহিত বাদ্য-ভাণ্ডসহ ক্ষীরকুল তলা থেকে শ্যামকুণ্ড পার হয়ে বিল্বতলায় আসেন। বিল্বতলায় বোধন হয়। পরে দুর্গাপটসহ দুর্গামেলায় এসে পট স্থাপন করা হয়। এই দুর্গাপটই হলেন "ছোট ঠাকরুণ"। বড় ঠাকরুণ, মেজ ঠাকরুণ ও ছোট ঠাকরুণ এইভাবে দুর্গামেলায় প্রতিষ্ঠিত হন। বড় ঠাকরুণ মহিষ-মর্দিনী, মেজঠাকরুণ জলভরা ঘট, ছোট ঠাকরুণ দুর্গাপট।

"সপ্তমীর দিন রাজবাড়ীর অন্দর থেকে দশভূজা মূর্তির স্বর্ণপট বাইরে আনা হয়। স্বর্ণপটের এই দশভূজা মূর্তিকে বলা হয় 'পটেশ্বরী'। নবপত্রিকা ও দুর্গাপট সহ পটেশ্বরীকে কৃষ্ণবাঁধের ঘাটে নিয়ে পুজা করা হয়। পরে দুর্গামেলায় নিয়ে এসে প্রথম নীচে মাটিতে রেখে 'পাটে' পুজো করা হয়। তারপর উপরে তুলে যথারীতি বড় পুজা করা হয়।

"মহাষ্টমীর দিন সকালে অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবী রাজবাড়ীর অন্দর থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যেই স্নান করেন, বাইরে কোন সায়রে যান না। তারপর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন। মহা স্নানের পর পুজার আয়োজন করা হয়। পুজোর কিছুক্ষণ আগে পোষাক প'রে, তলোয়ার হাতে নিয়ে রাজা আসেন,—এসে মহাপাত্রের (পুরোহিত) কাছা ধরে দাঁড়ান। মহাপাত্র পুষ্পাঞ্জলি দেন। দুবার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলে রাজা তোপধ্বনি করার হুকুম দেন। ...রাজার আদেশ পেয়েই তোপ দাগা হয়। সমগ্র মল্লভূমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং শোনা মাত্রই সর্বত্র মহিষ-মর্দিনীর মহাষ্টমীর পুজা আরম্ভ হয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদের

দুর্গোৎসবের এটা বংশানুক্রমিক রীতি। সারা মল্লভূম ব্যাপী লক্ষ লক্ষ লোক আজও মহাষ্টমীর দিন মল্লরাজদের এই তোপধ্বনির সঙ্কেত শোনবার জন্য কান পেতে উৎসুক হয়ে থাকেন। তোপধ্বনির পর মহাষ্টমী পুজা আরম্ভ হয়, শুধু রাজধানীতে নয় সারা মল্লভূমে। ......নবমীর দিন এক বিচিত্র পুজানুষ্ঠানের রীতি আছে বিষ্ণুপুরে। নিশাভোর (রাত বারটার পর) এক দেবীর পুজা হয়, দেবীর নাম 'খচ্চর বাহিনী' (সিংহ বাহিনী নন)। ঘটে ও পটে খচ্চর বাহিনীর পুজা হয় কিন্তু দুর্গার ধ্যানেই হয়। পুজার পদ্ধতি বিচিত্র। ঘটের দিকে পিছন ফিরে বসে পুরোহিত পুজা করেন, পুজার সময় কেবল দু'জন পুরোহিত ছাড়া আর কেউ থাকে না।

"দশমীর দিন সকালে রাজা দুর্গামেলায় আসেন, এসে নিজ হাতে ধরে নবপত্রিকা বিসর্জন দিয়ে আসেন। সন্ধ্যার পর রাজপোষাক পরে পাল্কী চড়ে ইঁদতলায় যান। ইন্দ্রপুজা ইঁদপরব যেখানে অনুষ্ঠিত হয় তাকেই ইঁদতলা বলে। রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে ইঁদপরবের খানিকটা সম্পর্ক আছে, অভিষেক উৎসবই বলা চলে। ক্ষীরকুলতলায় রাজা ও রানীর ষষ্ঠীর দিন 'পট দর্শন' এবং দশমীর দিন রাজার ইঁদতলায় অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানত নবপত্রিকা দিয়ে ইঁদতলায় একটি তোরণ তৈরী করা হয়, নাম 'সরকদরজা'। দরজার কাছে অনন্ত-দেবের পাষাণ মূর্তি স্থাপন করা হয়। দরজার একদিকে দাঁড়ান রাজা, অন্যদিকে পুরোহিতরা। তারপর রাজা একে একে এইগুলি দরজা পার করে দেন— এঁড়ে গরু, উখান থালা, তলোয়ার, ডোমদের ঢোল, ঢাল। এপার থেকে রাজা হাতে ধরে দরজা পার করে দেন, ওপার থেকে পুরোহিতরা টেনে নেন। তারপর পাল্কি চড়ে রাজা বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে শাঁখারিবাজারে 'বুড়ো ধর্মতলায়' যান। বুড়াধর্ম বা বৃহদাক্ষ বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্মরাজ ঠাকুর। বাড়ি ফিরে গিয়ে ঢাল তলোয়ার লাঠি নিয়ে রাজা নিজে ফৌজদার ও সেনাপতিদের সঙ্গে খেলা করেন, নৃত্য বাদ্যোৎসব হয়। অতঃপর রাজা তাঁর চৌকিতে এসে বসেন এবং ব্রাহ্মণরা তাঁকে আশীর্বাদ করেন।"

বিভিন্ন ভাবধারার সংমিশ্রণ লক্ষণীয়।

অবৈষ্ণব সাহিত্যে ও কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব

এই বৈষ্ণব সংস্কৃতি বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন শাখায় প্রসারিত হইয়া যে প্রভাব বিস্তার করে তাহা অ-বৈষ্ণব সাহিত্য ও কাব্যকেও স্পর্শ করে। এমন কি প্রবল গণ-দেবতা ধর্ম-ঠাকুরও কবির বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের সহিত অভিন্ন

বলিয়া কল্পিত হন। ধর্মমঙ্গল রচয়িতা রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মের রূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন :

"এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা রূপ গুণ কথা হরিহর চন্দ্র ধাতা
যতকিছু আপনি গোসাঞি ॥
কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্ম সনাতন বেদ
পাণ্ডব বংশের যদুমণি।
তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বাহুবল
যোগ-রূপে জন্মিলা আপনি ॥"

বৈষ্ণব ধর্মে আতিশয্য

কালক্রমে রাজগৃহীত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে আতিশয্য প্রবেশ করে। এই আতিশয্য যে কিরূপ উৎকট আকার পরিগ্রহ করে তাহা ধর্ম-মঙ্গল রচয়িতার বর্ণনায়

"রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী।
চারা মানা হাথীকে ঘোড়াকে মানা ঘাস
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস ॥"

রাজা গোপাল সিংএর সময় এই আতিশয্য আরও উগ্ররূপ ধারণ করে। রাজা আদেশ বাহির করিলেন যে রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে দুই বেলা হরিনাম জপ অবশ্য কর্তব্য। এ সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজা স্বয়ং ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতেন যে তাঁহার উক্ত আদেশ প্রতি-পালিত হইতেছে কি-না। কোন সন্ধ্যায় কোন মুদির দোকানের পার্শ্বে এইভাবে গোপনে আসিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে মুদি তাহার পুত্রকে বলিতেছে—"দে তো বাবা জপের মালা, গোপাল সিংএর বেগারটা সেরে নি।" 'গোপাল সিংএর বেগার' কথাটি এখনও অযথা দায় ও তাচ্ছল্য প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। গোপাল সিংহের সময়ের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণর হলওয়েল সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। হলওয়েল সাহেবের উক্তির কিছুটা যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, দেখা যায় যে তখন সাধারণের ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম প্রণোদিত হইয়া রাজা গোপাল সিং ও তৎপরে রাজা চৈতন্য সিং যে ভাবে ভূমি ও অর্থ

দান করেন তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহাদের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে আবার রাজ্যের এক বিশেষ সঙ্কটকালে রাজকোষ অর্থ-শূন্য থাকায় ইহার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে।

ভাবসর্বস্ব অহিংস বৈষ্ণবভাব গ্রহণের পর হইতে মল্লরাজ-শক্তি ক্রমশঃ শৌর্যবীর্যহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু দেখা যায় যে সাহিত্য, কলা ও কৃষ্টির অভিব্যক্তিতে এই বৈষ্ণবযুগ এক গৌরবময় অধ্যায়।

সংস্কৃতির বিকাশে বৈষ্ণব যুগ

এই সময় বিষ্ণুপুরের সংস্কৃতি বিভিন্ন ধারায় বিভিন্নরূপে বিকশিত হয়। স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির কারুকার্য। যে সকল দেবালয় এই যুগে নির্মিত হয় তাহাদের মধ্যে আছে মল্লেশ্বর, রাসমঞ্চ, কালাচাঁদ, শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন, লালজি, জোড়বাংলা, মদনগোপাল, মুরলিমোহন, মদনমোহন, জোড়মন্দির, রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব, রাধাশ্যাম। গঠনের সজীবতায় ও স্থাপত্য ভাস্কর্যের কারু-কৌশলে মন্দিরগুলি ইহাদের বর্তমান অবস্থাতেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শুধু মাত্র এই জিলার নহে সারা বাংলাদেশের গৌরব এই ভাস্কর্যশিল্প।

স্থাপত্য শিল্প

এই সময় যে সকল বিশাল জলাশয় বা বাঁধ খনন করা হয় সেগুলিও বিস্ময় সৃষ্টি করে। বাঁধগুলির সৃষ্টির পশ্চাতে অন্য যে কোন কারণই থাকুক না কেন, সাধারণ প্রজার জলকষ্ট দূরকরা যে প্রজাবৎসল মল্লরাজগণের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যদিও সাধারণতঃ এই অঞ্চলে বাঁধের সৃষ্টি হয় ঢালু জমির নিম্নদিকের আড়াআড়ি মাটির বাঁধ দিয়া বর্ষার জলধারাকে সঞ্চয় করিয়া, এই সুবৃহৎ বাঁধগুলিতে জলসরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য খনন কার্যেরও প্রয়োজন হইয়াছিল মনে হয়। কৃষ্ণবাঁধই আয়তনে সর্ব-বৃহৎ, দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল। অন্য বাঁধগুলি এইরূপ বৃহদাকারের না হইলেও এইরূপ সুপরিসর জলাশয়ের একত্র সমাবেশ অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

এই যুগে মঙ্গলকাব্যের কয়েকজন কবি মল্লভূম অঞ্চলে নিজেদের রচনা প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। ধর্মমঙ্গল প্রণেতা মানিকরাম গাঙ্গুলির নিবাস ছিল বেলডিহা। কেহ কেহ মনে করেন যে ইং ১৬৯৪ হইতে ১৭৪৮ সালের মধ্যে তিনি তাঁহার

সাহিত্য ও কাব্য

পুঁথি রচনা করেন কিন্তু ডঃ সহিদুল্লার মতে ইহা রচিত হয় ইং ১৬৫৪ সালে। আর একজন ধর্মমঙ্গলের কবি সীতারাম ছিলেন ইন্দাসের অধিবাসী; তাঁহার ধর্মমঙ্গল রচিত হয় ইং ১৫৯৭ সালে। মল্লভূমের অন্য একজন ধর্মমঙ্গল

রচয়িতা ছিলেন প্রভুরাম, তাঁহার রচনার সময় ইং ১৬৬৬ সাল। ধর্মমঙ্গল লেখক গোবিন্দরামও মল্লভূমের অধিবাসী ছিলেন ; তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথিতে রচনার সময় দেওয়া হইয়াছে ১০৭১ ; অনেকে মনে করেন ইহা মল্লাব্দ। উপরোক্ত ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ও পরবর্তীকালের ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের রচনায় ময়ূরভট্ট নামে একজন প্রাচীন কবির উল্লেখ করেন। ময়ূরভট্টের কোন রচনা পাওয়া যায় না কিন্তু এই সব কবিগণ তাঁহাকে "হাকন্দ পুরাণ" নামে পুঁথির রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করেন। যে স্থানে লাউসেন তাঁহার দেহকে নবধা বিভক্ত করিয়া ধর্ম-ঠাকুরকে আহুতি দেন তাহাই হাকন্দ নামে পরিচিত। ময়নার "হাকন্দ পোখরের" উল্লেখ পুর্বে করা হইয়াছে। ময়ূরভট্ট যে ধর্মমঙ্গল কাহিনীর একজন প্রাক্তন স্রষ্টা ইহা অনেকের বিশ্বাস। তাঁহার রচনার সময় কাহারও মতে পঞ্চদশ শতাব্দী, আবার কাহারও মতে ইহারও পুর্বে। ধর্মপূজার ব্যাপকতা ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচুর্য বিবেচনা করিয়া এই মল্লভূম অঞ্চলেই যে তাঁহার বাস ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

মঙ্গল কাব্যের কবিগণ

এ যুগের সাহিত্যে একাধিক বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবি শঙ্কর কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ করা ছাড়াও তিনি শিবমঙ্গল ও শীতলা মঙ্গল নামে দুই-খানি মঙ্গল কাব্য ও একখানি পাঁচালি রচনা করেন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল বিষ্ণুপুরের নিকট পানুয়া। মল্লরাজ বীর সিংএর সময় তাঁহার শিবমঙ্গল রচিত হয়। শিবমঙ্গলে রাজা বীর সিংএর তিনি প্রশস্তি বন্দনা করিয়াছেন :

শঙ্কর কবিচন্দ্র

"বীর সিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদা মতি ইষ্টের চরণে
সংকীর্তন অভিলাষী তাঁহার দেশেতে বসি
দ্বিজ শিবচন্দ্র রস ভনে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের সার সংকলন করিয়া তিনি যে অনুবাদ কাব্য রচনা করেন, তাহা একসময় বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইত। কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের "অঙ্গদ রায়বার" নামীয় অংশ কবিচন্দ্র শঙ্করের রচনা।

কেহ কেহ বলেন যে "অনর্ঘ্য রাঘব" রচয়িতা মুরারী মিশ্র মল্লভূমের অধিবাসী ছিলেন। রাজা গোপাল সিংএর সময় তাঁহারই বংশধর প্রখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ বাচস্পতি পাণ্ডিত্যের জন্ম সুখ্যাতি অর্জন করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন :

কাশীনাথ বাচস্পতি

"পশ্চিমবঙ্গের আর একটি পণ্ডিত সমাজ বহু শতাব্দী ধরিয়া পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে বিষ্ণুপুরের বহু পণ্ডিত নানা শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমরা কেবল দিগন্তবিশ্রুত কীর্তি কাশীনাথ বাচস্পতির নাম উল্লেখ করিতেছি। তিনি মল্লাধিপতি গোপাল সিংএর সভায় ছিলেন ও রঘুনন্দনের টীকা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।"

মল্লভূমিতে জ্ঞানের চর্চা যে কি পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা এই অঞ্চলে প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁথির প্রাচুর্য হইতে বোধগম্য হয়; এইসব সংগৃহীত পুঁথির বহুখণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্থান পাইয়াছে। মাত্র সাহিত্য-কাব্যে নহে, অন্য বহু বিষয়েও এই যুগ উৎকর্ষ লাভ করে। পুরাণ কথকতা প্রবর্তক গদাধর শিরোমণি ছিলেন সোনামুখীর লোক। সুবিখ্যাত গণিতবিদ শুভঙ্কর ছিলেন মল্লরাজগণের একজন কর্মচারী। শুভঙ্করের আর্যার সহায়তায় ইদানীং কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের যাবতীয় বৈষয়িক হিসাব নিকাশ সম্পন্ন হইত। যে সেচখাল তাঁহার কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবলে সৃষ্ট হইয়া এই অঞ্চলের এক বিশাল উষর ভূমি খণ্ডকে শস্যশ্যামলা করে তাহা আজও "শুভঙ্কর দাঁড়া" নামে বিদ্যমান। সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রেও মল্লভূম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। মল্লরাজগণ মাত্র সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন না; ইহার উৎসাহ দাতা হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লি ও উত্তর প্রদেশ হইতে কৃতী শিল্পীবৃন্দ বিষ্ণুপুরে আমন্ত্রিত হইতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৃদঙ্গ শিল্পী পীরবক্স ও ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে আগমন করেন ও বহু সঙ্গীতানুরাগীকে শিক্ষা দেন। ভারতীয় সঙ্গীত-ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতে বিষ্ণুপুরী ঘরনা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। এখানে সৃষ্ট হয় অভিজাত সঙ্গীত সাধনার তীর্থক্ষেত্র। সুরশিল্পী সমাজে একদিকে প্রচলিত হয় উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরীর অনুশীলন, অন্যদিকে হয় বাংলার নিজস্ব-সম্পদ টপ্পা প্রভৃতি।

পুরাণ কথক গদাধর শিরোমণি

গণিতবিদ শুভঙ্কর

সঙ্গীত সাধনা—সুরতীর্থ বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সাধনা মাত্র মল্লভূমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সমগ্র বাংলাদেশে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাংলার সঙ্গীত সমাজ ক্ষেত্রেও বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যগণ দীর্ঘকাল যাবৎ আধিপত্য বিস্তার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সঙ্গীতাচার্য হিসাবে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পর অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কেশবলাল চক্রবর্তী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুভট্ট প্রভৃতির অভ্যুদয়ে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত সাধনার এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্তলালের পুত্র। পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তিনি অতি অল্প সময়েই হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতিতে কৃতবিদ্য হন ও পরে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে শিক্ষালাভ করেন। গোপেশ্বর ছিলেন একজন অদ্বিতীয় সঙ্গীত পরিবেশক ; সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন তিনি। যদুভট্টের প্রকৃত নাম ছিল যদুনাথ ভট্টাচার্য। তাঁহার পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য যন্ত্রসঙ্গীতে বিষ্ণুপুরে সুনাম অর্জন করেন। যদু প্রথমে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত বিশারদ রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন ; পরে কলিকাতার বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ও বর্ধমান, ত্রিপুরা ও পঞ্চকোটের রাজসভায় গান করিয়া তিনি অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের জন্য কয়েকটি গান রচনা করেন। একটি হইল—

"তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এসমুদ্রে আর কভু হবনাকো পথহারা।"

আর একটি গান—

"তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে।"

বাংলাদেশে ধ্রুপদ গানের চর্চার প্রসার ও প্রচার যদু ভট্টের এক বিশেষ অবদান।

গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী ময়মনসিংহের রাজ সভায় সঙ্গীতাচার্য ছিলেন ; তাঁহার পিতা দীনবন্ধু গোস্বামী ছিলেন একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত বিশারদ। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীতে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন ; পরে তিনি মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সঙ্গীতাচার্য হিসাবে যোগ দেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেছেন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ জ্ঞান গোস্বামী। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট সঙ্গীতবিদ্যা লাভ করেন।

অপর একজন সঙ্গীতাচার্য রামকেশব ভট্টাচার্য প্রথমে কুচবিহারের রাজসভায় ও পরে কলিকাতার রামদুলাল দের গৃহে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন। কেশবলাল চক্রবর্তী কলিকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত ধনী তারকলাল প্রামাণিকের গৃহে সঙ্গীতাচার্য ছিলেন।

যাত্রা প্রভৃতি

যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতিতেও বিষ্ণুপুরের শিল্পীগণ পুরাতন সংস্কৃতির বাহক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিগত শতাব্দীতেও নন্দলালের রামায়ণ গান, রামশরণ শর্মা ও ব্রজনাথ রজকের যাত্রাদল বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া গিয়াছে। রজনী মাঝি ও কেশব মাঝির তরজা, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথকতা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করে। লোক সঙ্গীতের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে সরোজিনীর ঝুমুর।

দশাবতার তাস

চিত্তবিনোদন সহ শিল্প চাতুর্যের নিদর্শন স্বরূপ দশাবতার তাস এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই তাসের প্রথম প্রচলন হয় বহু শতাব্দী পূর্বে; পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আনুমানিক অষ্টম অথবা নবম খৃষ্টাব্দে মল্লরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই তাসের প্রথম প্রচলন হয়। তিনি মনে করেন যে ইহাই ভারতের এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর আদিমতম তাস খেলার পদ্ধতি। দশাবতার তাস সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

"দশাবতার তাসের আকৃতি চৌকো নয়, গোল। ব্যাস চার থেকে সাড়ে-চার ইঞ্চির মত। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম (রঘুনাথ), পরশুরাম (ভৃগুরাম), বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি—এই দশ অবতারের রূপ ও প্রতীক অবলম্বন ক'রে এ-তাসের শ্রেণী বা রংয়ের বিভাগ করা হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীতে বারোটি তাস হিসাবে মোট তাসের সংখ্যা একশ কুড়ি। প্রতি রংয়ের সম্মানিত বা "অনার্স কার্ড" দু'টি—অবতার ও তাঁর উজির বা মন্ত্রী। এ দু'টি তাসে পট-পদ্ধতিতে বহুবর্ণ মূর্তিচিত্র অঙ্কিত থাকে। পরবর্তী অল্প গুরুত্বের তাসগুলি ইওরোপীয় তাসের মতই, দশ থেকে ক্রমনিম্ন সংখ্যায় টেক্কা অবধি কল্পিত। এগুলিকে চিত্রিত করবার জন্য মূর্তি-নকশার পরিবর্তে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মীন অবতারের প্রতীক মাছ, কূর্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, রামের তীর, পরশুরামের কুঠার, বলরামের মুষল, জগন্নাথ বা বুদ্ধের পদ্ম, আর কল্কির খড়্গ। এইভাবে

যে তাসে তিনটি মাছ আঁকা আছে, সেটা মীন-অবতারের তিরি, যেটিতে পাঁচটি তীর সেটি রাম-অবতারের পঞ্জা ইত্যাদি। অন্য একটি নিয়ম অনুসারে, অবতারদের মধ্যে 'অভিজাত' হলেন রাম, পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কি। আর 'অন্ত্যজ'—মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন। অভিজাত অবতারদের ক্ষেত্রে, 'অনার্স কার্ডে'র পরেই টেক্কা সর্বোচ্চ তাস; তারপরে দুরি, তিরি ইত্যাদিক্রমে গুরুত্ব হ্রাস হ'তে হ'তে দশ হ'ল সবচেয়ে ছোট তাস। কিন্তু অন্ত্যজ অবতারদের বেলায়, অবতার ও উজিরের পরে দশ হ'ল সর্বোচ্চ তাস আর টেক্কা সব থেকে ছোট। এ ছাড়াও আর এক মজার নিয়ম আছে। দিনের বেলার খেলায় রাম অবতারের তাস দিয়ে খেলা শুরু হয়: রাত্রে 'স্টার্টার' হল মীন অবতার।" (১)

বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশের পূর্বে সাধারণ লোকসমাজে যে শক্তিপূজার নানাবিধ লৌকিক রূপের প্রচলন ছিল ইহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি মল্লরাজগণের প্রবল অনুরাগ ও তদ্‌জনিত উৎকট আতিশয্য ও বিধিব্যবস্থা ইহার কোনটিই জনসাধারণকে চিরাচরিত লোক-ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই।

লোক ধর্ম

সুতরাং একদিকে যেমন বৈষ্ণবানুমোদিত উৎসব সমূহ মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়, অন্যদিকে আবার চণ্ডী, কালী, মনসা, বাসলি, ধর্ম-ঠাকুর প্রভৃতির পূজা ও তৎসম্পর্কীয় আচার অনুষ্ঠান বাহুল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। নিম্ন স্তরের মধ্যে বরম, কুদ্রা, সিনি প্রভৃতি বনদেবতা এখনও প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন। ইঁহাদের কোন দেবালয় নাই, মূর্তিও নাই। সাধারণতঃ কোন বৃক্ষতলেই ইঁহাদের আশ্রয় আর এখানেই তাঁহারা পূজা গ্রহণ করেন। পূজায় আতপ চাউল দেওয়া হয় আর উৎসর্গ করা হয় পোড়ামাটির হাতী, ঘোড়া, শূকর বা ছাগ। পোড়ামাটির হাতী, ঘোড়ার জন্য পাঁচমুড়ার কুম্ভকার সম্প্রদায় সুখ্যাতি অর্জন করিয়া আসিতেছে। এই সকল দেবদেবীর পূজা ভিন্নও ভাদু পূজা প্রায় সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে পঞ্চকোটে ভাদু উৎসবের প্রচলন হয় ও প্রথমে বাউরী ও সমশ্রেণী অন্যান্য জাতির প্রধান উৎসব ভাবে বর্তমান থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে ইসলাম ধর্মের উপর কোন বিজাতীয় ব্যবহার করা হয় নাই। এখনও হিন্দু, মুসলমান, দুই সম্প্রদায়ের নিকটই মুসলমান সাধুগণ সমান

(১) শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"রূপসী বাংলা" আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করেন। পীরের দরগায় পীরসাহেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা ও নিজ নিজ অভিষ্ট পুরণের জন্ম তাঁহার কৃপা লাভ করিতে মুসলমানগণ যেমন সিন্নি ও মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ও পীরসাহেবের ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখিয়া একই উদ্দেশ্যে অনুরূপ উপহার দেন। মল্লযুগে মুসলমান পীর ও ফকিরের উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অতি উচ্চস্তরে পৌছিয়াছিল মনে হয়। মল্লভূমের ধর্মমঙ্গল কবি সীতারাম (ষোড়শ শতাব্দী) তাঁহার রচনায় বলিয়াছেন যে ধর্ম-ঠাকুর তাঁহার নিকট ফকিরের বেশে দর্শন দেন :

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে উদারভাব

"সীতারাম দাস গান ধর্মের চরণে
ফকিরের বেঁশে ধর্ম দেখা দিল বনে।"

জয়পুর থানার লোকপুরে পীর ইসমাইল গাজীর আস্তানা আছে ; অদূরবর্তী গড় মান্দারণে আছে তাঁহার সমাধি। এই পীর ইসমাইল গাজীর বন্দনা করিয়াছেন রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত ধর্ম মঙ্গলে

"মান্দারণ গড়ে বন্দিব পীর ইসমাইলি ॥
পীর ইসমাইলি সঙরিয়া পথ চলি যায়
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায় ॥"

জিলার বহুস্থলে বিশেষতঃ ইন্দাস, কোতুলপুর ও জয়পুর অঞ্চলে এইরূপ বহু পীর আছেন যাঁহারা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও ভাবধারার সমন্বয় সাধনের প্রয়াস প্রবলতর হইতেছিল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন মল্লভূমের অন্তর্গত কামারপুকুরে যুগধর্ম প্রবর্তক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ও জিলারই অভ্যন্তরে জয়রামবাটিতে তাঁহার শক্তি-স্বরূপিণী উত্তর সাধিকা গ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ মনে হয়। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতেছি। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন "For one reason more, a history of Mallabhum may be commended to the reader. It is that it has given birth to Paramhansa Ramakrishna, whose life and teachings have appeared to the world outside Bankura, the world outside Bengal, and the world outside India—আমি পাঠককে আরও একটি কারণে মল্লভূমের ইতিহাস পাঠে উৎসাহ দিতে পারি। কারণটি হইতেছে যে এই মল্লভূমেই জন্মলাভ করিয়াছেন পরমহংস রামকৃষ্ণ-যাঁহার জীবনী ও বাণী প্রচারিত হইয়াছে বাঁকুড়ার বাহিরে, বাংলার বাহিরে ভারতের বাহিরে—সারা পৃথিবীতে।"

চতুর্থ পর্ব

প্রকৃতি পরিবেশ

"ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর
নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে।"

(১)

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

বাঁকুড়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—ইহার এক বিশাল অংশ হইতেছে বিস্তৃত অসমতল ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া বহু নদনদী প্রায় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে বহু বিভিন্ন খণ্ডে পরিণত করিয়াছে। এই অসমতল ভূমির এক প্রান্ত হইতেছে গাঙ্গেয় উপত্যকা। অন্য প্রান্ত পর্বত ও অরণ্য-বহুল অঞ্চল। প্রাকৃতিক কারণে জিলা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত—পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল। হুগলি ও বর্ধমান জিলা সংলগ্ন বিষ্ণুপুর মহকুমা পূর্বাঞ্চল; ইহা একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, মাটিতে আছে পলিমৃত্তিকার আধিক্য।

পূর্বাঞ্চল

নদ-নদী বাহিত পলিমাটি হইতে এই অঞ্চলের সৃষ্টি পশ্চিমাঞ্চল হইতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের। মাটি দোআঁশলা ও এঁটেল। প্রাকৃতিক দৃশ্য বৈচিত্র্যহীন—যতদূর দেখা যায় উন্মুক্ত প্রান্তর; বর্ষাকালে বহু বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্রের সবুজ সমারোহ আর গ্রীষ্মে শুষ্ক, জলহীন। পশ্চিমাংশে সদর মহকুমার দিকে মাটি লাল কাঁকর মিশ্রিত, শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে দেখা যায় বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি। এক সময় এই উচ্চভূমি শাল ও পলাশের বনে আচ্ছন্ন থাকিত, বর্তমানে এই বন নাই। পূর্বাঞ্চলের বৈচিত্র্যহীন দৃশ্যের কিছু ব্যতিক্রম ঘটায় বাঁশ, তাল, আম্রকানন বেষ্টিত পল্লী প্রান্ত বা দূর বনানীর সীমারেখা।

আরও পশ্চিমে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ উচ্চ, খণ্ডিত ও উন্নত। এখানে অকৃষি জমির আধিক্য। মাটি শিলাবহুল। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে শিলাখণ্ড মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির হইয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে, আবার কোথায়ও

পশ্চিমাঞ্চল

বা ইহা ছোট পাহাড়ের রূপ লইয়াছে। এই অঞ্চলে দেখা যায় দীর্ঘ অসংলগ্ন পাহাড়-শ্রেণীর প্রাচুর্য। পাহাড়ের কোনটি বা নগ্ন, কোনটিতে আছে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষগুল্মের সমারোহ। পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য; ইহাদের মধ্যে আছে উত্তরে বিহারী-নাথ (উচ্চতা ১৫৬৯ ফুট), শুশুনিয়া পাহাড় (উচ্চতা ১৪১২ ফুট)। বিহারীনাথ শালতোড়া থানায়, শুশুনিয়া ছাতনা থানায়। শালতোড়া থানায়

পাহাড়

বহু ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়, যেমন দেখা যায় মেজিয়া থানায়। গঙ্গাজলঘাটি থানায় অমর কাননের নিকট কোরা পাহাড়টি ছোট কিন্তু সুন্দর। দক্ষিণে কাঁসাই নদীর

অববাহিকার পাহাড়ের শ্রেণী উচ্চতায় নগণ্য হইলেও দূর হইতে দেখা যায় নীল মেঘের ন্যায়। এই পাহাড় শ্রেণীর এক অংশে নির্মিত হইয়াছে মনোরম পরিবেশের মধ্যে কংসাবতী জলাধার। খাতরা থানায় যে নিম্ন পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মসকের পাহাড়।

এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি হইতেছে যে, ইহা কিছুদূর পর্যন্ত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অবনত হইয়াছে, ক্রমাবনতির মুখে ঢাল সৃষ্টি করিতে করিতে নিম্নভূমিতে পড়িয়াছে; কিন্তু আবার উপরের দিকে উঠিয়া কিছু দূরে উঠিয়া নিম্নগতিতে চলিয়াছে। এইভাবে ভূ-পৃষ্ঠ ধরিয়াছে অসংখ্য স্থির তরঙ্গের রূপ।

পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের সাধারণ রূপ

মাটিতে কাঁকর ও লাল বালুকণার প্রাচুর্য থাকিলেও যেখানে নিম্নভূমিতে তরঙ্গের অধোগতি বাধা পাইয়াছে, সেখানে আছে দোআঁশলা ও মেটের সংযোগ। এই নিম্নভূমি অর্থাৎ দুই শ্রেণী উচ্চভূমির মধ্যস্থিত স্থানে নানাবিধ শস্যের আবাদ হয়। শস্য ক্ষেত্রগুলি ভূ-পৃষ্ঠের স্তরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিম্ন প্রদেশ হইতে উপরে উঠিয়াছে স্তরে স্তরে। সর্বনিম্ন স্তরকে বলা হয় বাহাল—ধান চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট। বাহালের উপরের স্তর কানালি, এখানেও ধান চাষ হয়। কানালির উপরের স্তর বাইদ, সাধারণতঃ রবিশস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

এই অসমতল ভূমি ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমির সহিত, আর উত্তরে মেজিয়া ও শালতোড়ার পার্বত্য অঞ্চলে মিশিয়াছে। দক্ষিণের দিকে ইহা ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া কাঁসাই নদীর অববাহিকায় শেষ হইয়াছে। এই অববাহিকার একদিকে রায়পুর থানার দিগন্ত প্রসারিত সমতল ভূমি; অন্যদিকে মেদিনিপুর ও পুরুলিয়া জিলার প্রান্ত দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্য ও পাহাড়ে আবৃত ভূমি। বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য শুধুমাত্র বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে নহে, মনোরম সৌন্দর্য পরিবেশনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে; যে কোন পর্যটকের নিকট এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ আকর্ষণীয় না হইয়া পারে না।

যে অঞ্চলে কাঁকরের প্রাধান্য দেখা যায় সেখানে যে সব পাথরের অংশ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কোয়ার্জএর নুড়িই বেশী। প্রধানতঃ রাস্তা নির্মাণ

খনিজ পদার্থ

কার্যে সেগুলি খুঁড়িয়া বাহির করা হয়; বাড়ীঘর নির্মাণেও ইহার ব্যবহার আছে। জিলার বহু পুরাতন মন্দির এই পাথরে তৈয়ারী। এই পাথর সহজেই খুঁড়িয়া বাহির

করা যায় কিন্তু বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে ইহা হয় শক্ত ও কঠিন। জলবায়ুর প্রভাব ইহার উপর অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বহুজাতীয় খনিজ পদার্থ জিলায় ছড়ান আছে কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান নাই বলিলেও চলে। তামশোল অঞ্চলে চিনামাটির প্রাচুর্য দেখা যায় কিন্তু ইহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া বহির্জগতের সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্যের আশা কম। সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ইহা ব্যবহার করে। রাণী-বাঁধ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে নিকৃষ্ট প্রকৃতির লৌহ পাওয়া যায়; পুর্বে দেশীয় কর্মকার শ্রেণীর মধ্যে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রায়পুর ও রাণীবাঁধ অঞ্চলে যে প্রকৃতির মাইকা পাওয়া যায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহার চাহিদা নাই। দক্ষিণে সাতনালা অঞ্চলে মূল্যবান ধাতু উলফ্রাম পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের সময় ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার নিষ্কাশন উন্নত শিল্পে পরিণত হইয়াছে। রাণীবাঁধ অঞ্চলে তামার সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরে দামোদর তীরে আছে কয়লা, কিন্তু এই কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হওয়ায় শিল্পজগতে বিশেষ স্থান লাভ করে নাই।

বিহার সংলগ্ন পশ্চিম বাংলার এই প্রান্তের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাঁকুড়ার জলবায়ু শুষ্ক। চৈত্রমাস হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তপ্ত পশ্চিম বাতাস প্রবাহিত হইয়া দারুণ উত্তাপের সৃষ্টি করে; তাপমাত্রা ১১০ হইতে ১১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়া দিনের বেলায় এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। বহু জলাশয় জলহীন হয়, কূপও শুষ্ক হয়। জলাভাবে সাধারণ জীবনে নিদারুণ বিপর্যয় আসে। এই তাপমাত্রার সাময়িক হ্রাস করে কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার আতিশয্য কমিতে থাকে। বর্ষাকালের আবহাওয়া থাকে অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। শীতকালে প্রাকৃতিক কারণে শীতের আতিশয্য সংলগ্ন পুর্ব প্রান্তের জিলাসমূহ হইতে বেশী অনুভূত হইলেও আবহাওয়া থাকে মনোরম। জিলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাংলায় অন্যান্য বহু অঞ্চল হইতে কম। বর্ষাকালে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১০'৮ ইঞ্চি, আষাঢ়-শ্রাবণ ১২'২ ইঃ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১১'৯ ইঃ, ভাদ্র-আশ্বিন ৮'৭ ইঞ্চি। জিলার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫৫'২৬ ইঞ্চি।

জলবায়ু

নদ, নদী ও অরণ্য

নদ-নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী বা শিলাই, কংসাবতী বা কাঁসাই। ইহা ভিন্ন বহু ক্ষুদ্রকায়া জলধারা আছে, যেমন, গন্ধেশ্বরী, শালি, বিরাই। এগুলি উপরোক্ত নদ নদীতে মিশিয়াছে। প্রধান নদ-নদীগুলির গতি পশ্চিম হইতে ঈষৎ পূর্ব-দক্ষিণ। ইহারা মূলে পার্বত্য স্রোত, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় ইহাদের প্রবাহ থাকে ক্ষীণ; কিন্তু বর্ষায় হয় ইহার রূপান্তর। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নদীর জল স্ফীত হয়, অপরিমেয় জলরাশি উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া যায়। অস্বাভাবিক জলবৃদ্ধি বন্যার সৃষ্টি করে আর এই বন্যার সময় নদী পারাপার অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে গোযানের দীর্ঘ সারি বন্যার প্রকোপ উপশম না হওয়া পর্যন্ত নদী তীরে অপেক্ষা করিতেছে। জল যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পায় সেই ভাবেই নামিয়া যায়।

নদ-নদীর বৈশিষ্ট্য

পশ্চিম অঞ্চলের মাটিতে কাঁকর ও শিলার পরিমাণ বেশী থাকায় নদনদীর তীর এখানে উচ্চ, দৃঢ় ও সুস্পষ্ট। পূর্ব অঞ্চলে আবার পলি ও বালির প্রাধান্য থাকায় এখানে নদীতীরের প্রকৃতি অন্যরূপ। সুতরাং দেখা যায় যে পশ্চিম অঞ্চলে যেমন নদীর গতি পথের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না, পূর্ব অঞ্চলে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বিশেষতঃ নদীর বাঁকের দিকে।

নদনদীর মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হইল দামোদর নদ। প্রাচীন ধর্মকাব্যে দামোদরকে বলা হইয়াছে আন্তের গঙ্গা বা সত্যের গঙ্গা। ধর্ম-মঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী "লাউসেন চুরি" পালায় বলিয়াছেন যে ইন্দুমেটে বর্ধমান অতিক্রম করিয়া "সত্যের গঙ্গা দামুদর" নৌকায় পার হইয়াছিল। প্রখ্যাত ইনজীনিয়র উইলককস্ (Sir William Wilcocks) সাহেবের অভিমত এই যে অজয়, দামোদর প্রভৃতি নদ-নদীর প্রবাহ গঙ্গা প্রবাহ হইতে বহু প্রাচীন। সুদূর অতীতে এইসব নদনদী পার্বত্যভূমি হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব-দক্ষিণ গতিতে সোজা সাগরে পড়িত। নিম্ন বাংলায় ইহাদের মোহনায় সৃষ্ট হয় ডেল্‌টা বা "ব" দ্বীপ। বহুকাল পর যখন গঙ্গা বাংলার সমতলভূমিতে অবতরণ করে, ইহার প্রবাহ দামোদর-অজয়

দামোদর

প্রমুখ নদ-নদীর কঠিন, দৃঢ়, সুউচ্চ "ব" দ্বীপে বাধা পায় ; পরে অবশ্য গঙ্গা তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয় ও দক্ষিণ গতিতে সাগরে পড়ে। ফলে "ব" দ্বীপগুলি হয় খণ্ডিত আর অজয়, দামোদর প্রভৃতি হয় গঙ্গার উপনদী।

গঙ্গার ন্যায় দামোদরও এক সময় পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত ; সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীর নিকট ইহা এখনও পবিত্র। মৃত সাঁওতালের দেহ দগ্ধ করিয়া অস্থি সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয় ও পরে দামোদরের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস যে দামোদরের জলে অস্থি নিক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত মৃতের পারলৌকিক কাজ শেষ হয় না, মৃতের আত্মাও শান্তি ও বিশ্রাম পায় না। এই বিশাল নদের উৎস হাজারিবাগ জিলার শৈলমালা। জন্মস্থান হইতে দামোদরের গতি পূর্বাভিমুখে। ছোটনাগপুর মালভূমির এক বিশাল অংশ ধৌত করিয়া দামোদর বর্ধমান-বাঁকুড়ার সীমান্তে বরাকর নদের জলধারাকে গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার পর বাঁকুড়া জিলার উত্তর ভাগ দিয়া প্রায় ৪৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া বাঁকুড়াকে বর্ধমান হইতে পৃথক করিয়াছে। ইন্দাস থানার সীমা অতিক্রম করিয়া দামোদর বর্ধমান জিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মাইথন ও পাঁচেটে যথাক্রমে বরাকর ও দামোদর বক্ষে ড্যাম বা দৃঢ় বাঁধ নির্মাণের পূর্বে দামোদরের প্রকৃতি ছিল শীত ও গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ শুষ্ক বালুকাকীর্ণ আর বর্ষায় এক বিশাল উন্মত্ত জলপ্রবাহ। বৃষ্টির জল পাহাড় অঞ্চল ও উচ্চভূমি হইতে শত শত ধারায় ক্ষিপ্র গতিতে নামিয়া দামোদর গর্ভে আকস্মিক জলস্ফীতি ও ভয়াবহ 'হরপা' বানের সৃষ্টি করিত। তখন প্রায় প্রতি বৎসরই দামোদরের উচ্ছৃঙ্খল বন্যা নিম্ন প্রবাহস্থিত গ্রাম ও জনপদের অশেষ দুর্গতি সাধন করিত। দামোদর ও বরাকরের উপর কয়েকটি ড্যাম নির্মিত হওয়ায় বর্ষার দামোদরকে কিছু পরিমাণে বশীভূত করা হইয়াছে। দামোদর খালসমষ্টির কেন্দ্রস্থল দুর্গাপুরে যে ব্যারাজ নির্মিত হইয়াছে তাহাতে খাল মাধ্যমে প্রায় ১১৫৫০ কিউসেক পরিমিত জল সেচকার্যের জন্য মুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে ; ইহার মধ্যে বাঁকুড়া জিলার জন্য আছে প্রায় ২১৩৬ কিউসেক জল। (১)

পূর্বে প্রবাহের বহুদূর পর্যন্ত দামোদর নৌ-চলাচলের উপযুক্ত ছিল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেও মেজিয়ার অপর তীরে রাণীগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে কয়লা প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। দামোদরগর্ভ ক্রমশঃ বালুকাপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে দামোদর বর্ষা ভিন্ন অন্য কোন ঋতুতে নৌ-চলাচলের অনুপযুক্ত।

(১) কিউসেক—প্রতি সেকেণ্ডে এক কিউবিক ফুট।

দামোদর নদ প্রবাহ মাত্র প্রাচীন নহে, ঐতিহাসিকও বটে। সুদূর অতীতে এই দামোদর ছিল আর্যসংস্কৃতি ও প্রাগ-আর্য আদিবাসী অঞ্চলের সীমারেখা। প্রথম আর্যসংস্কৃতির বিস্তার হয় দামোদর প্রবাহ সংলগ্ন ভূভাগে, তারপর ধীরে ধীরে ইহার প্রসার হয় অভ্যন্তরে, কিন্তু প্রবল আর্যেতর সংস্কৃতির সংঘাতে ইহার গতি হয় শ্লথ। পরবর্তী যুগে দামোদর হয় উদীয়মান মুসলমানশক্তির পক্ষে দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ের প্রবল বাধাস্বরূপ। মধ্যযুগ হইতে বহু কাব্যে ও সাহিত্যে দামোদর অমর হইয়া আছে। ধর্ম-মঙ্গলের কবিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গাহিয়াছেন

"বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর"

দামোদরেব ন্যায় দ্বারকেশ্বর বা ধলকিশোরও প্রাচীন নদ। মধ্যযুগের ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে এই নদের উল্লেখ আছে। ইহাও বর্ণিত আছে যে এই নদের আকৃতি বিশাল, ভয়াবহ। পুরুলিয়া জিলার তিলাবনি পাহাড় দ্বারকেশ্বরের উৎপত্তি স্থল।

দ্বারকেশ্বর

তারপর ইহা কুটিল গতিতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ছাতনা থানার প্রান্তে বাঁকুড়া জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পরই আবার দ্বারকেশ্বর পূর্ব-দক্ষিণ গতিতে প্রবাহিত হইয়া বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর শহরকে পার্শ্বে রাখিয়া কোতুল-পুর থানার সীমান্তে হুগলি জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রবাহের নিম্নদিকে শিলাবতী বা শিলাই দ্বারকেশ্বরের সহিত মিশিয়াছে। এই যুক্ত ধারার নাম রূপনারায়ণ। গন্ধেশ্বরী দ্বারকেশ্বরের প্রধান উপনদী, বাঁকুড়া শহরের পূর্বদিকে ইহা দ্বারকেশ্বরে মিশিয়াছে। অন্য একটি উপনদী বিরাই বিষ্ণুপুরের অদূরে দ্বারকেশ্বরে পড়িয়াছে।

কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর উৎপত্তি হইতেছে পুরুলিয়া জিলার ঝালদা থানার উত্তরে জাবর পাহাড়ে। তারপর ইহা পূর্ব-দক্ষিণ গতিতে প্রবাহিত হইয়া খাতরা থানার প্রান্তে বাঁকুড়া জিলায় প্রবেশ করিয়াছে ও কিছুদূর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া অম্বিকানগরের নিকট কুমারী নদীর জল-ধারাকে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পর কংসাবতীর

কংসাবতী

গতি পূর্ব-দক্ষিণ। খাতরা ও রায়পুর থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা অবশেষে মেদিনিপুর জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। কংসাবতী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জিলার এক বিশাল অংশকে ধৌত করে। দামোদরের ন্যায় শীত ও

গ্রীষ্মকালে কংসাবতীর জলধারা থাকে ক্ষীণ কিন্তু বর্ষায় তাহার ব্যতিক্রম হয়। বর্ষাকালে ইহাতে যে প্লাবন হয় তাহা প্রবাহের নিম্নভাগে অবস্থিত অঞ্চলের বিশেষতঃ মেদিনিপুর জিলার অংশবিশেষের বিরাট অনিষ্টসাধন করিয়া আসিতেছে। ইহার প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে ও প্লাবনজল সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের উন্নতিকার্যে নিয়োগ করার জন্য যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহা "কংসাবতী পরিকল্পনা" নামে পরিচিত। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইবে।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে রঘুর কলিঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে যে কপিশা নদী উত্তীর্ণ হইবার কথা বলিয়াছেন, কেহ কেহ মনে করেন ইহাই হইল বর্তমান কাঁসাই নদী। কাঁসাই নদীর অববাহিকায় প্রাচীন কালে জৈন সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠে এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ বর্তমান আছে বুধপুর আর কাঁসাই-কুমারী নদীর সংযোগস্থলে পরেশনাথের জৈন সংস্কৃতির বহু চিহ্ন।

শীলাবতী বা শিলাই

শীলাবতী বা শিলাই নদীও মধ্যযুগের মঙ্গল সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। চণ্ডি-মঙ্গলে কবি মুকুন্দরাম এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন :

"চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইল উপনীত"

এই নদীর উৎপত্তি পুরুলিয়া জিলার হুরা থানার পাহাড় অঞ্চলে। ইন্দপুর ও খাতরা থানার সীমান্তে শিলাই বাঁকুড়ায় প্রবেশ করিয়াছে ও তারপর পূর্ব-গতিতে প্রবাহিত হইয়া এই দুই থানা ও সিমলাপাল থানার মধ্য দিয়া পড়িয়াছে মেদিনিপুর জিলায়। মেদিনিপুর প্রবেশ পথেই আর একটি ছোট জলধারা জয়পাণ্ডা মিশিয়াছে শিলাইয়ের সাথে। আরও নিম্নপ্রবাহে শিলাই ও দ্বারকেশ্বরের যুক্ত ধারা রূপনারায়ণ নদের সৃষ্টি করিয়াছে, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

আদি বনভূমি

বহুদিন পূর্বের কথা যখন বাংলার এই অঞ্চল ছিল নিবিড় বনে ঢাকা। প্রাচীন কাহিনীতে এই বনভূমির পরিচয় আছে। মল্লরাজগণের বিষ্ণুপুর নগরী যে-সকল ব্যূহ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, ঘন সন্নিবিষ্ট শাল জঙ্গলের সুদৃঢ় আবেষ্টনী ছিল তাহাদের অন্যতম। মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনায় জঙ্গল মহলের উল্লেখ আছে। ইংরেজ কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে জিলার পশ্চিম ভাগের অরণ্যাবৃত জঙ্গল মহলের উল্লেখ কোম্পানির নথিপত্রে বহুবার করা হইয়াছে। এক সময়

বাঁকুড়ার বনভূমিতে ছিল বহু জাতীয় বন্য জীবজন্তু। হস্তিযূথের প্রাচুর্য বেশ ছিল এবং অনেকে মনে করেন যে পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পী অরণ্যের হাতী হইতেই মাটির হাতী নির্মাণে প্রেরণা পায়। হাতী যে গত শতাব্দীতেও এই অঞ্চলের বনভূমিতে অবাধে বিচরণ করিত তাহার বহু উল্লেখ আছে। আর ছিল বাঘ, বরাহ প্রভৃতি জানোয়ার। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদেও শালতোড়া ও শুশুনিয়ার পাহাড় ও জঙ্গলে ছিল বহু বন্য বরাহ।

অতীতে যখন এই অঞ্চলে উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল, বনভূমির সহিত ইহাদের সমাজ জীবন ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বসতি স্থাপন বা কৃষিজমি লাভের উদ্দেশ্যে ইহার কোন অংশ পরিষ্কার করা হইত বটে, কিন্তু গ্রাম পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বার্থেই অরণ্য রক্ষার দায়িত্ব আসিয়া পড়িত গ্রামের জনসাধারণের উপর। বনভূমি গ্রাম-সমাজকে জোগাইত গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, চাষের লাঙল, গোরুর গাড়ীর উপাদান, জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি। বনের ফলমূল ও পশুকুল গ্রামবাসীদের আহার্যের স্বল্পতা পুরণ করিত। বনজাত শাল বা ঐ জাতীয় গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহা বাহিরে বিক্রয়, অনেকের পক্ষে আহার সংগ্রহের সহায়ক ছিল। আবার গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুরও গোচারণ ভূমি ছিল এই অরণ্য। তখন বন সংরক্ষণ, ইহাকে অগ্নির প্রকোপ হইতে রক্ষা করা ও যদৃচ্ছভাবে অরণ্য-ধ্বংস নিবারণ—ছিল গ্রাম মণ্ডলের বিশেষ দায়িত্ব। অরণ্য ছিল দেবতার প্রতীক, তাই "জাহিরস্থান" ছিল উপাস্য।

কিন্তু পরবর্তী কালে আদিবাসী উচ্ছেদ ও ইহাদের শোষণের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির ধ্বংসপর্ব আরম্ভ হয়। যে সকল ভূমিলিপ্সু সম্প্রদায় আদিবাসী অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পায়, তাহাদের নিকট বন হইল অর্থলাভের উৎস।

ক্ষীয়মান বনভূমি

আদিবাসীর ন্যায় তাহাদের অরণ্য প্রীতি ছিল না, অরণ্যকে তাহারা দেখিল অর্থলাভের দৃষ্টিভঙ্গীতে। চতুষ্পার্শ্বের সংযোগ ব্যবস্থার ও শিল্প-সংস্থার উন্নতি ও প্রসারের সহিত বনভূমি বৃক্ষহীন হইতে লাগিল। তখন বনভূমি ছিল জমিদারের অধিকারে। জমিদার ইহার অংশ বিশেষ নিজ অধিকারে রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ বিলি বন্দোবস্ত করিতেন ইজারা স্বত্বে বা কায়েমি মোকররী স্বত্বে। ইজারা প্রথায় বিলিই ছিল সাধারণ নিয়ম, আর সুবিধার জন্য এই ইজারা বিলি হইত বিভিন্ন খণ্ডে। ইজারা প্রথায় বনভূমি নির্মূল হইতে থাকে। কয়লা খনি ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের

জন্য ছোট শাল গাছের হয় বিরাট চাহিদা। তারপর বিগত মহাযুদ্ধের সামরিক প্রয়োজনে, শহর ও নগরের ক্রমবর্ধমান আর্থিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন নূতন রেলপথ নির্মাণ ও দুর্গাপুর অঞ্চলের উন্নতি বিধানে, নানা আকৃতি ও পরিমাপের শাল ও অন্যান্য কাঠের হয় প্রভূত প্রয়োজন। এদিকে আবার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কৃষিজমির সম্প্রসারণ চলে বন হাসিল করিয়া। এই সকল কারণে বনভূমির পরিমাণ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকায়, বনভূমি ইহার আদি গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হয়।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বনভূমির আয়তন কিভাবে খর্ব হইয়াছে তাহার চিত্র নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে বোঝা যাইবে।

ইং ১৯১৭-২৪ সালের মধ্যে যখন এই জিলার প্রথম জরিপ হইয়া স্বত্ব লিখন হয়, তখন বনভূমির পরিমাণ লিপিবদ্ধ হয় এইরূপ

সদর মহকুমা	২৫৪৯৩৮ একর অর্থাৎ মহকুমার মোট আয়তনের প্রায় এক-পঞ্চম
বিষ্ণুপুর ,,	৭৮০২৮ একর অর্থাৎ মহকুমার মোট আয়তনের প্রায় এক-ষষ্ঠ

ইং ১৯৪১ সালে সারাবাংলায় কৃষিজমির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ইছহাক সাহেবের নেতৃত্বে পরিমাপ হয়। এই পরিমাপের বিবরণীতে বাঁকুড়ার বন ভূমির পরিচয়ে বলা হইয়াছে সদর মহকুমায় প্রকৃত অরণ্যের পরিমাণ মাত্র ৩৯৬৪৩ একর; ইতিপূর্বে যাহা ছিল বনভূমি, তাহা হইতে ১৮৯৮৪৭ একর পরিমাণ আবাদোপযোগী পতিত জমিতে রূপান্তর হইয়াছে। সেইরূপ বিষ্ণুপুর মহকুমায় প্রকৃত বন হিসাবে পরিমিত হয় ১৮৬৯ একর, ভূতপূর্ব বনভূমি হইতে, রূপান্তরিত আবাদোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ ৩৭১৭৫ একর। বর্তমানে জিলার দুই মহকুমায় বনভূমির পরিমাণ বন-বিভাগের হিসাব অনুযায়ী সদর মহকুমায় ২৪৮৭২৭ একর ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৯৭৭২৩ একর (১) হইলেও প্রকৃত অরণ্যভাগ যে ইহা অপেক্ষা বহু কম তাহা যে কোন পর্যটকের দৃষ্টি বহির্ভূত হইবে না। বনবিভাগের তথ্য অনুযায়ী বনভূমির যে আয়তন পাওয়া যায় ইহার মধ্যে ইছহাক্ সাহেব যে পুরাতন বনভূমির আবাদোপযোগী পতিত জমিতে রূপান্তরের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ বহু জমি বর্তমান। রূপান্তরিত হইলেও জমির আদি বৈশিষ্ট্যই স্বীকৃতি পাইয়াছে। বাঁকুড়া হইতে খাতরা

(১) জিলা গেজেটিয়ার, বাঁকুড়া ১৯৬৭

যাইবার পথে রাজপথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত খর্বাকৃতি গুল্মে আবৃত বিস্তৃত অনাবাদি জমি—মূলে বনভূমি থাকায় এখনও বন বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। এইরূপ আছে বহু দৃষ্টান্ত।

উপরে যে আবাদোপযোগী পতিত জমির কথা বলা হইল ইহার সৃষ্টির পিছনে আছে যদৃচ্ছভাবে বৃক্ষকুল ধ্বংসের কাহিনী। জিলায় গোচারণ ভূমির নিতান্ত অভাব থাকায়, পূর্বে গবাদি পশু প্রধানতঃ অরণ্যজাত লতাপাতার উপর নির্ভর করিত। এই লতাপাতা জন্মিত বনবৃক্ষসমূহের নীচে, তাহাদেরই আচ্ছাদনে হইত পরিপুষ্ট ও বর্ধিত। বৃক্ষকুল যখন নিঃশেষ হইতে চলিল, ইহাদের আর বৃদ্ধি হইল না; ফলে গবাদি পশুর খাদ্যাভাব ঘটিল। ইহার প্রতিকারের জন্য স্থানীয় অধিবাসীগণ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিল তাহা এই: প্রতিবৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন শীর্ণ লতাপাতা ও ঝোপ-জঙ্গল শুষ্ক হইয়া পড়িল, তাহাতে দেওয়া হইল আগুন। আগুনে পুড়িয়া সেগুলি পরিষ্কার হইয়া গেল। তারপর দুই এক পসলা বৃষ্টি ইহার উপর দিয়া যাইতে না যাইতেই দেখা গেল যে নীচে চমৎকার ঘাস জন্মিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইভাবে চলিল আর ইহার ফলে নূতন কোন শাল বা অন্য বৃক্ষ জন্মিল না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই ইহাদের চারা গজাইবার সময় কিন্তু তখন আগুন দিয়া সব পরিষ্কার করা হইয়াছে, চারাও বিনষ্ট হইয়াছে।

এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উচ্চভূমি পরিষ্কার করা হইল ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল লাঙ্গল দিয়া মাটি চাষ। কিন্তু বর্ষায় এই মাটি বৃষ্টি স্রোতের সহিত ধুইয়া পড়িল নিম্নভূমিতে। ধুইয়া যাইবার পর যে মাটি অবশিষ্ট থাকিল তাহা নিরস পাথর বা কাঁকরে পরিপূর্ণ, শস্য উৎপাদনের অনুপযুক্ত, যদিও কোথায় কোথায় হইল কোদো প্রভৃতি নিকৃষ্ট শস্যের চাষ। প্রতি বৎসর এইভাবে মাটি ধুইয়া যাইতেছে। আবার বনভূমি বিলোপের জন্য বৃষ্টিজল কোন স্বাভাবিক বাধা না পাওয়ায় ক্রমাগত ভূমিক্ষয় সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহার ফলে নিম্নের নদীগর্ভ ভরাট হইতেছে।

বনভূমির আয়তন সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। জিলায় বৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে; নদনদীগুলিতে আকস্মিক বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে আর ইহার সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছে ভূমিক্ষয়। কৃষি ও কৃষকের পক্ষে এই অতিরিক্ত ভূমিক্ষয় আশঙ্কার কারণ। তারপর পশ্চিমের কষ্টদায়ক

বনভূমি সঙ্কুচিত হইবার ফল

উত্তপ্ত বায়ু গ্রীষ্মকালে জিলার অভ্যন্তরে প্রবেশে কোন বাধা পায় না। যে বাধা পূর্বে ছিল, বনভূমি লোপের সহিত তাহা অপসারিত হইয়াছে। ইং ১৯৪৯ সালের পূর্বে বনভূমির ধ্বংস নিবারণের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। এই বৎসর পশ্চিম বঙ্গ বেসরকারী অরণ্য-রক্ষা আইন প্রবর্তিত হয় এবং তাহাতে লুপ্ত প্রায় বনরাজির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নির্দিষ্ট হয়। ইং ১৯৫৪ সালে জমিদারি গ্রহণ আইন প্রবর্তনের ফলে যাবতীয় অরণ্যভূমি রাজ্যসরকারের তত্ত্বাবধানে আসে। অরণ্যরক্ষা ও নূতন বন স্থাপনের দায়িত্ব এখন রাজ্য-সরকারের।

বাঁকুড়ার অরণ্যজাত সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে নানাজাতীয় কাঠ, শিমুলতুলা, শালপাতা, বাঁশ প্রভৃতি। জিলার বাহিরে চাহিদা থাকায় প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে বাহিরে রপ্তানি হয়। বাঁশের কাজ এক শ্রেণী লোকের জীবিকার উপায়। শালপাতা সংগ্রহ ও ইহা বাজারে বিক্রয় করিয়াও অনেকে অন্নসংস্থানের সুবিধা করে।

(৩)

সংযোগ ব্যবস্থা

পূর্বে বলা হইয়াছে যে বৎসরের সর্বঋতুতে পরিবহণ উপযোগী কোন নদ-নদী জিলায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে যে ইহাদের কয়েকটি নৌ-বহনের উপযুক্ত ছিল তাহার প্রমাণ মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য হইতে পাওয়া যায়। পূর্বকালে দামোদর অববাহিকায় সমৃদ্ধ বণিককুলের বসতি ছিল ও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় মনসা মঙ্গলে। দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ছিল এই বণিককুলের হাতে। তাঁহাদেরই একজন ছিলেন চাঁদ সদাগর। চাঁদ সদাগরের বাসস্থান ছিল চম্পক নগর বা চাঁপাই নগরী ; সাধারণের বিশ্বাস যে ইহার অবস্থান ছিল সোনামুখী থানার উত্তর দিকে প্রবাহিত দামোদর নদের অপর তীরে, বর্ধমানের সিলামপুরের অদূরে। দ্বারকেশ্বর নদ যে মধ্যযুগে নৌ-চলাচলের উপযুক্ত ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ধর্মমঙ্গল রচয়িতা রূপরাম। মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডিমঙ্গলে আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন যে তিনি শিলাই নদী বাহিয়া আড়রায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও দামোদর ও কাঁসাই জিলার অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত নৌ-চলাচলের যোগ্য ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদৃচ্ছাক্রমে বনরাজির ধ্বংস ইহার জন্য কি পরিমাণে দায়ী তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বর্তমানে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোন কালে কোন নদীতে নৌ-চলাচল সম্ভব হয় না।

জলপথ

দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় রেলপথের যে শাখা রাঁচি-চক্রধরপুর ও গোমোকে কলিকাতার সহিত যুক্ত করিয়াছে তাহা এই জিলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এই রেলপথ খোলা হয় ইং ১৯০২ সালে। ইহার পর এই রেলপথকে এক লাইন হইতে দুই লাইনে রূপান্তর ছাড়া ইহার বিশেষ কোন উন্নতি সাধন হয় নাই। আসানসোল হইতে একটি রেলপথ দামোদর অতিক্রম করিয়া পুরুলিয়া জিলার আদ্রায় উপরোক্ত রেলপথের সহিত মিশিয়াছে এবং ইহাতে বাঁকুড়ার সহিত পূর্ব ভারতীয় রেলপথের সংযোগ হইয়াছে। জিলার উত্তর-পূর্বভাগে একটি অপ্রশস্ত রেলপথ বাঁকুড়া শহরকে বর্ধমান জিলার দক্ষিণাংশের সহিত সংযুক্ত

রেলপথ

করিয়াছে। এই রেলপথ সোনামুখী, পাত্রসায়র ও ইন্দাস থানার সহিত বাঁকুড়া শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করিয়াছে। দুর্গাপুর ব্যারাজ নির্মিত হইবার পূর্বে বর্ধমান শহরের সহিত বাঁকুড়া শহরের সংযোগ রক্ষার জন্য এই রেলপথ ছিল প্রধান অবলম্বন।

আকাশপথ

বিগত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে বিষ্ণুপুর মহকুমার পিয়ার-ডোবায় একটি বিমান ক্ষেত্র নির্মিত হয়। বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য।

স্থলপথ
প্রাচীন রাজপথ

জিলায় স্থলপথের সংখ্যা বহু, কয়েকটি আবার সুপ্রাচীন। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক হইতে পাটলিপুত্র বা পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজপথ ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক বেগলার সাহেবের মতে এই রাজপথ ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর ও দামোদর তীরস্থ তেলকুপি হইয়া উত্তর দিকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রঘুনাথপুর ও তেলকুপি পুরুলিয়া জিলায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইত্ সিং এই রাজপথ দিয়া তাম্রলিপ্ত হইতে বোধগয়ায় গিয়াছিলেন। বারাণসী হইতে আর একটি রাজপথ রাজমহল, সিউরী, রাণীগঞ্জ হইয়া বাঁকুড়া শহরের নিকট উপরোক্ত রাজপথের সহিত মিলিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ান চ্যাং এই পথ ধরিয়া বারাণসী হইতে কোজঙ্গলে আসেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে কোজঙ্গল হইল উত্তর রাঢ়। উত্তর রাঢ়ের সহিত দামোদরের দক্ষিণাংশ সংযুক্ত ছিল অপর একটি রাজপথ দ্বারা ; এই রাজপথ বর্ধমান জিলার কাঁকসা হইতে সোনামুখী হইয়া বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিষ্ণুপুরেই মনে হয় কলিঙ্গগামী রাজপথ তাম্রলিপ্ত-পথ হইতে বাহির হইয়া গড়বেতা, মেদিনিপুর, দাতন অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাই মল্লরাজ বংশের ও ছাতনা রাজবংশের কাহিনীর পুরুষোত্তম-পথ। উপরোক্ত প্রাচীন রাজপথগুলি ভিন্ন ছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের বারাণসী-পথ। এই রাজপথ হুগলি জিলার চাঁপাডাঙ্গায় দামোদর অতিক্রম করিয়া আরামবাগ মহকুমার মধ্য দিয়া কোতুলপুর সীমান্তে বাঁকুড়া জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে মিলিটারি বা সামরিক গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা কোতুলপুর-বিষ্ণুপুর হইয়া তেলকুপি রাস্তা বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রসারিত ছিল।

ইং ১৯৪৭ সালে জিলায় যে সব প্রধান রাস্তা বর্তমান ছিল, পরবর্তীকালে

তাহাদের বিশেষ সংখ্যা বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না। এই সালের পর মাত্র দুইটি পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়; ইহাদের একটি হইল কলিকাতা—নাগপুর রাজপথ, অন্যটি কোতুলপুর—আরামবাগ রাস্তা। প্রথমটি পরে পরিত্যক্ত হয় কিন্তু ইহার সিমলাপাল হইতে কাঁসাই নদী পর্যন্ত অংশ পরিত্যক্ত হইবার পূর্বেই নির্মিত হয়। ইং ১৯৪৭ সালের পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে পুরাতন প্রধান রাস্তা সমূহের উন্নতিবিধান ও দ্বারকেশ্বর, শালি ও বিরাই নদীর উপর সেতু নির্মাণ, যাহার ফলে বাঁকুড়া শহরের সহিত জিলার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বাংশের সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আরও দক্ষিণে রায়পুর থানার ও পূর্বে ইন্দাস, সোনামুখী ও পাত্রসায়র থানার অভ্যন্তরে রাস্তাসমূহের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। ফলে এই সকল অঞ্চলে যাতায়াতের ব্যবস্থা এখনও প্রায় পূর্বের ন্যায় আছে; বর্ষাকালে যাতায়াত দুঃসাধ্য হয়। জিলায় কাঁচা রাস্তার সংখ্যা বহু, সরকারী টেস্ট রিলিফ অব্যাহত থাকায় এই সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

বর্তমান রাজপথ

কয়েকটি উন্নত ধরনের পাকা রাস্তার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

১। মেদিনিপুর—বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া—রঘুনাথপুর
২। রাণীগঞ্জ—মেজিয়া—গঙ্গাজলঘাটি—বাঁকুড়া
৩। কোতুলপুর—বিষ্ণুপুর
৪। দুর্গাপুর—বরজোরা—বেলিয়াতোড়
৫। বাঁকুড়া—বেলিয়াতোড়—সোনামুখী—রসুলপুর
৬। শালতোড়া—গঙ্গাজলঘাটি
৭। বাঁকুড়া—হুরা
৮। বাঁকুড়া—খাতরা—রাণীবাঁধ—ঝিলিমিলি
৯। বাঁকুড়া—তালডাংরা—সিমলাপাল—রায়পুর—বেনাগেড়িয়া
১০। তালডাংরা—কাঁসাই
১১। রায়পুর—চন্দ্রকোণা রোড

সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সহিত রাস্তাসমূহে যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্গাপুর ব্যারাজ উন্মুক্ত হইবার পর এই বৃদ্ধি বিশেষ লক্ষণীয়। বাঁকুড়া শহর এখন যে মাত্র জিলার অধিকাংশ প্রধান প্রধান কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ-সংযুক্ত তাহা নহে; জিলার বাহিরের সহিতও ইহার যোগাযোগ সুগম ও অনায়াসসাধ্য হইয়াছে।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি

রাস্তাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটর গাড়ী ও বাস চলাচলের উপযুক্ত হওয়ায় একদিকে যেমন জিলার অভ্যন্তরে ইহাদের সাহায্যে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, অন্যদিকে আবার জিলার বাহিরে আরামবাগ, পুরুলিয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান এমন কি কলিকাতা পর্যন্ত যোগাযোগ সুগম হইয়াছে। শীত ও গ্রীষ্মে যখন নদনদী থাকে জলহীন, কাঁসাই ও শিলাই নদী অতিক্রম করিয়াও যাত্রীবাহী বাস যাতায়াত করে। বাস ও মোটর গাড়ী ছাড়াও এই সকল রাস্তায় দেখা যায় অসংখ্য মালবাহী লরী। দুর্গাপুর হইতে বাঁকুড়ার পথ এখন সহজ ও সুগম হওয়ায়, বাহির হইতে বহু মালবাহী লরী এই জিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। সাধারণতঃ রাত্রিকালেই এই শ্রেণীর মোটর-যানের চঞ্চল গমনাগমন ও সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ইহারা রাণীগঞ্জ-কয়লা-অঞ্চল হইতে কয়লা, বিহার বা উত্তর প্রদেশ হইতে ডাল, লঙ্কা, নানাবিধ মসলাপাতি এবং কলিকাতা ও ইহার শিল্পাঞ্চল হইতে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া সোনামুখী, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে এবং এমন কি মেদিনিপুর ও পুরুলিয়ায় পৌঁছাইয়া দেয়। ফিরিবার সময় ইহারা লইয়া যায় চাউল, নানাবিধ কাঠ, কাঁসার বাসন, রেশম বস্ত্র, পাট, শিমুলতুলা প্রভৃতি দ্রব্য।

পঞ্চম পর্ব

লোক পরিচয়

"মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশীর স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি!"

—রবীন্দ্রনাথ

লোক সংখ্যা ও সম্প্রদায়

জনসংখ্যার পরিচয়

বিগত ইং ১৯৬১ সালের সেনসাস্ (Census) অর্থাৎ জন গণনার রিপোর্টে জিলার লোকসংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে ১৬৬৪৫১৩ জন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে প্রতি দশ বৎসর যে লোক গণনা হইয়াছে তাহা হইতে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকাশ পাইবে :

মহকুমা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
বাঁকুড়া সদর	৭১২০৫৪	৭৪৬৯৬৪	৬৯৪৪৪২	৭৮৮৬০৮	৯৩৬৬৮১	৯৬৫৩৬৩	১১৭৪৯৭৮
বিষ্ণুপুর	৪০৪৩৫৬	৩৯১৭০৬	৩২৫৪৯৯	৩২৩১১৩	৩৫২৯৫৯	৩৫৩৮৯৬	৪৮৯৫৩৫
সর্ব মোট	১১১৬৪১০	১১৩৮৬৭০	১০১৯৯৪১	১১১১৭২১	১২৮৯৬৪০	১৩১৯২৫৯	১৬৬৪৫১৩

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সদর মহকুমার জনসংখ্যা যদিও ১৯২১ সালে হ্রাস পাইয়াছে, ইহার পর তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যার ক্রমাবনতি তো আছেই, এই সালের পরও বৃদ্ধির অনুপাত ১৯৫১ সাল পর্যন্ত নগণ্য। ইং ১৯২১ সালে সমগ্র জিলায় জনসংখ্যার যে হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ইহার একটি কারণ হইতেছে প্রথম মহাযুদ্ধ। বর্তমান অবস্থায় জিলার পরপর কয়েকটি দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব ও ১৯১৮-১৯ সালের ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ। পরবর্তী কালে দুই মহকুমার মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির যে তারতম্য দেখা যায় প্রধান কারণ হইতেছে সদর মহকুমার ম্যালেরিয়া বিবর্জিত স্বাস্থ্যকর জলবায়ু আর ম্যালেরিয়া-প্রধান বিষ্ণুপুর মহকুমার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

প্রতি বর্গমাইল হিসাবে জিলার জনসংখ্যা এইরূপ

মহকুমা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
সদর	৩৬৮	৩৮৬	৩৫৯	৪০৮	৪৮৪	৪৯৯	৬০৮
বিষ্ণুপুর	৫৬৭	৫৪৯	৪৫৬	৪৫৩	৪৯৫	৪৯৬	৬৮৬

এসম্বন্ধে দুই অঞ্চলের প্রকৃতিগত পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে ; একটি হইতেছে অনাবাদি জমি বহুল নিরাট অসমতল ভূখণ্ড, অন্যটি হইতেছে আবাদ-যোগ্য বিশাল সমতলভূমি।

প্রতি বর্গমাইল হিসাবে জনসংখ্যার এই তথ্য, সংলগ্ন বর্ধমান জিলার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে :

মহকুমা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
বর্ধমান সদর	৫৩২	৫১৬	৪৫৯	৪৮৭	৫৭৫	৬২৪	৮৯৩
কালনা	৫৮৮	৫৮২	৫৩৫	৫৬৮	৬৪৩	৭৯৩	১০৮০
কাটোয়া	৬০৬	৬২৬	৫৭২	৬৫৫	৭৩০	৭৬৭	১০৪১
আসানসোল	৫৯৬	৬২৫	৬৪৯	৭৪৪	৯৭৩	১২৩৬	১৭৬৬

শিল্পবহুল আসানসোল মহকুমার কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে লোক-বসতির পরিমাণ হিসাবে বর্ধমান বাঁকুড়া হইতে উন্নত। বাঁকুড়া সদর মহকুমায় অরণ্য, পাহাড় ও অনুর্বর উচ্চভূমি [illegible] লোকবসতির অন্তরায়, কিন্তু বিষ্ণুপুরের উর্বর সমতল ক্ষেত্রেও লোকবসতির হার বর্ধমান জিলার অধিকাংশ অঞ্চল হইতে কম।

জিলার বিভিন্ন মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌর প্রতিষ্ঠানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ এইরূপ :

পৌর প্রতিষ্ঠান	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
বাঁকুড়া	২০৭৩৭	২৩৪৫৩	২৫৪১২	৩১৭০৩	৪৬৬১৭	৪৯৩৬৯	৬২৯৩৩
বিষ্ণুপুর	১৯০৯০	২০৭৮৮	১৯৩৯৮	১৬৬৯৬	২৪৯৬১	২৩৯৮১	৩০৯৫৮
সোনামুখী	১৩৪৪৮	১৩২৭৫	১০৬৪৪	১০৯৮৯	১৪৬৬৭	১২৩৫২	১৫০২৭

ভাষা অনুসারে লোকসংখ্যা

জিলার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে বাংলাভাষাভাষীদেরই প্রাধান্য, তার পরেই স্থান সাঁওতালিভাষীদের। ভাষা অনুসারে লোকসংখ্যার পরিমাণ এইরূপ :

	বাংলা	সাঁওতালি	অন্যান্য
বাঁকুড়া সদর	১০,৩৩,৫৯০	১৩৩১২১	৮২৬২
বিষ্ণুপুর	৪,৭৪,৪৬৪	১২৫৯০	২৪৮১
জিলার মোট	১৫০৮০৫৯	১৪৫৭১১	১০৭৪৩

অর্থাৎ প্রতি শতকে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ৯০'৬০, সাঁওতালিভাষীর সংখ্যা ৮'৭৬ অন্যান্য ভাষাভাষীর ০'৬৪। অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যে আছে

হিন্দি, উর্দু, উড়িয়া, নেপালি, তেলেগু, গুরুমুখী. গুজরাটি, মাড়োয়ারী, হো ইত্যাদি। কোল ও বাইতি ভাষাভাষীও আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তেলেগু, গুরুমুখী ও গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাভাষীগণ সাধারণতঃ শহর অঞ্চলেই বাস করে। হো ও কোল ভাষাভাষীগণ গ্রাম অঞ্চলের লোক। অন্যান্য ভাষাভাষীগণ শহর, গ্রাম দুই অঞ্চলের অধিবাসী, অধিকাংশই গ্রাম অঞ্চলের।

ধর্ম ও জাতি

চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বিশ্লেষণে একটি বিস্ময়কর কাহিনী প্রত্যক্ষ করা যায়, ইহা হইল আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস হিসাবে পৃথক সত্তার লোপ। ১৯৩১ সালের লোক গণনার সময় জিলার তৎকালীন ১১৪৫৭৭ সাঁওতাল জনসংখ্যার মধ্যে ৪৭৪৯১ জন হিন্দু পরিচয়ে লিপিবদ্ধ করায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে আত্মগোপনের চেষ্টা, ইহার ধারা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় এবং ইহার ফলে দেখা যায় যে গত ১৯৬১ সালের লোক গণনায় ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিতে আদিবাসীর নাম লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহার স্থলে শ্রীধর্মী নামে এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের নামের উল্লেখ দেখা যায়। এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে সাঁওতাল। শ্রীধর্মী ধর্মের ভিত্তি হইল বৈষ্ণবজনোচিত ভক্তিবাদ। ১৯৬১ সালের গণনা অনুযায়ী জিলার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এইরূপ :

হিন্দু	১৫৪৯৩৯৯
মুসলমান	৭৩০০৭
শ্রী-ধর্মী	২৯১১৯
খৃষ্টান	২০৯০
ব্রাহ্ম	৬৪১
জৈন	১৮৬
বৌদ্ধ	১৬

হিন্দু সম্প্রদায়ই সংখ্যা গরিষ্ঠ ; ইহাতে আছে বহু জাতি, বহু ধর্ম। ইহার প্রধান বিভাগ তপশিলি ও অতপশিলি। অতপশিলিদের মধ্যে আছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, গোয়ালা, তিলি, তাঁতি, কর্মকার, কলু, কুরমি, তাম্বুলি, গন্ধ-বণিক, প্রভৃতি। তপশিলি হিন্দুর মধ্যে আছে বাগদি, বাউরি, ভুঁইয়া, ভূমিজ, ধোবা, ডোম, হাড়ী, জেলে কৈবর্ত, খয়রা, কোরা, লোহার, মাল, মুচি, নমশূদ্র, পাটনি, শুঁড়ি ইত্যাদি। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে

সিমা ও সুরি ; সুরিগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায়।

জাতিতত্ত্ব হিসাবে দেখা যায় যে বাঁকুড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের পিতৃভূমি ছোটনাগপুর অঞ্চল ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যস্থলে অবস্থিত সীমান্ত প্রদেশ। এই কারণেই জিলার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিন্যাসের তারতম্য দেখা যায়। পশ্চিম অঞ্চলে প্রাধান্য দেখা যায় সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীর বা বাউরি সম্প্রদায়ের ন্যায় অর্ধ-হিন্দু-ভাবাপন্ন প্রাক্তন আদিবাসীর, আর পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ও বাগদি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য প্রভাবান্বিত জাতির। প্রাচীনকালে পশ্চিম অঞ্চলের অরণ্য-বহুল ভূভাগের একমাত্র অধিবাসীই ছিল আদিবাসী সম্প্রদায় ; পূর্ব অঞ্চলের উন্মুক্ত ও সমতল ভূমিতে বাস করিত প্রধানতঃ মাল জাতি বা বাগদি সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও কৃষ্টি দামোদর প্রবাহ ধরিয়া পূর্বাঞ্চলেই প্রথমে অনুপ্রবেশ করে ; তদঞ্চলের রাজশক্তির পোষকতায় ইহা যে প্রভাব অর্জন করে তাহা স্থানীয় অধিবাসীর উপর প্রতিফলিত হয় ও ইহারা হইল হিন্দু ভাবাপন্ন। সমাজ ও কৃষ্টির কেন্দ্র হইতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অভিযান পশ্চিমদিকে যতই অগ্রসর হইয়াছে, তাহার প্রভাব ততই ক্ষীণ হইয়াছে। কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায় বহুযুগ যাবৎ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিয়া নিজ নিজ আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। জিলায় মোট লোকসংখ্যার ভিতর আদিবাসী উপাদান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

জাতিতত্ত্বে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল

সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মণ জাতির সংখ্যা হিন্দু পরিচয়ে লিপিবদ্ধ অন্যান্য জাতি হইতে অধিক ; জিলায় বাউরি ও সাঁওতালের সংখ্যা সর্বাধিক, তারপরই স্থান ব্রাহ্মণের। এই সম্প্রদায়ের দুইটি প্রধান শ্রেণী হইতেছে বাঙ্গালী অর্থাৎ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও উৎকল ব্রাহ্মণ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আগমণই হয় প্রথম। চতুর্থ শতাব্দীর শুশুনিয়া শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে সেই যুগেই এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দামোদর অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর সেন রাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত কয়েকটি রাজ্য। বিষ্ণুপুর রাজগণের প্রতিষ্ঠালাভের সহিত তাঁহাদের রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বিভূতি

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়

অগ্রসর হইতে থাকে, আর এই ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর। দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদের অববাহিকায় দেখা যায় ইহাদের সংখ্যা-প্রাবল্য। উৎকল ব্রাহ্মণগণের কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে তাঁহাদের আগমন হয় চোড়-গঙ্গের বিজয় অভিযানের সহিত। কিন্তু প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তাঁহারা নকুড় তুঙ্গ ও তাঁহার গুরু শ্রীপতি মহাপাত্র কর্তৃক জিলার দক্ষিণাংশ বিজয়ের পর এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। জিলার সিমলাপাল, ইঁদপুর, তালডাংরা, রায়পুর, রাণী-বাঁধ প্রভৃতি অঞ্চলে উৎকল ব্রাহ্মণের সংখ্যা-প্রাধান্য।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মূলে প্রধানতঃ মধ্যস্বত্বভোগী পর্যায়ের। অধিকাংশের আছে মল্লরাজ প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি আর চাষ হয় সাধারণতঃ ভাগ-দার মাধ্যমে। পুর্বে সাঁজা বা ধানকরারী প্রথায় চাষ হইত, জমিদারি উচ্ছেদ আইন বলবৎ করার পর হইতে তাহা লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের তুলনায় উৎকল ব্রাহ্মণ অধিকতর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। প্রধান জীবিকা কৃষি, কেহ কেহ নিজেরাই জমি চাষ করে। অনেকের ধান চাউলের ব্যবসা আছে, অনেকে আছে গ্রাম্ মহাজন। ইহাদের সম্বন্ধে কুখ্যাতি আছে যে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়কে ভূমি হইতে উৎখাত করার জন্য ইহারা প্রধানতঃ দায়ী।

তিলি, সদ্‌গোপ প্রভৃতি অন্যান্য অ-তপশিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের বংশধারা বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহাদেরও আগমন হয় জিলার বাহির হইতে। ইহাদের মধ্যে তিলি সম্প্রদায় কৃষির উপর নির্ভরশীল হইলেও, ব্যবসা ক্ষেত্রে ইহারা অনগ্রসর নহে। সদগোপ শ্রেণীর প্রধান অবলম্বন কৃষি, চাষী হিসাবে এই শ্রেণী দক্ষ বলিয়া পরিচিত কিন্তু জন প্রতি জমির পরিমাণ কম থাকায় অনেকে ভাগ-প্রথায় চাষ করে। গোয়ালা শ্রেণীর আদি উপজীবিকা গোপালন হইলেও, এখন তাহারা কৃষিজীবী ; প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর কৃষি জমি আছে। তাম্বুলি সম্প্রদায়ের মূল উপজীবিকা ছিল পান-সুপারির ব্যবসা। বর্তমানে অনেকেরই আছে ছোট বড় নানারূপ ব্যবসা, কাহারও বা আছে চাষের জমি কিন্তু নিজ হাতে চাষ সাধারণতঃ রুচিসম্মত মনে করে না। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ন্যায় কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি শ্রেণীও নিজ হাতে চাষ করে না, ইহাদের জীবিকা সংস্থানের অন্য ব্যবস্থাও আছে। ছুতার, কামার, তাঁতি, কলু, গন্ধ-বণিক সম্প্রদায় জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করে নাই। অনেকের আছে স্বল্প পরিমাণ চাষের জমি ও অন্যান্য বৃত্তি।

অন্যান্য অ-তপশিলি বা উচ্চ বর্ণীয় সম্প্রদায়

জিলার মধ্য ও পূর্বভাগে সদগোপ, তিলি, গোয়ালা প্রভৃতির এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে তাম্বুলি শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

তপশিলি নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায়

উপরে যে অ-তপশিলি সম্প্রদায়ের কথা বলা হইল, ইহারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহক এবং সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবাপন্ন। ইহাদের তুলনায়, তপশিলি বা অর্ধ-হিন্দু সম্প্রদায়—যাহাদের সাধারণতঃ বলা হয় হিন্দু নিম্ন শ্রেণী—সংখ্যায় কম হইলেও নগণ্য নহে। তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতেছে বাউরি, বাগদি, খয়রা, লোহার, শুঁড়ি। এগুলি ভিন্ন আছে ভূমিজ, ডোম, কোরা, মাল, ভুঁইয়া; সংখ্যায় ইহারা আরও কম, কয়েকটি বা ক্ষয়িষ্ণু। দেখা যায় যে গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের জনবৃদ্ধির তুলনায়, তপশিলি বা নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে কম, কোন কোন শ্রেণীর আবার সংখ্যার ক্রমাবনতি হইয়াছে। সমগ্র বর্ণ হিন্দু বা উচ্চবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে প্রতি শতকে প্রায় ৬৮ জন, আর সেই তুলনায় তপশিলি সম্প্রদায়ের মোট বৃদ্ধি হইয়াছে প্রতি শতকে প্রায় ৪৪ জন। এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি শ্রেণীর সংখ্যা সম্বন্ধে এক তুলনামূলক চিত্র আকর্ষণীয় হইতে পারে:

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
বাগদি	৯০৮৬৮	৯৫৪৮১	৫৫০৭৭	৮৯৬৬২	৫৫০৬৭	৮৭৬০২	৯৩৪৭৬
বাউরি	১১৩৩২৪	১১১৩১৩	৯৫৮৫১	১১৯৩৫০	১৩০১৯৮	১৩২৮৮১	১৫২৭৪৪
লোহার	৪৫৯৫০	২৫০৫৯	২১৬৮৬	২৫৪৩৩	২৮৫৬৩	২৮৩১৪	৩৯০৬৯
মাল	১৪৯৬৪	১১৯৬২	১১২১২	১২৭৪৫	১৫১৯৬	১৪০৫৯	১৬৫০৮
ভূমিজ	১৯৭৮৪	১৯৭৫৭	১৬২৭০	১৮১০৬	১৭৬১৬	১৫৫৮৩	৭৬৯৫
ডোম	১৭৫২০	১৭১৩২	১৩৬৭৬	১৩৯১৫	১২৯০৬	১২৫৫৬	১৫৪২২
হাড়ী	৭৮৬২	৭৩৩৯	৬৩৯৫	৬৮৫০	৭২৮৮	৭৭০৯	৮০৫৮
ভুঁইয়া	৩৬৩৪	৩৭২৪	৩০৮৪	৪১৪৮	৪৩৫৭	৪৬৫২	৪১৪১

ইহার তুলনায় আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষণীয়

১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
১০৫৬৮২	১১৫০১৭	১০৪৯১২	১১৪৫৭৭	১১৮৪৭৬	১৩৭৬৫৩	১৫২২৫৪

ভূমিজ সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া এক উদ্বেগজনক অবস্থায় আসিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ১৯৫১ সালের গণনায় যাহা লিপিবদ্ধ হয়, পরবর্তী দশ বৎসরে তাহার অর্ধভাগ হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি তপশিলি সম্প্রদায়ের সংখ্যায়

ক্রমাবনতি দেখা যায় বটে কিন্তু ভূমিজ সম্প্রদায়ের ন্যায় পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। দারিদ্র্য, ব্যাধি, অর্থ নৈতিক অবনতি মাত্র ভূমিজকে নহে যাবতীয় নিম্নশ্রেণীর তপশিলি সম্প্রদায়কে, বিশেষতঃ যাহারা ভূমির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল, নিস্তেজ, দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে। শুঁড়ি সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে, তপশিলি সম্প্রদায় হয় ভূমিহীন কৃষক রূপে, না হয় ভাগদার বা নগণ্য কৃষি-জমির অধিকারী হিসাবে, অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে। কেহ কেহ বা দিন-মজুর। উদরান্নের জন্য ইহাদের অনেকে সাময়িক ভাবে দেশত্যাগ করে। শুঁড়ি সম্প্রদায়ের নিকট কৃষি সেইরূপ আকর্ষণীয় নহে, যেমন আকর্ষণীয় কুলাচরিত ব্যবসা অথবা ছোট কারবার।

কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর কথা
বাগদি

পূর্বে বলা হইয়াছে যে জিলায় ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটি হইল বাগদি। এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে লৌকিক বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি হইল যে তাহারা শিব-পার্বতীর সন্তান ও তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল কুচ-বিহার। শিব যখন কোচ রমণীর প্রণয়াবদ্ধ, ঈর্ষাপরায়ণা পার্বতী জেলেনির বেশে আসিয়া কোচদের শস্য বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। শিব তাঁহাকে যখন কিছুতেই প্রত্যাগমনে রাজী করাইতে পারিলেন না, তাঁহার সহিত এক সর্তে আবদ্ধ হইলেন—পার্বতীর গর্ভে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিবেন। ইহাতে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয়, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। ইহারা পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং ইহাদের সন্তান হইল বীর হাম্বীর। বীর হাম্বীরের চার কন্যা, সন্তু, নেতু, মনটু ও ক্ষেতু হইতে বাগদি সম্প্রদায়ের চার শ্রেণী তেঁতুলে, দুলে, কুশমেটে ও মেটে উৎপত্তি হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বাগদি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে মনীষীদের যে ধারণা তাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে; প্রচলিত কাহিনী এই আত্মবিস্মৃত প্রাচীন আর্যেতর জাতির ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির গণ্ডির ভিতর প্রবেশের প্রয়াসই নির্দেশ করে।

দেখা যায় যে এই জিলায় বাগ্দি সম্প্রদায়ের মূল আকৃতি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে। ইহাদের মধ্যে আছে নয়টি বিভিন্ন শ্রেণী; তেঁতুলে, কাঁসাই-কুলে, দুলে, ওঝা, মেছো, গুলি মাঝি, দাণ্ডা মাঝি, কুশমেটে, মাল মেটে বা মেটে। তেঁতুলে নামের উৎপত্তি তেঁতুল গাছ হইতে, কাঁসাই কুলের কাঁসাই নদী হইতে। ডুলি বহন হইতে হইয়াছে দুলে, মাছ হইতে মেছো,

আর মাটি হইতে মেটে। ওঝা নাম পাইয়াছে সম্ভবতঃ ইহাদের আদি পুরোহিত সম্প্রদায়। আবার উপশ্রেণী আছে যেমন, কাসবা, পঁকরিসি, শালরিসি, পত্রিসি, কচ্ছপ। প্রথম চারটির অর্থ যথাক্রমে বক, বুনো মোরগ, শালমাছ, সিম। কোন বাগদি নিজ শ্রেণীর বাহিরে বা উপশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করে না। যেমন, তেঁতুলে বাগদি তেঁতুলে শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহ করিবে কিন্তু শালরিসি উপশ্রেণীর কেহ এই উপশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করিবে না। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধিসমূহ গ্রহণ করিলেও প্রাচীন বহু আচার ব্যবহার ইহারা এখনও রক্ষা করিয়া আছে। বাগদি সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত।

বাগদিগণ শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সহিত ধর্ম ঠাকুরেরও পূজা করে। আবার আদিবাসী দেবতা গোঁসাই-এরা ও বড় পাহাড়িও ইহাদের উপাস্য। কিন্তু প্রধান উপাস্য দেবতা হইতেছেন মনসা দেবী। মনসার পূজা মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের ৫ ও ২০ তারিখ এই দেবীর উদ্দেশ্যে চাউল, মিষ্টদ্রব্য, ফুল, ফল নিবেদন করা হয়, ছাগ, মেষ উৎসর্গও হয়। নাগ পঞ্চমীর দিন দেবীর সুসজ্জিত মূর্তি লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় ও অবশেষে কোন জলাশয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন হয়। ভাদু পূজায়ও বাগদিদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। এইসব পূজা অনুষ্ঠানে যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হয় তিনি পতিত ব্রাহ্মণ।

বাউরি

বাউরি সম্প্রদায়ের কোন ঐতিহ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু এই সম্প্রদায় জিলার যে অতি প্রাচীন অধিবাসী তাহাতে সন্দেহ নাই। বাগদিদের ন্যায় ইহারাও মনসা, ভাদু, ধর্মরাজ ও বড় পাহাড়ির পূজা করে ; ইহাদের সহিত পূজিত হন মানসিং ও কুদ্রাসিনি। ভাদু পূজা বাউরি সমাজে এক বিশেষ উৎসব। এই উৎসব কয়েকদিন ধরিয়া চলে ও এই সময় গ্রামের স্ত্রীলোকগণ ও বালকবালিকা ভাদুর প্রতিমূর্তির সম্মুখে দিনের পর দিন ধরিয়া গান গায় ও প্রতিমূর্তিকে ফুলে সুসজ্জিত করে। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন এই পূজার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাদু পূজার উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ; পূজার উদ্ভব পুরুলিয়া জিলার পঞ্চকোটে। ভাদু ছিলেন পঞ্চকোটের রাজকন্যা ও বিশেষ দয়াবতী। বাউরি সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যই তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে। সেই অবধি তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পূজা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

বাউরি সম্প্রদায় নয় শ্রেণীতে বিভক্ত—মল্লভূমিয়া, শিখরিয়া বা গোবরিয়া, পঞ্চকোটি, মোলা বা মুলো, ধুলিয়া বা ধুলো, মালুয়া বা মলুয়া, ঝাটিয়া বা ঝেটিয়া, কাঠুরিয়া, পাথুরিয়া। নামগুলির কয়েকটি মনে হয় বিভিন্ন শ্রেণীর আদি বাসস্থান জ্ঞাপক, যেমন মল্লভূম হইতে মল্লভূমিয়া, শিখরভূম হইতে শিখরিয়া, ধলভূম হইতে ধুলিয়া, পঞ্চকোট হইতে পঞ্চকোটি। মোলা বা মলুয়া ও মল্লভূমে উৎপত্তি নির্দেশ করে। আবার গোবর দিয়া খাদ্যাবশেষ পরিষ্কার করার প্রথা হইতে নাম হইয়াছে গোবরিয়া; খাদ্যাবশেষ মাত্র ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করার প্রথা হইতে ঝাটিয়া নামের উৎপত্তি। বাউরিদের নিকট লালপৃষ্ঠ বক ও কুকুর পবিত্র। ঘোড়ার মল ইহারা স্পর্শ করে না। বক বাউরি জাতির চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ ইহা মারিলে সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে। কুকুর হত্যা বা মৃত কুকুর স্পর্শ করা তাহাদের সমাজে নিষিদ্ধ। বাউরি জাতির এক বৈশিষ্ট্য এই যে উচ্চতর জাতির কোন লোক যদি ইহাদের সমাজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাকে গ্রহণ করা হয়। নারী ঘটিত বিষয়েও ইহারা উদারমনা। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। খাদ্য সম্বন্ধে কোন বাছবিচার ইহাদের নাই বলিলেই চলে। বাউরিদের কোন ব্রাহ্মণ নাই, পূজাদির অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হয় তাহাদেরই স্বশ্রেণী লায়া বা দেঘরিয়া।

ডোম

পশ্চিম বাংলায় যখন বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব প্রবল, তখন সমাজে ডোম সম্প্রদায়ের এক বিশেষ স্থান ছিল। ধর্ম-কার্য, গীতবাদ্য অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে তাহারা ছিল অপরিহার্য। ধর্ম ঠাকুরের সহিত ডোম সম্প্রদায়ের এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং কেহ কেহ মনে করেন যে ধর্মঠাকুর আদিতে ছিলেন ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। ধর্মঠাকুরের পূজায় ডোম পণ্ডিত এখনও অপরিহার্য অঙ্গ। শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিত জাতিতে ডোম ছিলেন। সামরিক বিষয়েও ইহারা ছিল বিশেষ দক্ষ, মল্লরাজগণের ডোম বাহিনীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মল্লরাজগণের ন্যায় অন্যান্য স্বাধীন সামন্ত রাজগণ ও ডোম সৈন্য নিয়োগ করিতেন। ধর্মমঙ্গলে কালু ডোম ও তাহার স্ত্রী লখাই ডোমনির কাহিনী ডোম জাতির বীরত্বের স্মৃতি বহন করিয়া আনিতেছে। বর্তমান সমাজে ডোম পতিত, নিকৃষ্ট জাতি।

ডোম সম্প্রদায়ের ন্যায় হাড়ীও তন্ত্রযুগে সমাজের এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। বাংলায় প্রচলিত ঐন্দ্রজালিক তন্ত্র চণ্ডী দেবীকে "হাড়ীর ঝি" নামে অভিহিত করে। ইহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। ডোমের ন্যায় হাড়ীও বর্তমান

সমাজের এক নিকৃষ্ট পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সৈন্য বাহিনীতে ইহারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় দেখা যায় যে জমিদারের পদাতিক বাহিনীর এক প্রধান উপাদান ছিল এই সম্প্রদায়। তারপর পাইক, নগদি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হইয়া ইহারা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্যে সহায়তা করিত। পরবর্তীকালে গ্রামে চৌকিদারের কার্যে নিযুক্ত হইয়া এই সম্প্রদায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

হাড়ী

রিস্‌লি[১] সাহেবের মতে ভূমিজ সম্প্রদায় ও ছোট নাগপুরের মুণ্ডাগণ আদিতে একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। মুণ্ডা সম্প্রদায়েরই এক শাখা পূর্বদিকে প্রসারিত হয় এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া মূল গোষ্ঠী হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ইহারা মূল মুণ্ডারি ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে; আদিবাসী প্রকল্পিত দেবদেবী ভিন্নও ইহারা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর উপাসনা করে। এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আবার ভুঁইহার নামে পরিচয় দিয়া নিজেদের রাজপুত বংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অবস্থাপন্ন ভূমিজগণ ব্রাহ্মণ্য দেবী কালী বা মহামায়ার পূজা করে, আর পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে। সাধারণে পূজা করে জাহির বুরু ও বিভিন্ন গ্রাম দেবতার আর এই পূজায় উৎসর্গ করা হয় চাউল, ঘি, ছাগ ও মোরগ। পুরোহিতের পরিচয় লায়া নামে। রিস্‌লি সাহেব বলেন যে ভূমিজ সম্প্রদায় সূর্য দেবতাকেও পূজা করে সিং বোঙ্গা ও ধরম নামে কিন্তু এই উপাসনা বাঁকুড়া জিলার ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

ভূমিজ

হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভূমিজ সম্প্রদায়ের চিরাচরিত আচার ও ধর্মজীবনে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। পর্বত দেব মারাং বুরু এক সময় ভূমিজদের একজন প্রধান দেবতা ছিলেন, বর্তমানে এই দেবতার পূজার প্রচলন দেখা যায় না। ভাদ্র আশ্বিনে করম গাছকে উপলক্ষ করিয়া যে সমারোহ হইত, তাহা এখন কর্ম পূজায় পরিণত হইয়াছে; সেইরূপ ইন্দ পরবের সহিত ইন্দ্র পূজা আর ছাতা পরবের সহিত চৈত পরব মিশিয়া গিয়াছে। ইন্দ পরবের অনুষ্ঠান এখনও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশের শারদীয়া পূজার সহিত জড়িত আছে।

জিলায় লোহার সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার ২.২ ভাগ। সাধারণতঃ

(১) **H. A. Risley "Tribes and Castes of Bengal"**

সিমলাপাল, রায়পুর, বিষ্ণুপুর, ওঁদা, পাত্রসায়র, জয়পুর অঞ্চলেই ইহাদের বসবাস। আদিতে এই সম্প্রদায়ের বৃত্তি ছিল লৌহ সম্বন্ধীয়—লৌহ গলাইয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত ইত্যাদি। বর্তমানে লৌহ শিল্প ইহাদের হস্তচ্যুত। এখন ইহারা হয় ভূমিহীন কৃষক না হয় ক্ষেত মজুর বা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে কারিগরের কাজে নিযুক্ত।

লোহার

সংখ্যা হিসাবে খয়রা প্রায় লোহারের সমতুল্য। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, ওঁদা, ইঁদপুর, তালডাংরা, জয়পুর থানায়ই ইহাদের প্রধান বসতি। আদি বৃত্তি শীকার ও বন কাটিয়া চাষাবাদ হইলেও ইহারা বর্তমানে ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক পর্যায়ের। রিসলি সাহেবের মতে খয়রা ছিল আদিতে বাগ্দি সম্প্রদায়ের একটি নিম্ন শ্রেণী এবং কোরাদের সমগোত্রীয়।

খয়রা

জিলায় শুঁড়ির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২.৭ ভাগ। বাঁকুড়া, খাতরা, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি, শালতোড়া, রায়পুর থানায় এই সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য। ইহাদের আদি বৃত্তি সুরা বা মদ প্রস্তুত ও বিক্রয়। বর্তমানে অনেকে দেশী মদ বা হাড়িয়া কিম্বা পচাই দোকান পরিচালনা করিলেও ছোট-বড় ব্যবসার দিকে আকৃষ্ট। কাহারও চাষের জমি আছে।

শুঁড়ি

জিলার আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে কোরা ও সাঁওতাল।

আদিবাসী

১৯৬১ সালের লোক গণনায় ইহাদের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যথাক্রমে ৮১২২ ও ১৫২২৫৪। রিস্লি সাহেবের মতে কোরাগণ দ্রবিড় গোষ্ঠীয় মুণ্ডা সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। আদি বৃত্তি ছিল মাটি কাটা ও চাষ। ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে তাহাদের এই জিলায় আগমন হয় সুদূর অতীতে। মধ্যযুগীয় ঘাটোয়ালী প্রথা এই সম্প্রদায়ের অনেককে নিযুক্ত করিত আর ইহার জন্য বরাদ্দ ছিল বহু জমি। বর্তমানে ইহাদের প্রধান জীবিকা—ছোট চাষী, ভাগদার বা ক্ষেত মজুর হিসাবে। খাতরা, শালতোড়া, রাণীবাঁধ, রায়পুর অঞ্চলেই ইহাদের বসতি।

কোরা

সাঁওতালদের কথা পর অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

সাঁওতাল

বাঁকুড়ায় সাঁওতাল

জিলার আদিবাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য হইল সাঁওতালের। এক সময় পশ্চিম ভূভাগের প্রায় সমগ্র পল্লী অঞ্চলেই ছিল ইহাদের প্রাধান্য এবং ইহার স্মারকস্বরূপ এখন বর্তমান তামশোল, দেবাশোল, কেলেশোল, অর্জুনপাড়া, অমৃতপাল, সিমলাপাল প্রভৃতি স্থান। এই সব অঞ্চল এখন তাহাদের হস্তচ্যুত। এমন কি সাঁওতালপ্রধান শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসমা পরগনায়ও বর্তমানে কোন সাঁওতাল "মণ্ডল" আছে কিনা সন্দেহ। বহু সাঁওতাল কৃষিজমি হারাইয়াছে; সাঁওতালপ্রধান পল্লী হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে যদিও খাদ্যাভাব ও কয়েকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে বহু সংখ্যক সাঁওতাল দেশত্যাগ করিতে অথবা নিজ জমিজমা মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহার অধীনে অধস্তন প্রজা বা ভাগদার হিসাবে থাকিতে বাধ্য হয়, বহিরাগত কূটবুদ্ধি সম্পন্ন সভ্য সমাজের প্রতিযোগিতার সংঘাতে তাহারা পরাজিত ও পিষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে শালতোড়া, ছাতনা, খাতরা, রায়পুর, সিমলাপাল ও তালডাংরা থানায়ই তাহাদের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়।

ক্ষীয়মান সাঁওতাল প্রাধান্য

অনেকে মনে করেন যে আদিতে সাঁওতাল ছিল এক ভ্রাম্যমান জাতি। অরণ্যে শীকার, ইহার কিছু অংশ আবাদোপযোগী করিয়া কয়েক বৎসর চাষের পর নূতন ভূমির অনুসন্ধানে স্থান পরিবর্তন, ইহাই ছিল ইহাদের প্রকৃতি। যাহা হউক, দেখা যায় যে পুর্বে সাঁওতালপ্রধান অঞ্চলে ছিল এক পরিপুর্ণ গ্রাম্য-সমাজ বিদ্যমান। সমাজের প্রধান ছিল মণ্ডল বা মাঝি। জমির খাজনা প্রভৃতি এই মাঝির মাধ্যমেই দেওয়া হইত, আর বলিতে গেলে পল্লী-জমির মালিকই ছিল মাঝি। মাঝি আবার ধর্ম-কর্মও পরিচালনা করিত। সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ক কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তাহার জন্য মাঝির থাকিত তিনজন সহকর্মী; জগমাঝি, পরামানিক, ও কোটাল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল তাহাদের উপর। আবার যুবকদের সদুপদেশ দিয়া ঠিক পথে চালনা

সাঁওতালদের আদি কথা

মণ্ডলী প্রথা

করা, দুঃস্থ ও শোকার্তদের সান্ত্বনা দান, গ্রামের মঙ্গল রক্ষা, এই সবও ছিল তাহাদের করণীয়। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি লইয়া গঠিত ছিল পরগনা; ইহার প্রভু ছিল পরগনায়েত বা পরগনা-রাজ। গ্রাম মণ্ডল বা মাঝির বিচারের বিরুদ্ধে আপিল চলিত পরগনায়েতের নিকট। প্রতি বৎসর শীকার উৎসবের সময় পরগনায়েতের দরবার বসিত। পরগনায়েতের উপর ছিল সদর মহারাজা, শেষ আপিল চলিত তাহার নিকট। এই সব বিচারে যে শাস্তি বিধান প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল জরিমানারূপে; জরিমানা বাবদ অর্থাদি পানভোজনে ব্যয়িত হইত। কিছুকাল পূর্বেও কোন সাঁওতাল অন্য কোন সাঁওতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া আদালতে আসিত না।

মণ্ডলী প্রথার অবনতি

কালক্রমে এই মণ্ডলী প্রথা শ্লথ হইয়া যায়, বর্তমানে ইহা নাই বলিলেই হয়; মণ্ডল বা পরগনায়েতের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এখনও কাহাকে জাতিচ্যুত বা সমাজচ্যুত করিতে হইলে মণ্ডল বা পরগনায়েতের প্রয়োজন হয়। সাঁওতালদের মধ্যে আছে বারটি শ্রেণী, একই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এক পত্নী বর্তমানে অন্য পত্নী গ্রহণও নিষিদ্ধ। এই সকল প্রথার ব্যতিক্রম হইলে সমাজ শাসনের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। সেইরূপ, দেখা যায় যে কোন যুবতী শ্বশুরালয় হইতে পলায়ন করিয়া পিত্রালয়ে আসিল। সে যদি এই অপরাধ একাধিকবার করে তবে সমাজ শাসনের প্রয়োজন হয়। এই সব ক্ষেত্রে মণ্ডলের বিচার আবশ্যক হইয়া পড়ে। বর্তমানে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মণ্ডলের বিচার অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষুব্ধ পক্ষ আদালতের শরণাপন্ন হয়।

অবনতির কারণ

মণ্ডলী প্রথার অবসানের সহিত সাঁওতাল জীবনের অর্থনৈতিক অবনতির কাহিনী জড়িত আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে বহু গ্রামাঞ্চল সাঁওতাল প্রাধান্য হারায় অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বহিরাগতদের এই অঞ্চলে প্রবেশের পর। ইহাদের

বহিরাগত অ-সাঁওতাল বা "দিকু"

কেহ কেহ জমিদার ও মণ্ডলের মধ্যস্থলে মধ্য-স্বত্বাধিকারী হিসাবে জমি বন্দোবস্ত লইয়া প্রবেশ করে ও ক্রমে ক্রমে মণ্ডলকে হস্তগত করিয়া গ্রামের দেয় খাজনা বৃদ্ধি করে। বহু সাঁওতাল বৃদ্ধি খাজনা দিতে অপারগ হয় ও কৃষি-জমি হস্তান্তর করিতে বাধ্য হয়। আবার বহু বহিরাগত আসে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও মহাজন রূপে। অজন্মা বৎসরে ইহারা সাঁওতাল চাষীকে টাকা ধার দেয়

চক্রবৃদ্ধি সুদে। স্বভাবতই সাঁওতাল এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না, সুতরাং মহাজনকে জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত। এই সব ছাড়াও সাঁওতালের জমি হস্তগত করার উদ্দেশ্যে বহু কবলা, বন্ধকী দলিল প্রভৃতিতে এমন সব চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হইত যাহা ছিল সাঁওতালের পক্ষে বিপজ্জনক; কিন্তু সাঁওতাল ইহার কিছুই বুঝিত না, না বুঝিয়া দলিল সম্পাদন করিত। চুক্তি খেলাপের দায়ে আদালতের ডিক্রি লইয়া জমিজমা হস্তগত করা মহাজনের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইত না। জমিজমা হস্তগত করিয়া মহাজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট জমি অতিরিক্ত খাজনায় পুরাতন সাঁওতাল প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিত; কখনও বা এই বন্দোবস্ত হইত ধান করারী জমায়। উৎকৃষ্ট জমি মহাজন নিজ চাষে রাখিত। সাঁওতালের অর্থনৈতিক দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।

সাঁওতাল সংরক্ষার্থে বিশেষ বিধান

এই অবস্থার প্রতিকল্পে ইং ১৮৭২ সালে কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে বিশেষ বিধান প্রবর্তন আবশ্যক। কিন্তু ইং ১৯০৯ সালের পুর্বে এ বিষয়ে কোন বিশেষ দৃষ্টিপাত হয় না। এই বৎসর বীরভূম, মেদিনিপুর ও বাঁকুড়া জিলার সাঁওতালদের অবস্থা প্রনিধান ও কি উপায়ে ইহার উন্নতি হইতে পারে তাহা বিবেচনার জন্য ইংরেজ সরকার ম্যাকআলপিন নামে একজন সিভিলিয়ান সাহেবকে নিযুক্ত করেন। বিশেষ তদন্ত করিয়া তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহার ভিত্তিতে ইং ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে সাঁওতালের জমি হস্তান্তর সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। যে জমি সাঁওতালের অধিকারে তখন ছিল তাহার সম্বন্ধে এই সব বিধিনিষেধ একরূপ মঙ্গলদায়ক হয় বলা যাইতে পারে কিন্তু ইহাতে তাহাদের অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয় নাই। এ কথা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে অবস্থা গতিকে সাঁওতাল নিঃস্ব; অজন্মার বৎসরে তাহার এমন কিছু থাকে না যাহার উপর সে নির্ভর করিতে পারে। জীবন ধারণের জন্য খাদ্য আর চাষের জন্য বীজধান তাহার একান্ত প্রয়োজন। জমি হস্তান্তরের বিধিনিষেধের ফলে ঋণগ্রহণের পক্ষে তাহার জমির কোন মূল্য নাই। সুতরাং দেখা যায় যে যদিও সাঁওতাল সাধারণতঃ নিজগৃহের উপর বিশেষ অনুরক্ত, অনেকে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছে, অবার অনেকে সাময়িকভাবে প্রতিবৎসর বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়।

ইং ১৯০৮ সালের জিলা গেজেটিয়ারে সাঁওতাল চরিত্র এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে ঃ "বাঁকুড়ার সাঁওতালদের চরিত্র এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। বহিরাগতদের প্রভাব হইতে সাঁওতাল যতদিন দূরে ছিল, সে ছিল অরণ্যের সাহসী কিন্তু লাজুক সন্তান। সে ছিল সৎ, সত্যবাদী, পরিশ্রমী। কিন্তু বহিরাগতগণ তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে, প্রবঞ্চনা ও চুরি করিতে শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু এখনও দেখা যায় যে যখন হিন্দু পল্লীতে কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি রাত্রিকালে অতি সাবধানে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়—অন্যথা সেগুলি অপহৃত হইবার আশঙ্কা থাকে—সাঁওতাল পল্লীতে সেগুলি অসাবধানে পড়িয়া থাকে, কারণ, সাঁওতাল জানে যে কোন প্রতিবেশী সাঁওতাল তাহা স্পর্শ করিবে না। আবার রাত্রিকালে যাহাতে কেহ শস্য অপহরণ না করে সেইজন্য হিন্দু পল্লীতে শস্য-রক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু এই বিষয়ে সাঁওতালের কোন দুশ্চিন্তা নাই; তাহার একমাত্র চিন্তা থাকে কোন বন্যজন্তু শস্য নষ্ট না করে।" আদিম সাঁওতাল চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু ইহার কয়েকটি এখনও লক্ষ্য করা যায়। চাষী হিসাবে সে হিন্দু বা মুসলমান কৃষকের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় ধান বা অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করিতে অপারগ হইতে পারে কিন্তু উচ্চ ভূমি বা নিকৃষ্ট প্রকৃতির জমি চাষ আবাদ করিতে অথবা অনাবাদি জমি আবাদযোগ্য-জমিতে রূপান্তর করিতে সে অদ্বিতীয়। সে আবার শস্য বিনষ্টকারী বন্যজন্তুর শত্রু। এইসব কারণে তাহার ধানজমির পরিমাণ কম থাকিলেও সাধারণ কৃষক যে-শ্রেণীর জমি আবাদ করিতে সাহস পায় না, সেখানে সে ভুট্টা, কোদো অথবা তিল জন্মাইয়া নেহাত অজন্মা না হইলে একরূপ ভাল ভাবেই কাটায়। অনেক সাঁওতালের আবার তাঁত আছে।

সাঁওতাল চরিত্র

সাঁওতাল ছোট একখণ্ড বস্ত্রে সন্তুষ্ট, কিন্তু সাঁওতাল রমণীর প্রয়োজন হয় দশ হাত শাড়ী; এই শাড়ী পড়া হয় মনোরম ছাঁদে, হিন্দু গৃহস্থের মেয়েদের ন্যায় মাথায় শাড়ীর কোন অংশ দেওয়া হয় না কিন্তু পিঠের দিকে ভাজ করিয়া রাখা হয়। ফুল সাঁওতাল রমণীর অতি প্রিয়, সে ফুলে মাথার খোপা সুসজ্জিত করিয়া ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে কখনই কার্পণ্য করে না। এখন পর্যন্তও সাঁওতাল যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল ও অল্পেই সন্তুষ্ট। সংসারে যাহা প্রয়োজন যেমন তামাক, তেল, লঙ্কা, শাকসব্জি প্রভৃতি সে নিজের যে স্বল্প পরিমাণ জমি থাকে তাহা হইতেই

সাধারণ জীবন

উৎপাদন করে ; ছাগ, মোরগ প্রতিপালন করিয়া অর্থ উপার্জনের সংস্থান করে। আবগারী দোকানে হাড়িয়া কিনিয়া খাওয়া অপেক্ষা নিজগৃহে চোলাই করা পছন্দ করে। দিনে এক বেলা আমানি খাইয়া উদরপুরণ সাঁওতালদের মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা। আর্থিক বা খাদ্যশস্যের ঘাটতি পুরণের জন্য প্রতিবৎসর বহু সাঁওতাল নিজ জমিতে কৃষিকার্য শেষ করিয়া বর্ধমান বা হুগলি জিলায় যায় ধান রোপণ বা ধান কাটার সময় ; কাজ শেষ করিয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসে। দেশে যদি অজন্মা বা অন্য কোন কারণে দারুন খাদ্যাভাব দেখা দেয়, দলে দলে সাঁওতাল কয়লাখনি ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে মজুর খাটিতে যায়। বহু ভূমিহীন সাঁওতাল আবার শ্রমিক পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেক সাঁওতাল পল্লীতে দেখা যাইবে যে কয়েকটি শালগাছের সমষ্টি লইয়া একটি স্থান সযত্নে রক্ষিত। এই শালগাছ কাটিবার অধিকার কাহারও নাই। স্থানটির নাম হইতেছে জাহির,

ধর্মবিশ্বাস

সাঁওতালের নিকট অতি পবিত্র, কারণ, গ্রাম-দেবতা এখানে বাস করেন। জাহির স্থানে দেবতার উদ্দেশ্যে চাউল ছড়াইয়া দেওয়া হয়, ছাগ বা মোরগও বলি দেওয়া হয়। বলির পশু মাংস সাঁওতাল বন্ধু-বান্ধব সহ মহা সমারোহে গ্রহণ করে আর এই উৎসবে নৃত্যগীত, হাড়িয়া পান হয় অপরিহার্য। গ্রাম দেবতার সহিত গৃহ দেবতার পুজানুষ্ঠানও প্রচলিত আছে এবং এই ক্ষেত্রেও দেওয়া হয় মোরগ অথবা ছাগ বলি। ডাইনি বিদ্যা ও জান বা ওঝার উপর সাঁওতাল এখনও বিশ্বাসী। কিছুকাল পুর্বেও যদি কোন রাগ বা দুর্ঘটনা ঘটিত সাঁওতাল যাইত গ্রাম-কবিরাজের নিকট ইহার কারণ নির্ধারণের জন্য অর্থাৎ এই রোগ বা দুর্ঘটনা স্বাভাবিক কারণে ঘটিয়াছে না ইহার পিছনে আছে কোন ডাইনি। শালপাতার সাহায্যে গণনা করিয়া কবিরাজ যদি সাব্যস্ত করিত যে ইহা ডাইনির কাজ, সাঁওতাল ছুটিত জান বা ওঝার নিকট। জানও শালপাতার সাহায্যে গণনা করিয়া এই ডাইনির পরিচয় বাহির করিত। সাঁওতাল সমাজে জানের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, কারণ, তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাহার ভিতর দিয়া ভূত প্রেত বা দেবতা কথা বলে। জানের এই প্রতিপত্তি এখনও আছে।

পুর্বে যখন অরণ্যের প্রাচুর্য ছিল, বসন্ত ঋতু ছিল সাঁওতাল জীবনের বিশেষ উৎসব কাল। শাল জঙ্গল হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে আসিতেছে নূতন পাতা ; মহুয়া গাছে ধরিয়াছে নূতন ফুল ; বৃক্ষশ্রেণীর

তলদেশে লতাগুল্ম শুকাইয়াছে ; অরণ্যের মধ্য দিয়া যাতায়াত সুখকর। এই হইল শিকার উৎসবের প্রকৃষ্ট সময়।

জীবনধারার পরিবর্তন

শিকার চলিত দলবদ্ধভাবে দিনের পর দিন। শিকারের সহিত থাকিত হাড়িয়া ও প্রিয় মহুয়া। তখন অরণ্য ছিল গভীর, জীবজন্তুও ছিল প্রচুর। জ্যোৎস্না রাত্রে শাল জঙ্গলের কোলে মাদল বাজিত, মাদলের তালে তালে নৃত্য করিত যুবক-যুবতীর সারি ; বাঁশীর সুরে সুর মিলাইয়া তাহারা গান ধরিত। এখন অরণ্য বিলুপ্ত প্রায়, শিকারের উপযোগী জীবজন্তুর সংখ্যাও কম। তবুও প্রথামত বাৎসরিক শিকারের আয়োজন হয়, উৎসবও চলে, কিন্তু আদিম প্রাণশক্তির প্রাচুর্য নাই। সাধারণ উৎসবে মাদল ও বাঁশির সহিত নৃত্যগীত যদিও এখন পর্যন্ত সাঁওতাল জীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া আছে, ইহা জনপ্রিয়তা হারাইতেছে ; শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক যুবতীর নিকট বর্জনীয়। জনপ্রিয় মোরগ লড়াই সাধারণ সাঁওতাল শ্রেণীর আমোদ প্রমোদের ধারা বহন করিয়া এখনও বর্তমান আছে এবং কোন সাঁওতাল পল্লীর পার্শ্ব দিয়া চলিবার সময় দেখা যায় যে বৃত্তাকারে লোক দাঁড়াইয়া আছে, বৃত্তের মধ্যে চলিতেছে মোরগের লড়াই।

বহির্জগতের সংস্পর্শ সাঁওতালের আদিম, সহজ ও সরল জীবনে পরিবর্তন আনিয়াছে। নিজস্ব চিরাচরিত আচার ব্যবহার ধর্মকর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্ত্বেও বহু সাঁওতাল খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। রায়পুর থানার সারেঙ্গা খৃষ্টান সাঁওতালদের এক প্রধান কেন্দ্র। খৃষ্টান মিশনরীগণের প্রচেষ্টায় সাঁওতালি ভাষা লিখিত রূপ পাইয়াছে। শিক্ষার সম্প্রসার হইতেছে, ইহার সহিত পরিবর্তিত হইতেছে পুরাতন ভাবধারা। সাঁওতাল এখন আর অরণ্য দেবীর সরল, লাজুক সন্তান নহে।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ড্যানিয়েল উইলিয়ম হারমন (D. W. Harmon) নামে একজন কানাডাবাসী সাহেব আমেরিকার ইণ্ডিয়ান (Indian) জাতি সম্বন্ধে একটি রচনা প্রকাশ করেন, নাম Sixteen years in the Indian country অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানদের দেশে ষোল বৎসর। ইহাতে তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে উপজাতীয়দের মধ্যে বর্তমান সভ্যতার ভাবধারার প্রসার মঙ্গলদায়ক কি-না। তিনি বলিয়াছেন "সভ্যজগতের সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের চরিত্র বা অবস্থা উন্নত হইয়াছে কি-না সে সম্বন্ধে আমি সন্দেহ পোষণ করি। অসভ্য অবস্থায় অনায়াসলব্ধ বস্তুতেই ইহারা সন্তুষ্ট থাকিত ; কিন্তু বর্তমানে

আমরা ইহাদের মধ্যে যে সকল শৌখীনতার আমদানি করিয়াছি তাহাতে ইহাদের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে বহু কৃত্রিম অভাবের। এই সকল শৌখীন দ্রব্য সংগ্রহ করা ইহাদের পক্ষে সুসাধ্য না হওয়ায় ইহারা আর নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে; সুতরাং ইহারা শিখিয়াছে শঠতা। আদিম অসভ্য অবস্থায় ইণ্ডিয়ান অপেক্ষা অর্ধ-সভ্য ইণ্ডিয়ান অধিকতর হিংস্রপ্রকৃতির হয়। যে সকল ইণ্ডিয়ান সম্প্রতি শ্বেতকায় জাতির সংশ্রবে আসিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে আমি চরম আতিথেয়তা ও সদয় ব্যবহার পাইয়াছি। আমাদের অসৎ সংস্কার বা রীতিনীতি ইহারা সহজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলে কিন্তু সদসৎ বিচারে বা আমাদের উৎকৃষ্ট গুণগুলির গ্রহণে ইহারা তৎপরতা দেখায় না।"

সাঁওতাল সম্বন্ধে এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

---

(৩)

জীবিকা ও নিয়োগ

জীবিকা ও নিয়োগ ক্ষেত্রে জনসংখ্যাকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কৃষিজীবী সম্প্রদায় ও অ-কৃষিজীবী সম্প্রদায়। জনসাধারণের প্রতিশতকে

কৃষিজীবী সম্প্রদায়

প্রায় ৮২ জন জীবিকার জন্য মুখ্যতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। ইহার মধ্যে প্রায় ৬২ জনের নিজস্ব জমিজমা আছে, ১০ জন হইতেছে ভূমিহীন কৃষক আর ২০ জন কৃষিমজুর বা ক্ষেতমজুর। বিগত ইং ১৯৫১ সালের সেনসাসে ইহাদের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যথাক্রমে ৬৮১৩৩০, ১৩২১৫৯ ও ২৫৬৮৭১। জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিজমির বণ্টন যে ক্রমশই সঙ্কুচিত হইতেছে তাহা নিম্নের তথ্য হইতে প্রকাশ পাইবে ?

ইং সাল	জনপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ (একরে)
১৯২১	'৭৫
১৯৩১	'৭০
১৯৪১	'৬০
১৯৫১	'৫৮
১৯৬১	'৫৪

ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যাই যে এই পরিমাণ হ্রাসের কারণ তাহাতে সন্দেহ

অর্থনীতিক্ষেত্রে কৃষিজীবী

নাই। কৃষি-জমি আবার যাবতীয় কৃষক পরিবারের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। জিলায় ক্ষুদ্রায়তন কৃষি-জমার প্রাধান্য দেখা যায় এবং নিম্নের বিবরণী হইতে ইহার আভাস মিলিবে :

কৃষি-জমার আয়তন ও বিন্যাস

মহকুমা	০-১ একর	১'০১-৩ একর	৩'০১—৫ একর	৫ একরের উপর
বাঁকুড়া সদর	৬৭%	১৮%	৭%	৮%
বিষ্ণুপুর	৬৮%	২৪%	৫%	৩%
জিলার গড়	৬৭'৫%	২১%	৬%	৫'৫%

কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষক একাধিক জমাই-স্বত্বের অধিকারী হইলেও ইহা দেখা যায় যে অর্থনীতির দৃষ্টিতে যাহাকে পর্যাপ্ত জমি বলা যাইতে পারে তাহার অধিকারীর সংখ্যা কম। নিম্নের বিবরণী স্বয়ং প্রকাশক :

জমির পরিমাণ	০-১ একর	১·০১-৩ একর	৩·০১-৫ একর	৫ একরের উপর
কৃষক সংখ্যার শতকরা হিসাব	১৩·২	৩৪.৬	২২·০	৩০·২

অর্থাৎ কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিশতকে প্রায় ৭০টি পরিবার ৫ একর বা ১৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির অধিকারী। ইহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশেরই জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩ একর বা ৯ বিঘা। প্রতি শতকে প্রায় ১৩টি পরিবারকে এক একর বা ৩ বিঘা বা তাহারও কম জমির উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে কৃষক সমাজের এক বৃহৎ অংশের পরিবার প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট কৃষিজমি নাই। ইহারা দরিদ্র, নিঃস্ব, ঋণ-ভারে জর্জরিত। ফসল যাহা পায় তাহার এক বৃহৎ অংশ শেষ হয় মহাজনের বকেয়া ঋণ পরিশোধে। এই ঋণ সাধারণতঃ ফসল হিসাবেই লওয়া হয়, আবার ফসল হিসাবেই সুদ সহ পরিশোধ হয়। ঋণ পরিশোধের পর যাহা থাকে, নিম্ন কৃষকশ্রেণীর পক্ষে তাহা দ্বারা মাত্র কয়েক মাসের অভাব মিটান সম্ভব হয় ; অন্যের পক্ষেও সারা বৎসরের প্রয়োজন মেটে না। সুতরাং আবার মহাজনের দ্বারে ছুটিতে হয়। এই অবস্থায় অনেকে অন্য উপজীবিকা গ্রহণ করে, কেহ কেহ বা সাময়িক ভাবে বিদেশে যায় আহার্যের অনুসন্ধানে।

কৃষিজীবী সম্প্রদায় নিজ নিজ ঘাটতি পুরণের জন্য যে সকল উপজীবিকা গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে ভাগচাষ অন্যতম। জিলায় এই পদ্ধতিতে কৃষিজমি চাষের বিশেষ প্রসার দেখা যায়। জিলায় ভাগদারের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ হাজার। সাধারণতঃ দরিদ্র বাউরি, বাগদি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কৃষিজমিহীন বা স্বল্পজমিবিশিষ্ট হিন্দু, বা সাঁওতাল ও দুঃস্থ মুসলমান সম্প্রদায় ভাগদার পর্যায়ে পড়িলেও অনেক সময় দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার কৃষকও বাধ্য হইয়া অপরের জমি ভাগ প্রথায় চাষ করে। ভাগদার যে কৃষিজীবীর জমি চাষ করে তাহারা প্রধানতঃ উচ্চবংশজাত বা নিজস্ব কর্তৃত্বে কৃষিকাজ পরিচালনায় অসমর্থ সম্প্রদায়। কয়েকটি অনিবার্য কারণে ভাগদারকে জমির মালিকের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। যদিও প্রথা অনুসারে ভাগদার

কৃষিজীবীর অন্যান্য উপজীবিকা—ভাগপ্রথা

সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ পাইবার হকদার, ইহাদের খুব কম সংখ্যকই তাহা পায়। ফসল ভাগ হইবার সময় জমির মালিকের নিকট ভাগদার ঋণ-স্বরূপ পুর্বে যে ধান লইয়াছে, তাহা প্রথম সুদ সহ আদায় করা হয়, তারপর অবশিষ্ট ফসল প্রথামত ভাগ হয়। এই ঋণ একরূপ চিরন্তন বলা যাইতে পারে। ঋণ গ্রহণ করিবার কারণ প্রথমতঃ সাংসারিক অস্বচ্ছলতা, দ্বিতীয়তঃ সাঁওতাল ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণী চাষ আবাদের গণ্ডির বাহিরে অন্য কোন কাজে সাধারণতঃ আকৃষ্ট হয় না। খোরাকীর যখন অভাব ঘটে, ইহারা জমির মালিকের নিকট খাদ্যশস্য ঋণ লয় সাধারণতঃ বারী প্রথায়। ঋণ বাবদ প্রচলিত সুদ সাধারণতঃ প্রতি মণে দশ সের। অজন্মার বৎসর আবার বেশী পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন হয় আর জমির মালিক যদি অবস্থাপন্ন হন, তিনি এই ঋণ দিতে কার্পণ্য করেন না। বহুকাল ধরিয়া এই ভাবে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ করিতে করিতে অনেক সময় অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে ভাগদারের অংশে যে ফসল প্রাপ্য হয় তাহাতে তাহার মাত্র কয়েক মাস চলে যদি না তাহার নিজস্ব জমির ফসলের উপর সে নির্ভর করিতে পারে। এই অবস্থায় কেহ কেহ আবার বারী লয়, কেহ কেহ অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকে, কেহ বা কাজের সন্ধানে গৃহত্যাগ করে বা ক্ষেত মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করে। ভাগদার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা পরে করা হইয়াছে।

নিজ জমির উৎপন্ন ফসলের স্বল্পতা পারিবারিক জীবনে যে খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করে তাহার প্রতিবিধানে সাময়িক ভাবে অন্যত্র কর্মসংস্থান অনেকের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়ে। দামোদরের অপর তীরে যে শিল্পাঞ্চল ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে, সেখানে সাময়িক শ্রমিকের বৃত্তি গ্রহণ অনেকেরই অবলম্বন। আবার বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জিলায় ধান রোপণের বা ধান কাটার সময় বহু ক্ষেত মজুরের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর এই জিলা হইতে শত শত কৃষক পরিবার ঐ সময় এই সব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল শ্রেণীর। চাষের পর বা ধান কাটা শেষ হইলে ইহারা স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। কৃষক পরিবার সময় বিশেষে অন্য বৃত্তিও অবলম্বন করে, যেমন ছোট ছোট ব্যবসায়, যানবাহন পরিচালনা, দিন মজুরের কাজ, ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োগ প্রভৃতি।

গত ১৯৬১ সালের সেনসাসে ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয় প্রায় দেড় লক্ষ। ক্ষেত মজুর শ্রেণীর অধিকাংশই ভূমিহীন ও সমাজের নিম্নস্তরের লোক।

জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম উপভোগ ইহাদের নাই বলিলেই চলে। যে কৃষক-গৃহস্থ ক্ষেত-মজুর নিযুক্ত করে, তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া ইহাদের থাকিতে হয়। সুতরাং অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা বন্যার প্রকোপে যদি কৃষিকর্মের চাহিদা না থাকে বা কম থাকে, ইহাদের দুর্দশা হয় সর্বাধিক। ইং ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন ইহাদের অসহায়তার উল্লেখ করিয়াছেন। ইং ১৯৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন-ও ক্ষেত-মজুর শ্রেণীর সমস্যা সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন আর সুপারিশ করিয়াছেন যে ইহাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হওয়া উচিত ও জীবনযাত্রার প্রণালীরও উন্নতি হওয়া আবশ্যক। কমিশনের মতে ক্ষেত-মজুরের সমবায় গঠন হওয়া প্রয়োজন আর সরকারের পক্ষে এই সমবায়ের সুষ্ঠু গঠন কি ভাবে হইতে পারে ও সমবায়ের সভ্য শ্রেণীভুক্ত ক্ষেত-মজুরের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিকল্পে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় নাই।

ক্ষেত-মজুর

ক্ষেত-মজুরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) যাহারা সারা বৎসরের জন্য বেতন চুক্তিতে নিযুক্ত হয়। ইহাদের কাজ হইল নিয়োগ-কর্তা কৃষকের জমিতে সার বহন, প্রাথমিক চাষ, জমির আইল মেরামত, জমি হইতে উদ্বৃত্ত জল নিকাশ ইত্যাদি। ফসল জমি হইতে কৃষকের খামারে আনিবার কাজেও ইহাদের নিয়োগ করা হয়। ইহারা সাধারণতঃ মাহিনদার বা কিষান নামে পরিচিত। মাত্র অবস্থাপন্ন কৃষকই ইহাদের নিযুক্ত করে।

(খ) যাহারা বাৎসরিক চুক্তিতে কৃষকের গৃহে রাখাল বা বাগালের কাজে নিযুক্ত হয়। গৃহস্থের গো-মহিষাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ইহাদের কাজ।

(গ) যাহারা মজুর বা মুনিস হিসাবে দিন চুক্তিতে কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়। যে সব গৃহস্থ ভাগ প্রথায় জমি আবাদ করায় তাহারা ব্যতীত অন্যসব কৃষক চারা রোপণ, জমি নিড়ান, ফসল কাটা প্রভৃতিতে মুনিস নিয়োগ করে। যে কৃষক নিজ হাতে জমি চাষ করে তাহাকেও সময় বিশেষে মুনিস রাখিতে হয়।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু নিম্ন-সম্প্রদায় ও সাঁওতালদের প্রাধান্য দেখা যায়।

অ-কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপজীবিকার পরিচয় মোটামুটি এইরূপ :

অ-কৃষি সম্প্রদায়
(ক) কৃষি ভিন্ন কোন উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল
(খ) ব্যবসায়-বাণিজ্য
(গ) যান-বাহন পরিচালনা
(ঘ) অন্যান্য।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আসিবে শিল্প সংস্থায় নিয়োগ, ধান হইতে চাউল উৎপাদন, বিড়ি প্রস্তুত, তাঁতের ও চামড়ার কাজ, কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতির বৃত্তি, পিতল কাঁসার বাসন প্রস্তুত, বাঁশ বা বেতের কাজ ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে নানা শ্রেণীর পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী। গো-গাড়ীর চালক, মোটর গাড়ী সংক্রান্ত কাজ তৃতীয় শ্রেণী ও ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, আইনজীবী, নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত।

নানাবিধ শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৮.২৩ জন। ইং ১৯০১ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৫.৯ জন। জিলার শিল্প-ক্ষেত্রে কি পরিমাণে অবনতি হইয়াছে তাহা ইহা হইতে বোঝা যায়। ইং ১৯২১ সালের সেনসাস রিপোর্ট কয়েক শ্রেণীর শিল্পজীবী ও শ্রমজীবীর সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছে। ইহার সহিত ১৯৬১ সালের সেনসাস তুলনা করিলে দেখা যায় যে ৪০ বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ইং ১৯২১ সালের সেনসাসে তাঁত-শিল্পীর সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয় ১৯৫৬৩, ১৯৬১ সালের রিপোর্টে ইহাদের সংখ্যা দেখা যায় প্রায় দশ হাজার। রেশম-শিল্পীর সংখ্যা ১৯৬১ সালে দেখা যায় মাত্র ৮১৪ অথচ ১৯২১ সালে ইহা ছিল ৩২৪০। কাংস্য বণিক অর্থাৎ পিতল-কাঁসার শিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ৭৮২১, ১৯৬১ সালে ইহা হয় প্রায় ৩৭০০। স্বর্ণ-শিল্পীর সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ৫৯৪০, ১৯৬১ সালের সংখ্যা হইতেছে ১৩১৬। যাহারা কাঁচের চুড়ি প্রস্তুত করিয়া অন্ন-সংস্থান করে তাহাদের সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ২৬৫২, ১৯৬১ সালে সংখ্যা দাঁড়ায় অতি নগণ্য। ১৯২১ সালে জিলায় কুম্ভকারের সংখ্যা ছিল ৪৮৪৪; ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা পরিগণিত হয় দুই হাজারেরও কম। মেজিয়া ও শালতোড়ার কয়লা খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ২২০২, ১৯৬১ সালের সংখ্যা ৮৬৪। ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে এই শ্রেণীর সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয় ১৯২১

সালে ১২১৫৪, ১৯৬১ সালে ২২৯২। ১৯২১ সালে ৭৫১০ জন বাঁশের তৈয়ারী নানাবিধ শিল্প কর্মে লিপ্ত ছিল; ১৯৬১ সালে এই কার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দেখা যায় ২৬৫৭। মাছ ধরিয়া বা মৎস্য-ব্যবসায় দ্বারা যাহারা জীবিকার্জন করে, তাহাদের সংখ্যা পরিগণিত হয় ১৯২১ সালে ১২৪৩৪, ১৯৬১ সালে ১৬৬১।

বাঁকুড়া শহরে ও অন্য কয়েকটি স্থানে শাঁখা শিল্প একটি প্রধান শিল্প। শঙ্খ-শিল্পীর সংখ্যা পরিগণিত হয় প্রায় ৪০০। বিড়ির কাজ একটি উদীয়মান শিল্প এবং যাহারা বিড়ি শিল্প মাধ্যমে অন্ন-সংস্থান করে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২৯০০। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও মুদিখানা বহু লোককে জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে। প্রায় প্রতি গ্রামেই এই জাতীয় ব্যবসায়ী ও মুদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কোন কোন অঞ্চলে ইহারা আবার গ্রাম মহাজনও বটে। অকৃষি সম্প্রদায়ের কেহ কেহ কৃষিজমিরও অধিকারী। কৃষিকাজ পরিচালনায় নিজেদের অসামর্থ্য বিধায়, জমি চাষ হয় ভাগ প্রথায়। পূর্বে কোন কোন জমি সাঁজা প্রথায়ও বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু জমিদারী গ্রহণ আইন বলবৎ হওয়ার পর সাঁজা জমি হইতে ইহারা বিচ্যুত হইয়াছে।

যাহারা কোন শিল্পের উপর নির্ভরশীল তাহারাও মহাজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অনেক সময় মহাজন মূলধন দেয় আর কাঁচা মাল সরবরাহ করে। মহাজন শিল্পীকে মাত্র পারিশ্রমিক দেয় আর তৈয়ারী মাল খরিদ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। কাঁসা-পিতল, তাঁত প্রভৃতি ব্যবসায়েই মহাজনের এই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে শিল্প-ব্যবসায়ে প্রকৃত লাভবান হয় শিল্পী নহে—মহাজন। এইভাবে মুষ্টিমেয় এক বিশিষ্ট শ্রেণীর হাতেই অর্থ পুঞ্জীভূত হইতেছে।

জীবন যাত্রার ধারা

বিগত শতাব্দীতে হাণ্টার সাহেব তাঁহার "পল্লীবাংলার কাহিনী" নামীয় পুস্তকে[১] বলিয়াছেন যে তখনকার দিনে সাধারণ দেশবাসীর পরিধেয় ছিল মাত্র ছোট একখানা মোটা ধুতি ; ধুতির সহিত থাকিত গামছা। বিশিষ্ট ভদ্র-সমাজে প্রচলিত ছিল ধুতির সহিত চাদর ও চটিজুতা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সাধারণ পরিধেয় ছিল ধুতি ; বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁহারা পরিধান করিতেন গ্রীষ্মের দিনে সার্ট বা গলবন্ধ কোট, চাদর, জুতা আর শীতের সময় শাল অথবা গরম জামা। তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিধেয় ছিল ধুতি, চাদর, চটিজুতা ; কৃষিজীবী শ্রেণীর ছিল মোটা ধুতি, সঙ্গে গামছা, নিম্নশ্রেণীর ছোট মোটা ধুতি। স্ত্রীলোকের পরিধেয় ছিল শাড়ী ; সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ বধূ বডিস্ ও গায়ের কাপড়ও ব্যবহার করিতেন। তখন প্রাতরাশ বা জলখাবার মুড়ি গুড়েই সমাধা হইত ; মধ্যাহ্নের আহার ছিল প্রায় সবক্ষেত্রেই ভাত, কড়াই ডাল, সময় বিশেষে পোস্ত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ মাছ, তরকারী ও দুধও আহার করিতেন কিন্তু মাছের প্রচলন ছিল কম। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আমানির ব্যাপক প্রচলন ছিল ; নিম্নশ্রেণী আবার সময় বিশেষে মহুয়ার ফুলে ক্ষুধা মিটাইত এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর বসন্তকালে মহুয়ার ফুল সংগ্রহ করিয়া সেগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিত, অন্নাভাবের সময় ডাল ও তেঁতুলের সহিত তাহা সিদ্ধ করিয়া উদর পূরণ করিত। সম্পন্ন গৃহস্থের এক প্রিয় খাদ্য ছিল দুধ-মুড়ি। তাঁহারা গব্যঘৃতের লুচিদ্বারা অতিথি সৎকার বিশেষ সম্মান-জনক মনে করিতেন। তামাকের ব্যবহার হুকা-কল্কিতেই সমাধা হইত ; বিষ্ণুপুর তামাকের ছিল বিশেষ প্রতিপত্তি। চিত্ত বিনোদনের জন্য ছিল যাত্রাগান, মনসার ঝাঁপান, বৈঠকি গান ও হরি সংকীর্তন। সাধারণের নিকট যাত্রাগান ছিল অতিপ্রিয়, জিলার পূর্বাঞ্চলে ছিলেন বহু প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল কীর্তন বা হরিসংকীর্তন ; স্থায়ীকাল হিসাবে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল ; অহোরাত্র, অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর

পুরাতন দিনের কথা

(১) A. W. Hunter—Annals of Rural Bengal.

ইত্যাদি। পৌষ মাসে টুসু পরব, চৈত্র মাসে গাজন ও ভাদ্র মাসে ভাদু পরব জনসাধারণের এক বিশাল অংশকে আনন্দ দান করিত।

তখন যে গৃহস্থ পরিবার জনপ্রতি দৈনিক মাত্র চার আনা ব্যয় করিতে সমর্থ ছিল, তাহাকে সম্পন্ন পরিবার বলিয়া গণ্য করা হইত; জন প্রতি ছয় আনা ব্যয় ছিল সচ্ছলতার, আর আট আনা উচ্চ অবস্থার পরিচায়ক। মাত্র সচ্ছল কৃষক-পরিবারের গৃহিণীগণই রৌপ্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইতে সমর্থ ছিলেন, সাধারণ কৃষক রমণীর অলঙ্কার ছিল পিতলের বা তামার। কৃষক শ্রেণীর মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার ছিল না বলিলেই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাসগৃহ ছিল খড়ের চালের, পাকাবাড়ী বা টালির ঘর মাত্র শহরে বা বিশিষ্ট স্থানেই দেখা যাইত। গায়ে মাখিবার জন্য ও রান্নায় ব্যবহৃত হইত বিশুদ্ধ সরিষার তেল, কয়লার ব্যবহার ছিল অজ্ঞাত।

সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীর আহার্য ছিল ভাত অথবা আমানি, কোদো, ভুট্টা। শীকার-লব্ধ পশু মাংসও তাহাদের আহার জোগাইত। শুষ্ক মহুয়া ফুল সিদ্ধ করিয়া তাহারা অনটনের ক্লেশ ঘুচাইত। চাউল বা মহুয়া ফুলের বিনিময়ে লবণ সংগ্রহ করিত, গৃহ-প্রস্তুত পচাই বা হাড়িয়া পানে মানসিক অবসাদ ও শারীরিক ক্লান্তি দূর করিত। সাঁওতাল রমণী ছিল সুদক্ষ তাঁতশিল্পী; পরিবারের পরিধেয় বস্ত্র গৃহেই বোনা হইত। সাঁওতাল পুরুষের পরিধেয় ছিল একখণ্ড ছোট মোটা ধুতি, আর স্ত্রীলোকের শাড়ী। মাদল বাদ্যের সহিত নৃত্যগীত, শীকার, মোরগ লড়াই প্রভৃতি ছিল চিত্তবিনোদনের উপায়।

জীবনধারার পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইহার পরবর্তীকাল সারা দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা ইঙ্গিত করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহিত শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে আসে এক নূতন যুগ। ইহার সহিত যোগ হয় কৃষির প্রসার, সেচন ব্যবস্থার উন্নতির সহিত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস, সংযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি। সমাজের এক বিশিষ্ট অংশ হইল লাভবান, ফলে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনধারার গতি যে পথে চালিত হইল, তাহা হইতেছে অর্থনৈতিক-উন্নতি-জনিত পরিবর্তনের সম্পূর্ণ সুখ-সুবিধা উপভোগের প্রেরণায়।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

জমিদারি-প্রথার বিলোপ সাধনে এই শ্রেণীর ক্ষতিবৃদ্ধি তেমন কিছু হয় নাই যেমন হইয়াছে কৃষি জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ও যুগোপযোগী প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই, বিশেষতঃ শহর অঞ্চলে, ব্যবসায় কেন্দ্রে ও বিশেষ বিশেষ পল্লী অঞ্চলে। যেখানে চা, বিস্কুট, পাউরুটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, সেই স্থানে হইল ইহাদের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় মাছ, ডিম, আলু, কফি প্রভৃতির সমাদর। বিগত দিনের বিশুদ্ধ ঘৃত সংগ্রহ যাহারা আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে মনে করেন, তাঁহারা বনস্পতি জাতীয় কৃত্রিম আহার্যের সংস্থান অবশ্য করণীয় মনে করেন। নানা শ্রেণীর মনোহারী দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধি, শহরে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে ইহাদের সমারোহ, সৌখীন দ্রব্যাদির ক্রম-বর্ধমান চাহিদার ইঙ্গিত করে। লোকরঞ্জনে পুরাতন লোকগীতি বা আমোদ প্রমোদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে সিনেমা। প্রতি শহরে বা বিশিষ্ট স্থানে সিনেমা তাহার প্রভাবের জাল বিস্তার করিয়া অগণিত দর্শককে চিত্ত-বিনোদনে আকৃষ্ট করিতেছে। গৃহস্থের সুরুচির পরিচয় রেডিও সেট। হুকা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ধুতি চাদরের প্রচলনও, বিশেষতঃ যুবক মহলে। বিজলি বাতির ব্যবহার সম্প্রসারিত হইয়া শহর ও ব্যবসায় কেন্দ্র হইতে পুরাতন দিনের কেরোসিন আলোকে দূর করিয়া দিয়াছে। টর্চ-লাইট আর বাই-সাইকেলের ব্যবহার কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে এখন একান্ত অপরিহার্য। আর বৃদ্ধি পাইতেছে পাকা বাড়ীর সংখ্যা ও উচ্চশিক্ষার প্রসার। অবস্থাপন্ন এইরূপ গৃহস্থ কমই আছেন যাঁহারা পুরাতন খড়ো চালকে বিদায় দিয়া পাকাবাড়ীর পক্ষপাতী নহেন বা যিনি পুত্রকে কলেজ-শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকেন। বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ সমাজের বধূদের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার পরিধানের প্রসার তাঁহাদের আভিজাত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। প্রসাধন দ্রব্যাদির প্রচলন ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে, যেমন বাড়িতেছে সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয় বাহুল্য। কোন কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইলে সাধারণতঃ আট হইতে দশ হাজার টাকা নিম্নতম ব্যয়; ইহাদের সঙ্গে আছে যৌতুক, আর যৌতুকের পরিমাণ নির্ভর করে পাত্রের শিক্ষামান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর। পারলৌকিক কাজ দুই-তিন হাজার টাকার নীচে চালান দুষ্কর।

শহর অঞ্চল

এই যে পরিবর্তনের প্রভাব, ইহা গ্রামাঞ্চলের উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্পর্শ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের অনেকে নানাবিধ ব্যবসায়ের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও, পূর্বে কৃষিজমি ছিল ইহাদের এক প্রধান অবলম্বন। জমিদারি

গ্রামাঞ্চল

স্বত্ব লোপ এই সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের-বিশেষ কোন পরিবর্তন না আসিলেও চা বিস্কুটের পক্ষপাতী অনেকেই। দুধ বা মাছ নিত্যকার সাধারণ খাদ্যতালিকার অন্তর্গত নহে। সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন ব্যবহার করে প্রতি শতকে প্রায় ২০ জন। হুকার প্রচলন এখনও আছে কিন্তু নবীন সম্প্রদায়ের নিকট প্রিয় সিগারেট, বিড়ি। সিনেমার প্রচলন নাই বলিলেও হয় ; কিন্তু সাবেক যাত্রা গান আর নাই, তবে বৈঠকি গান টুসু, ভাদু, গাজন উৎসব এই সম্প্রদায়ের এখনও প্রিয়। কন্যাবিবাহে সাধারণতঃ ব্যয় হয় অন্যূন তিন হইতে পাঁচ হাজার ; তবে যৌতুকের প্রসার বাড়িতেছে। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ব্যয় হয় কমবেশী এক হাজার। মিহি ধুতি বা শাড়ী, সার্ট ও সেমিজের প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ জন প্রতি বৎসরে প্রয়োজন হয় দুই জোড়া ধুতি বা শাড়ী, এক জোড়া সার্ট বা সেমিজ, এক জোড়া গামছা। গ্রামাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকে কৃষির উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল হইলেও ইহাদের মধ্যে এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে যাহারা ছোট ছোট উৎপাদনে দক্ষ, যেমন কামার, তাঁতি, ছুতার ইত্যাদি। যাহাদের কিছু কৃষি-জমি আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সামাজিক বা অন্য কারণে নিজেরা চাষে অপারগ ছিল, তাহারা সাধারণতঃ সাঁজা প্রথায় চাষাবাদ করাইত। সাঁজা প্রথা বিলোপের সঙ্গে তাহারা পড়িয়াছে দুরবস্থায়। এই সম্প্রদায়ের যাহারা আবার সাঁজায় চাষ করিত, বর্তমানে জমিদারি বিলোপ আইনে তাহারা হইয়াছে উপকৃত ; তাহারা এখন সরকারের অধীন খাজানা-দায়ী প্রজা। ইহাদের জীবনযাত্রায় চতুর্দিকের পরিবর্তনের ছাপ খুব কমই রেখাপাত করিয়াছে। চায়ের প্রচলন নাই বলিলেই হয় ; দুধ, মাছ, আলু প্রভৃতি বিলাসের সামগ্রী ; পুরাতন প্রথামত মধ্যাহ্ন আহার হয় বেলা দুইটায় বা তিনটায়। রাত্রি বেলায় আলো জ্বালা বা রান্নার ব্যবস্থা কম পরিবারেই হয়। ইহাদের টর্চ বা বাইসিকেলের আড়ম্বর নাই, ধূমপানের তৃষ্ণা মিটায় স্বগৃহে তৈয়ারী বিড়ি জাতীয় চুটি। সাবানের ব্যবহার কম, অনেক সময় কাপড়জামা পরিষ্কার করা হয় সোডার জলে বা গাছ বিশেষের ভস্মে। ধুতি শাড়ীর ব্যবহার কম, বৎসরে বড় জোর মাথা প্রতি দুইখানা, বিবাহাদি অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে যে সামান্য অর্থ প্রয়োজন হয় তাহা সংগ্রহের জন্য অনেক সময় মহাজনের শরণ লইতে হয়। পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা খুব কমসংখ্যক গৃহস্থই করিতে পারে। ইহাদের আমোদ-প্রমোদ সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে বিভিন্ন

আঞ্চলিক পরব বা উৎসব, যেমন গাজন, টুসুগান, হরি-নাম-কীর্তন এবং পূর্বাঞ্চলে নানাবিধ বৈষ্ণব লোকোৎসবের মধ্যে। এই শ্রেণী দরিদ্র, কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ইহাদের খুব কমসংখ্যাকেই গৃহছাড়া করিয়াছে যেমন করিয়াছে ভূমিহীন বা নগণ্যভূমি বিশিষ্ট সমাজের নিম্নতম শ্রেণীকে।

অনুন্নত দরিদ্র সম্প্রদায়

এই দরিদ্র কৃষিজীবী বা ভূমিহীন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জীবিকা হইতেছে প্রধানতঃ অপরের জমি ভাগদার বা ক্ষেতমজুর হিসাবে চাষ, দিন মজুরি, মাছ ধরা ও তাহা বাজারে বিক্রয়, শহরে বা ব্যবসা কেন্দ্রে ছোট ছোট শিল্পসংস্থায় কাজ, সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে মাস বা বৎসর চুক্তিতে অনুচরের কাজ প্রভৃতি। ইহাদের অনেকে দামোদরের অপর তীরে শিল্পাঞ্চলেও সাময়িক মজুর বৃত্তি গ্রহণ করে, নামালে বা বর্ধমান ও হুগলি জিলায় চাষের কাজে নিযুক্ত হইবার আশায় চাষের মরশুমে বা ধান কাটার সময় দেশত্যাগ করে। অনেকে আবার চা বাগান অঞ্চলে কাজের অনুসন্ধানে বাহির হয় ও চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করে। বলা বাহুল্য, ইহাদের জীবনধারায় যুগোপযোগী পরিবর্তন বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অনেকের পক্ষেই বৎসরের এক বিশেষ সময় মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য আমানির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। রাত্রির ক্ষুধা নিবৃত্তি করে হাড়িয়া। রাত্রে ইহাদের গৃহে দীপ জ্বলে না; রোগ ব্যাধি প্রশমনে ইহারা গাছ পালা বা ওঝার উপর নির্ভর করে; পুত্র কন্যার শিক্ষার কথা ইহারা ভাবিতে পারে না, ইহাদের বিবাহাদির জন্য ব্যয় করে নগণ্য যৎকিঞ্চিৎ। সুষ্ঠু জীবন যাপনের প্রেরণার অভাব দেখা যায় এই শ্রেণীর মধ্যে। অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে রমেশচন্দ্র দত্ত[১] মহাশয় কয়েকটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বাঁকুড়ার পল্লীজীবনে তাহার বিশেষ কোন বিকৃতি লক্ষিত হয় না। তিনি লিখিয়াছেন:

"একই জিলায়, অনেক সময় বা একই গ্রামে বসবাস করা সত্ত্বেও বর্ণহিন্দু ও অর্ধ-হিন্দু অধিবাসীর রীতি, নীতি ও জীবনধারণ প্রণালীতে এইরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে তাহা অনবধান দর্শকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উন্নত ধর্মের আদর্শ ও পুরুষানুক্রমিক অর্জিত সুদৃঢ় সংস্কার সর্বশ্রেণীর বর্ণহিন্দুকে শান্ত প্রকৃতি ও চিন্তাশীলতা প্রদান করিয়াছে; উন্নত ধরণের সভ্যতা তাহাকে

১। রমেশচন্দ্র দত্ত—বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। কর্মজীবনে কলেক্টর ও বর্ধমান বিভাগের কমিশনার ছিলেন।

করিয়াছে হিসাবী, বিবেচক ও মিতব্যয়ী। নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের আদর্শ তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়াছে, তাহাকে কর্তব্যপরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতি প্রভাবাপন্ন আদিম অধিবাসীর চরিত্র ইহার বিপরীত। অতি সামান্য কারণে উত্তেজিত হওয়া তাহার প্রকৃতিজাত; উগ্র আনন্দ ও দৈহিক সুখভোগ তাহার প্রথম কাম্য। ভবিষ্যতে কি হইবে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে সে অক্ষম, সুতরাং পরে কি হইবে তাহা চিন্তা না করিয়া সে যাবতীয় উপার্জন নিঃশেষ করে। কোন শ্রমকর্মে একনিষ্ঠভাবে আসক্ত থাকিয়া জীবনযাপনে সে অপারগ। সরল, আমোদপ্রমোদ ও উত্তেজনাপ্রিয়, অপরিণামদর্শী, অমিতব্যয়ী, সুরাসক্ত এই অর্ধ-আদিম অধিবাসী সম্প্রদায় তাহাদের বর্তমান জীবনে পূর্বপুরুষের বহু সৎ ও নিকৃষ্ট গুণ বহন করিয়া আনিয়াছে। যে গ্রামে ইহাদের বাস, তাহার এক পৃথক অংশ ইহাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। নিকটবর্তী বর্ণহিন্দু পল্লীতে যে পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষিত পরিষ্কার গৃহকোণ ও আঙ্গিনা পরিলক্ষিত হয় তাহার সহিত প্রতিবেশী বাউরি বা হাড়ী পাড়ার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অর্ধনগ্ন গৃহছাদের পার্থক্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। গ্রামে যদি গবাদি পশু বা শূকর মৃত হয়, তাহাদের চামড়া ছাড়াইয়া লইয়া যায় মুচি অথবা বাউরি, কিন্তু বর্ণ হিন্দু মুখ ফিরায় ও নাকে কাপড় দেয়। গ্রামে যদি কোন গোপন মদ চোলাই-এর স্থান থাকে, তাহা হইল হাড়ী কিম্বা বাগদি পাড়ায়। এই পাড়ায় হাড়ী বা বাগদি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে ও নিজেদের নগণ্য আয় বে-হিসাবে ক্ষয় করে; খড়শূন্য গৃহ-চাল বা উপবাসী পুত্রকন্যার দিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

"সাধারণতঃ বর্ণহিন্দু, মদ ও মাদকতার বিরুদ্ধে। মিতব্যয়িতা, স্বাভাবিক দূরদর্শিতা, স্থৈর্য, চিন্তাশীল মনোবৃত্তি, ধর্মভাব প্রভৃতি গুণ তাহাকে অসংযম অভ্যাসগুলির প্রতি অত্যধিক আসক্তি হইতে নিবৃত্ত করে। ইহা সত্য যে কিছু সংখ্যক যুবক ও বহু ধনবান লোক মদ্য পান করে, কিন্তু যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করে, যেমন মিতব্যয়ী মুদি, ধীর ও অক্লান্তকর্মী সদ্গোপ, নম্র ও বিনয়ী কৈবর্ত, ইহাদের কেহ মদ স্পর্শ করে না। মদ্যপানজনিত উগ্র কোলাহলময় উল্লাস ইহাদের স্থির শান্ত প্রকৃতির নিকট অজ্ঞাত। ইহাদের কেহ যদি মদ্যপান করে, তাহা করে রাত্রিতে, স্বগৃহে, নিঃশব্দে। উগ্র উত্তেজনা ও কোলাহলযুক্ত উল্লাস সংস্কৃতি বর্জিত শ্রেণীর প্রকৃতি আর এই শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান জনিত মত্ততার প্রাবল্যও বেশী। বাউরি, বাগদি ও মুচির ভিতর

তাহাদের আদিম প্রকৃতির অনেক কিছু আছে যাহাতে তাহারা অনুভব করে মদ্যপানের তীব্র তৃষ্ণা। বর্ধমান ও বাঁকুড়া যে সকল দেশীমদ বা পচাইএর দোকান আমরা পরিদর্শন করিয়াছি তাহাদের মধ্যে এমন একটিও পাই নাই যাহা প্রধানতঃ এই অর্ধ-আদিম অধিবাসী ক্রেতার উপর নির্ভর করে না। মদ বা পচাইএর দোকানের সম্মুখে সমবেত জনতার মধ্যে একজনও বর্ণহিন্দু দেখা যায় নাই।

"বর্ণহিন্দু ও অর্ধ-হিন্দু ভাবাপন্ন আদিবাসীর মধ্যে পার্থক্য তাহাদের নারীজাতির আচার ব্যবহারেও প্রত্যক্ষ করা যায়। শহর অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথায়ও বর্ণহিন্দু নারী মুসলমান স্ত্রীলোকের ন্যায় পর্দার আড়ালে অবরুদ্ধা থাকে না। পল্লীগ্রামে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের স্ত্রীকন্যাগণ এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী অথবা স্নানের জন্য পুকুর বা নদীতে অবাধে যাতায়াত করে, কিন্তু ঘোমটা টানিয়া। নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের ঘোমটা থাকে না, থাকিলেও তাহা নামমাত্র। কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারী অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলিবে না, অপরিচিত লোকও তাহাকে সম্বোধন করিবে না। নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের মধ্যেও নিতান্ত বয়স্কা ভিন্ন কম স্ত্রীলোকই অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিবে। অর্ধহিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসীদের সম্বন্ধে এই সকল বিধিনিষেধের বালাই নাই। ইউরোপীয় নারীর ন্যায় তাহাদের স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যুবতী বধূ কিম্বা বয়স্কা বিধবা গ্রামে হাট বাজারের রাস্তায় ঘোমটার সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রাখিয়া অবাধে চলাফেরা করে, প্রয়োজন মত যে কোন অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ করে এবং স্বভাবতঃ চপল, উৎফুল্ল ও সতেজ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট থাকায় পথ চলিবার সময় স্ফূর্তির সহিত কথাবার্তা বলে ও কলহাস্য করে। অল্প বয়স্কা তাঁতি বউ বা ছুতার গৃহিণী, কামার বা কুমারের স্ত্রী অপরিচিত লোক পথ দিয়া আসিতে দেখিলে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়ায় কিন্তু বাউরি স্ত্রীলোকের মধ্যে লজ্জা রক্ষার এরূপ কোন সংস্কার নাই। এই অর্ধ-আদিবাসী স্ত্রীলোকগণ ইউরোপীয় নারীসুলভ স্বাধীনতা উপভোগ করিলেও অনেক সময় এইজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। বর্ণ-হিন্দু নারীর অদৃষ্টে থাকে গৃহস্থালী কিন্তু অর্ধ-আদিবাসী স্ত্রীলোকের অন্নসংস্থানের জন্য গৃহের বাইরেও যাইতে হয়। বধূ, বিধবা, মা, কন্যা, সকলকেই হয় কৃষিক্ষেত্রে না হয় জলাশয় খনন, সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি কাজে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত থাকিতে হয়, আর এইভাবে তাহারা স্বামী, পুত্র বা পিতার স্বল্প আয়জনিত

ঘাটতি পুরণ করে। সরকার যদি কোন রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, অথবা গ্রামের জমিদার যদি জলাশয় খননে অগ্রসর হন, বাউরি পুরুষ ও স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করে; পুরুষ কোদালি চালায় আর স্ত্রী মাটির ঝুড়ি বহন করে। অনেক সময় বা পুরুষ কাজ করে স্ত্রী গ্রামের বাজারে বা হাটে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে যায়। দৈনন্দিন ব্যাপারে এই সব নারীর জীবন যে দুঃখের নহে তাহা ইহাদের সবল সুস্থ দেহাবয়ব ও আনন্দোৎফুল্ল মুখই পরিচয় দেয়। কিন্তু স্বামী যদি মত্ত অবস্থায় গৃহে ফিরে, তবে স্ত্রীর পক্ষে তাহা মোটেই সুখকর হয় না; স্ত্রী প্রহারের রীতি বর্ণ-হিন্দু অপেক্ষা অর্ধ-হিন্দুর মধ্যে অধিকতর মাত্রায় প্রচলিত।"

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম দরিদ্র শবর-জীবনের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, এই শ্রেণীর জীবনধারা তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়ঃ

" * * * *

"ভাঙ্গা কুড়া ঘরখানি পত্রের ছাউনি।
ভেরেণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা
চালুসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা।
ফুল্লরার কত আছে করমের ফল
মাটিয়া পাথর বিনে অন্য নাহি স্থল।
দুঃখ কর অবধান
দুঃখ কর অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।"

জন-স্বাস্থ্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্ধমান-হুগলির সংলগ্ন জিলার পুর্বভাগ হইতেছে এক খণ্ড বিশাল সমতল নিম্নভূমি। প্রাকৃতিক কারণে ইহার এক বিস্তৃত অঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ সময় জলাকীর্ণ থাকে। তারপর এই অঞ্চলে আছে বহু প্রাচীন ও অব্যবহার্য জলাশয়। এক সময় জিলার এই অংশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কুখ্যাত ছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে "বর্ধমান জর" যখন এখানে প্রবেশ করে, বহু জনবহুল গ্রাম ধ্বংস হয়। বর্তমানে "বর্ধমান জর" বা ম্যালেরিয়া ব্যাধির প্রাবল্য নাই বটে তথাপি ইন্দাস, পাত্রসায়র, সোনামুখী, কোতুলপুর ও জয়পুর থানার অস্বাস্থ্যকর খ্যাতি দূরীভূত হয় নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম-পাদ পর্যন্তও ম্যালেরিয়া-জনিত লোকক্ষয় জন্মহারকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান থাকে। ইং ১৮৯৭ সাল হইতে ১৯০১ সাল ও ১৯০১ সাল হইতে ১৯০৭ সাল এই দুই সময়ের জিলার জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে জন্মের হার সাঁওতাল, বাউরি প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু সাধারণের মধ্যে সেইরূপ পায় নাই; ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে জিলার পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে সাঁওতাল প্রভৃতির আধিক্য তথায় ম্যালেরিয়া প্রবেশ করে নাই। প্রাকৃতিক কারণে এই অঞ্চল স্বাস্থ্যকর, বদ্ধ জলাও সেখানে নাই।

অস্বাস্থ্যকর পূর্বাঞ্চল

ম্যালেরিয়া

কালক্রমে যদিও ম্যালেরিয়া ব্যাধির উগ্রতা ও সদ্য-মারণ ক্ষমতার লাঘব হয়, বহুকাল পর্যন্ত ইহার প্রকোপ পূর্ব অঞ্চলের পল্লী ও নাগরিক জীবনের অভিশাপ স্বরূপ রহিয়া যায়। ম্যালেরিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীকে নিস্তেজ, নির্বীর্য ও স্বাস্থ্যহীন করে। ইং ১৯০৮ সালের জেলা গেজেটিয়ারে ইহার বিজয় অভিযানের উল্লেখ আছে; ১৯২০ সালের সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট বা বিবরণী হইতে ইহার নিদারুণ প্রকোপের পরিচয় পাওয়া যায়। ইং ১৯৪৪ সালের সরকারী কৃষিতথ্য বিবরণীতেও (Agricultural statistics) ইহার বিস্তার ও প্রাখর্যের উল্লেখ আছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-নিবৃত্তির জন্য ডাঃ বেণ্টলি

ম্যালেরিয়া নিরোধার্থে কর্ম-পন্থা ও ইহার ফল

(Dr. Bentley) প্রমুখ বহু মনস্বী গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাধি নিরোধার্থে কয়েকটি কর্ম-পন্থার ইঙ্গিতও তাহারা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন কার্যকরী কর্ম-সূচী বিগত মহাযুদ্ধের পুর্বে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হয় নাই বলিলেই চলে। এই সময় কয়েকটি ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অঞ্চলে অবস্থিত সৈন্য বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী বিশদভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং এই কর্মসূচীর মধ্যে ছিল আবদ্ধ-জল নিষ্কাশন, সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা, ডি.ডি.টি. প্রভৃতি প্রয়োগে মশককুল নিধন। প্রথমে সামরিক কেন্দ্রেই এই কর্মসূচীর প্রবর্তন হয়, পরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইহার প্রসার হয়। এই কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য অসামরিক কর্তৃপক্ষ ইহা গ্রহণ করেন। ইং ১৯৪৭ সালের পর কর্মসূচীকে আরও শক্তিশালী করা হয় ও ইহার সহিত উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, নূতন নূতন চিকিৎসা কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিও করা হয়। বদ্ধ-জল নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম-পন্থার উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়। এইভাবে বরজোরা, সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর, জয়পুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কুখ্যাত অঞ্চলসমূহ ক্রমে ক্রমে ম্যালেরিয়া মুক্ত হয়।

ম্যালেরিয়া ব্যতীত আরও কয়েকটি ব্যাধি বহুকাল ধরিয়া জিলার অধিবাসীর সন্ত্রাস জন্মাইয়া আসিয়াছে; ইহারা হইল কলেরা, আন্ত্রিক জ্বর, আন্ত্রিক পীড়া।

অন্যান্য ব্যাধি

জিলার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশে ইহাদের আবির্ভাব হয় নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন অধিকাংশ কূপ, ইন্দারা বা পুষ্করিণী হয় শুষ্ক বা জলপানের অনুপযুক্ত। পানীয় জলাভাব ছাড়াও জীবন যাত্রার নিম্নস্তর, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যবিধি পালনে অজ্ঞতা বা অবহেলা, প্রভৃতি এই সকল ব্যাধির বিস্তারে সাহায্য করে। বসন্ত প্রভৃতিও সময় সময় পল্লী ও নাগরিক জীবনের সন্ত্রাসের কারণ হয়। উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা কলেরা ও বসন্তের আক্রমণকে কিছু পরিমাণে সংযত করা হইয়াছে কিন্তু আন্ত্রিক জ্বর, আন্ত্রিক পীড়া প্রভৃতির প্রকোপ শিথিল হয় নাই। ইং ১৯৪৬ হইতে ইং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কয়েকটি বিশেষ ব্যাধির আক্রমণজনিত মৃত্যু- হারের চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল:

বৎসর	কলেরা	বসন্ত	ম্যালেরিয়া	আন্ত্রিক ও অন্যান্য জর	উদরাময়	আন্ত্রিক পীড়া
১৯৪৬	২২০	১৮৮	৪০৬৬	৯৬৩৬	৭৪৭	৩০
১৯৪৭	৫৩২	২২	৫৩৬১	১১২৮১৯	৩৬	৩৮
১৯৪৮	৩১৬	১৪০	৪৯৭৩	১০৭৬১	৯১১	৭০
১৯৪৯	২৮৩	৮	৫৩০০	৯৪৮৩	৭৮৯	৭৭
১৯৫০	৪১৬	২০৩	৪২৩৫	৯৪১৮	৭৬১	৯৭
১৯৫১	১২৪	১৩৭১	১৭২০	৭১৮৮	৬১৩	১৪৭
১৯৫২	১৩৯	২০৫	১৩৫২	৬৩৩৫	৬৪৬	১৬৪
১৯৫৩	২০৫	৫	১০৪৩	৬৯১৪	৫৭৪	১৭৭
১৯৫৪	৩৯	৬১	৬০৭	৬৯০৬	৬৪২	২০৩
১৯৫৫	১০০	১৫	৫৬৬	৭১৩৫	৬২৭	২৩১
১৯৫৬	২৮৩	৬১	৪২২	৭১০৭	৭৬২	৩০৭
১৯৫৭	২৩২	১৪২	৩৮৬	৯২৫৩	১১৪১	৩৮৮
১৯৫৮	৯০	৩৫৬	২৯৫	৭৯৩৫	৮৩৫	২৬৭
১৯৫৯	২০৯	২০৫	৩৮৭	৪০৫৭	...	৩৬৭
১৯৬০	৬৯	৭	৩০১	...	৬৪৮	...

জনসাধারণের চিকিৎসার সুবিধার জন্য জিলায় আছে ৬টি নানা শ্রেণীর হাসপাতাল ও ৪৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ইহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

হাসপাতাল প্রভৃতির পরিচয়

ক। হাসপাতাল

বাঁকুড়া জিলা হাসপাতাল, বাঁকুড়া

সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বাঁকুড়া

মহকুমা হাসপাতাল, বিষ্ণুপুর

অতিরিক্ত সাধারণ হাসপাতাল	সিমলাপাল
ঐ	খাতরা
ঐ	পেয়ার-ডোবা

খ। স্বাস্থ্য কেন্দ্র

থানা	সংখ্যা
বাঁকুড়া	২
ওঁদা	৫
বরজোরা	৪
তালডাংরা	৫
মেজিয়া	২
রাণীবাঁধ	১
জয়পুর	৩
কোতলপুর	৬
সোনামুখী	৩
পাত্রসায়র	৩
শালতোড়া	৩
গঙ্গাজলঘাটি	৩
ইন্দপুর	১
বিষ্ণুপুর	২
রায়পুর	১
ইন্দাস	১

দাতব্য চিকিৎসালয় বা ডিসপেনসরির সংখ্যা ১৮।

এইসব ছাড়াও রাত্রিতে জ্বরের সহিত দেহের অঙ্গ বিশেষের স্ফীতি, গোদ ও কুষ্ঠ-রোগ কোন কোন অঞ্চলের এক সাধারণ ব্যাধি হিসাবে বহুকাল ধরিয়া বিদ্যমান আছে।

জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই জিলায় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা যে সর্বাধিক ইহা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইং ১৯৫৭ সালে কুষ্ঠ-ব্যাধি সংক্রান্ত এক পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ইহাতে দেখা যায় যে প্রায় সর্বশ্রেণীর মধ্যেই এই রোগ বিস্তারের প্রবণতা আছে। সাধারণের বিশ্বাস যে কুষ্ঠরোগ পুর্ব-পুরুষ হইতে সংক্রামিত হয় ও ইহা সংক্রামক। এ-

কুষ্ঠ-রোগ

কথাও বলা হয় যে অপরিষ্কার মাংসের অত্যধিক আহার রোগের একটি প্রধান কারণ এবং দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা হয় যে মাংসাহারী মুসলমান, বাউরি ও আদিবাসী

সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার বিস্তার বেশী। কুষ্ঠরোগ বিশেষজ্ঞগণ এইসব কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, জীবনযাত্রার নিম্নস্তর, কুষ্ঠ-রোগীর সহিত নিবিড় সংস্পর্শ প্রভৃতি এই রোগ বিস্তারের সহায়ক। এই জিলায় রোগের ব্যাপক বিস্তারের কারণ নির্ণয় করা কিন্তু কঠিন। দেখা যায় যে ইহার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ও তৎসংলগ্ন পুরুলিয়া জিলার কয়েকটি অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সমধিক। বিশেষ এক শিলাস্তর বা কঙ্কর বহুল অঞ্চলের অধিবাসীগণ কি কারণে যে এই রোগ-প্রবণ হয় এবং অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন সাঁওতাল শ্রেণীর মধ্যেই বা কেন এই রোগ বিস্তৃত হয়, সে সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

ইহা স্বীকার্য যে খৃষ্টান মিশনরী সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম কুষ্ঠ-রোগ সম্বন্ধে অবহিত হন ও ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হন। গ্রামে, শহরে, হাটে, বাজারে ভিক্ষার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তের দল তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইং ১৯০১ সালে রে. আম্বেরি স্মিথ (Rev. Ambery Smith) নামে একজন খৃষ্টান পাদরি বাঁকুড়ায় ছিলেন। কুষ্ঠ-রোগীদের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিচলিত হন ও ইহার উন্নতিকল্পে তিনি Mission to Lepers in India and the East নামক এক বিলাতি সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডের ব্রাইটনবাসী মিসেস্ ব্রায়ান নামে একজন উদার-চেতা মহিলা বাঁকুড়ায় একটি কুষ্ঠাশ্রম ও একটি গীর্জা নির্মাণের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তদনুসারে কুষ্ঠ-রোগীদের জন্য কয়েকটি আবাসগৃহ নির্মিত হয়। কিন্তু বহুদিন যাবৎ কোন কুষ্ঠ-রোগী এখানে স্থান গ্রহণ করে নাই কারণ তাহাদের ধারনা ছিল যে ইহা করিলেই তাহারা খৃষ্টান হইয়া যাইবে। তারপর কিন্তু রোগী আসিতে আরম্ভ করে এবং ইং ১৯০৭ সালে ৫৬ জন পুরুষ, ৪৩ জন স্ত্রীলোক ও ৭টি শিশু সন্তান এইসব বাসগৃহে স্থান লাভ করে। ইহার দুই বৎসর পর জ্যাকসন (Jackson) নামে একজন ইংরেজ তাঁহার শিশু সন্তানের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি কুষ্ঠাবাস নির্মাণ করেন; ইহার নামকরণ হয় এডিথ হোম (Edith Home)। এই কুষ্ঠাবাসটির সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার উপরোক্ত মিশন গ্রহণ করে।

কুষ্ঠ-রোগ প্রশমনে মিশনরীগণ

বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এইভাবে কুষ্ঠ-রোগীদের চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা চলিতে থাকে। পরে সরকার হইতেও এই প্রচেষ্টা

অনুসৃত হয় এবং বাঁকুড়ার অনতিদূরে গৌরীপুরে এক বিরাট কুষ্ঠাবাস ও কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। গৌরীপুর কুষ্ঠাবাসের অধীনে দুইটি শাখা চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি শানবাঁধায় ও অপরটি মনোহরপুরে। গৌরীপুরে একটি কুষ্ঠ তদন্ত কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। আবাসিক রোগী ছাড়াও গৌরীপুরে বহু অনাবাসিক রোগীর চিকিৎসা হয়। ইহা ভিন্ন জিলায় বহু কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র বা ক্লিনিক আছে; ইহাদের পরিচয় নিম্ন রূপ :

সরকারী প্রচেষ্টা

কুষ্ঠ-চিকিৎসা কেন্দ্র

থানা	কুষ্ঠ-চিকিৎসা কেন্দ্র
বাঁকুড়া	১। লোকপুর চিকিৎসা কেন্দ্র
	২। কালাপাথর ,,
	৩। কাঞ্চনপুর ,,
	৪। রাধানগর ,,
ইন্দপুর	১। ইন্দপুর ,,
ওঁদা	১। ওঁদা চিকিৎসা কেন্দ্র
	২। রামসাগর ,,
	৩। রতনপুর ,,
শালতোড়া	১। সালমা ,,
	২। শালতোড়া ,,
সিমলাপাল	১। সিমলাপাল ,,
খাতরা	১। মসিয়ারা ,,
তালডাংরা	১। তালডাংরা ,,
বরজোরা	১। ছাঁদর ,,
	২। মালিয়ারা ,,
	৩। হরিরামপুর ,,
রাণীবাঁধ	১। রাণীবাঁধ ,,
গঙ্গাজল ঘাটি	১। গঙ্গাজল ঘাটি ,,
	২। কুসথল ,,
রায়পুর	১। মঠ গোদা ,,
	২। কোনারপুর ,,

থানা		কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র	
রায়পুর	৩।	রায়পুর	,,
সোনামুখী	১।	পাথরমুরা	,,
	২।	ধুলাই	,,
	৩।	সোনামুখী	,,
পাত্রসায়র	১।	পাত্রসায়র	,,

যাবতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্রে ইং ১৯৫৮ সাল হইতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত যে সকল কুষ্ঠ-রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা এইরূপ :

	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩
আবাসিক	৩৩৩	১৪০	২০৮	২০৫	২৬০	২৮৭
অনাবাসিক	১১৭১	২৫৭৭	২১১৩	৩৩৩৭	৪২৪২	৩৭৬৮

বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ রোগের ব্যাপকতা ইহা হইতেই উপলব্ধি হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাঁকুড়া

বহু মনস্বী পণ্ডিতের বাসভূমি এই বাঁকুড়া। মধ্যযুগের কাব্যে ও সাহিত্যে যে প্রতিভার ও পাণ্ডিত্যের বিকাশ দেখা যায় তাহা পরবর্তী যুগে অক্ষুণ্ণ থাকে। বড়ু চণ্ডিদাস ও মঙ্গলকাব্যের কবিগণের উল্লেখ পুর্বে করা হইয়াছে। শেষোক্তগণের মধ্যে ধর্মমঙ্গল প্রণেতা মানিকরাম গাঙ্গুলি ছিলেন মল্লভূমের বেলডিহার অধিবাসী।

পণ্ডিতবহুল বাঁকুড়া

অন্য একজন ধর্মমঙ্গল রচয়িতা সীতারাম ছিলেন ইন্দাসের লোক। ধর্ম-মঙ্গল প্রণেতা প্রভুরাম ও গোবিন্দরামও ছিলেন মল্লভূমের অধিবাসী। কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, মল্লরাজ বীরসিংহের সম-সাময়িক। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ ছাড়াও তিনি শিবমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থও একখানা পাঁচালি রচনা করেন। প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। রাজা গোপালসিংহের সম-সাময়িক কাশীনাথ বাচস্পতি ছিলেন অন্য একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। মল্লরাজ-গণের রাজ্যলোপের সহিত বিদ্বান সমাজের অবনতি ঘটিলেও ইন্দাস, জয়পুর প্রমুখ অঞ্চলে পাণ্ডিত্য গৌরব বহুকাল যাবৎ বিদ্যমান থাকে। বর্তমান যুগেও এই পাণ্ডিত্য এ জিলায় অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির বাহন ছিল চতুষ্পাঠী বা টোল। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বালকের জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, ইহার অধ্যক্ষও থাকিতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। চতুষ্পাঠী ছিল আবাসিক, ছাত্র বা পড়ুয়াগণ এখানে বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িত। শিক্ষা আরম্ভ হইত সংস্কৃত ব্যাকরণে। ব্যাকরণ পাঠ সমাপন হইবার পর সাহিত্যের অধ্যাপনা হইত, তারপর কেহ পড়িত ন্যায়, কেহ বা স্মৃতি। কোন কোন ছাত্র আবার জিলার বাহিরে নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলেও পড়িতে যাইত। অনেকে আবার যাইত দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিতে মিথিলা, ব্যাকরণ অলঙ্কার ও বেদ পড়িতে যাইত কাশী। শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া নিজেরাই চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা করিত।

প্রাচীন শিক্ষার ধারা
টোল

সাধারণ গৃহস্থ বালকের শিক্ষার জন্য ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা। পাঠশালায় প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাসের সহিত অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইত। অধিকাংশ বালকই পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া নিজ নিজ পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজ-সেরেস্তায় বা স্থানীয় জমিদারের অধীনে কর্ম-সংস্থান করিত। মুসলমান বালকের শিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা ও মক্তব। চতুষ্পাঠীর ন্যায় মাদ্রাসা ছিল আবাসিক, এখানে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা বিনাব্যয়ে মিলিত। মাদ্রাসায় মৌলবী সাহেব কোরান, হদিস এবং আরবী ও পারসী সাহিত্য শিক্ষা দিতেন।

পাঠশালা

মাদ্রাসা ও মক্তব

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে জিলায় তৎকালোপযোগী নানা শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। উইলিয়ম অ্যাডাম্‌স্ (William Adams) নামে একজন ইংরেজ ইং ১৮৩০ সালে বাংলা-বিহারে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে এক ইন্দাস থানা অঞ্চলেই পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৪৩, চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ৬। আরবী ও পারসীর জন্য ছিল ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষালাভের জন্য সাধারণের মধ্যে উৎসাহের আধিক্য ছিল না বলিয়া মনে হয়। ইং ১৮৪৭ সালের এক সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে তখন পল্লী অঞ্চলে খুব অল্প-সংখ্যক লোকই লিখিতে বা পড়িতে জানিত; শহর অঞ্চলে মাত্র ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকগণ সাধারণ হিসাবে বুৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িত। এই হিসাব শিক্ষা অবশ্য হইত শুভঙ্করী মতে। কর্নেল গ্যাসট্রেল (Gastrel) নামে অন্য একজন ইংরেজ ইং ১৮৬৩ সালে Statistical Report of Bankura প্রকাশ করেন; তখন দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে সেই সময় সরকার প্রতিষ্ঠিত বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২ টি, ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৬৭। শিক্ষাবিষয়ে সাধারণের উৎসাহ না থাকায় বিদ্যালয়গুলির অবস্থা ছিল নিতান্ত-হীন। গ্যাসট্রেল সাহেব বলেন যে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা দূরে থাকুক, এ বিষয়ে চিন্তাও ছিল না। তিনি অবশ্য আশা করিয়া গিয়াছেন যে যেখানে এইরূপ অন্ধকার, সেখানে সামান্য একটু আলোকের

শিক্ষা—ইং ১৮৩০ সাল

ইং ১৮৪৭ সাল

ইং ১৮৬৩ সাল

রেখাপাত ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দিনের পূর্বাভাস হিসাবে সানন্দে অভ্যর্থিত হইবে।

এই সময় বাঁকুড়ায় খৃষ্টান মিশনরী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। চার্চ মিশনরী সোসাইটির উদ্যোগে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ইহাদের সর্ব প্রধানটি হইল বর্তমানের জিলা স্কুল। ইং ১৮৭০ সালে ওয়েস্‌লিয়েন মিশন বাঁকুড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ইহা ছিল একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ইং ১৮৮৪ সালে চার্চ মিশনরী সোসাইটি ইহার কর্মক্ষেত্র বাঁকুড়া হইতে অপসৃত করে ও ইহার কর্ম-পন্থা গ্রহণ করে ওয়েস্‌লিয়েন মিশনরী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ইং ১৮৮৯ সালে উপরোক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত উচ্চতর শ্রেণী যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং ইং ১৮৯৯ সালে এই বিদ্যালয় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইহাই বর্তমানের বাঁকুড়া খৃষ্টিয়ান কলেজিয়েট স্কুল। ইং ১৯০৩ সালে এই বিদ্যালয়ে কলেজের পড়া আরম্ভ হয়; পরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কলেজ বিভাগ এক নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হয় ও কলেজের নামকরণ হয় ওয়েস্‌লিয়েন কলেজ। ইহার বর্তমান নাম বাঁকুড়া খৃষ্টিয়ান কলেজ। ইং ১৮৮৫ সালে ওয়েস্‌লিয়েন মিশনরীগণ দরিদ্র ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালকদের শিক্ষার জন্য একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করে। যদিও প্রথমে ইহা খৃষ্টান বালকদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, পরে অ-খৃষ্টান বালকগণও ইহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করে। ইহাই বর্তমানের বাঁকুড়া খৃষ্টান হোস্টেল। এই বৎসরেই দুঃস্থা খৃষ্টান বালিকা ও অনুন্নত শ্রেণীর আশ্রয়হীনা বিধবাদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়। এই স্কুলে তাহাদের নানাবিধ শিল্পকাজ শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্তমানে ইহা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এই সম্প্রদায়ের মিশনরীদের প্রচেষ্টায় রায়পুর, ফুলকুসমা, বারিকুল, সামদি, পলাশবনি, গোবিন্দপুর, কুলডিহা প্রভৃতি স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়; রায়পুর থানার সারেঙ্গায় সাঁওতাল বালকদের শিক্ষার জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় ও সাঁওতাল বালিকাদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিশনরী সম্প্রদায়

শিক্ষার অগ্রগতি

মিশনরী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার সহিত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা মিলিত

হইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সমূহ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ইং ১৮৮৬ সালে নানাজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পরিগণিত হয় ১৪১০, ছাত্রসংখ্যা ৩২২৪৩। ১৮৯১ সালে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয় ১৫৩৪ এবং ১৯০১ সালে ১৩০০; ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৯০৫৭ ও ৩৯০৯২।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে

১৯০১ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ছিল ৯০টি প্রাইমারি স্কুল। ১৯০৬ সালে জিলায় নানাশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পরিগণিত হয় ১৪০৭, ইহাদের মধ্যে একটি ছিল কলেজ ও ১৩টি ছিল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। এই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির পরিচয় এইরূপ :

মিশনরী পরিচালিত ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কুচ-কুচিয়া বিদ্যালয়। জিলার মধ্যে এইটি ছিল বৃহত্তম উচ্চ বিদ্যালয়।

সরকার পরিচালিত বাঁকুড়া জিলা স্কুল।

কুচিয়াকোল, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, সোনামুখী, পলাশভাঙ্গা, রোল, মালিয়ারা, বেলিয়াতোড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। এগুলি সরকারী সাহায্য পাইত না।

বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুল, রাজগ্রাম ও ইন্দাস উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। ইহারাও সরকারী-সাহায্য পাইত না।

এই সময় মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮। ইহাদের মধ্যে ২৫টি ছিল সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, একটি জিলাবোর্ডের পরিচালনায়। প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০৬৬, ইহাদের মধ্যে মাত্র ৭টি ছিল বালিকাদের জন্য। বালকদের জন্য যে ১০৫৯টি প্রাইমারি স্কুল ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৯০টি ছিল উচ্চ প্রাইমারি, অবশিষ্টগুলি ছিল নিম্ন প্রাইমারি। তাহা ছাড়া ছিল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য ৪টি বিদ্যালয়; ইহাদের দুইটি ছিল শিক্ষা বিভাগের অধীন ও অপর দুইটি ছিল মিশনরী পরিচালিত। মিশনরী পরিচালিত বিদ্যালয় দুইটির অবস্থান ছিল সারেঙ্গায়, ইহাদের একটি আবার ছিল মাত্র শিক্ষয়িত্রীদের জন্য। আর ছিল শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ৮৮টি নৈশ বিদ্যালয়।

নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়গুলির জন্য স্বতন্ত্র কোন গৃহ ছিল না; এগুলি বসিত কোন বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে বা বহির্বাটিতে। বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টির জন্য শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। অবশিষ্ট দুইটির শিক্ষণ কাজের জন্য ছিলেন পুরুষ শিক্ষক।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল ৮০টি চতুষ্পাঠী বা টোল, ১১টি মক্তব, ৫টি সঙ্গীত বিদ্যালয় ও মিশনরী পরিচালিত বাঁকুড়া টেকনিকাল স্কুল। ৮০টি টোলের মধ্যে মাত্র ১৫টি ছিল সরকার অনুমোদিত। টেকনিকাল স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইত কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, বয়ন এবং বেত ও বাঁশের শিল্প। মক্তবগুলি ছিল মুসলমান ছাত্রদের জন্য, এখানে আরবি ও পারসীর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত, প্রধানতঃ মুসলমান প্রধান অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এই মক্তব।

ইং ১৯৪১-৪২ সাল

ক্রমে উচ্চ শিক্ষার বিশেষতঃ ইংরেজী মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার চাহিদার সহিত নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে এবং ইং ১৯৪১-৪২ সালে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাদের সংখ্যা নিম্নরূপ :

কলেজ	১
উচ্চ ইংরেজী স্কুল	২৭
মধ্য ইংরেজী স্কুল	৭০
প্রাইমারি স্কুল	১৪৯৪
টেকনিকাল স্কুল	৮
গুরুট্রেনিং স্কুল	৩
অন্যান্য স্কুল	১২৯

ইং ১৯৫২ সাল

মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৬৮০৪। দেখা যায় যে ইতিমধ্যে টোল বা মক্তব মাধ্যমে শিক্ষা বিলুপ্তির পথে গিয়াছে। ইং ১৯৫২ সালে দেখা যায় যে শিক্ষাক্ষেত্রের বিশেষতঃ উচ্চতর শিক্ষার প্রসার হইয়াছে আরও বেশী। এই সময় যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দৃষ্ট হয় তাহাদের পরিচয়ই ইহা সমর্থন করে :

কলেজ	৩	
উচ্চ ইংরেজী স্কুল	৫৫	৩টি বালিকাদের জন্য
মধ্য „ „	৭৭	৩টি „ „
প্রাইমারি স্কুল	১০৮২	২২টি „ „
জুনিয়র বেসিক বা বুনিয়াদি স্কুল	৫	

টেকনিকাল স্কুল	৯	ইহাদের মধ্যে ৪টি বয়ন স্কুল, ৩টি ইনডাসট্রিয়াল বা শিল্প শিক্ষণ স্কুল, ১টি ইনজিনীয়ারীং ও ১টি কমার্শিয়াল স্কুল।
গুরু ট্রেনিং স্কুল	৩	মাত্র প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষণের জন্য।
সঙ্গীত বিদ্যালয়	৪	
„ কলেজ	১	
আদিবাসী প্রাইমারি স্কুল	১২৭	মাত্র সাঁওতালদের জন্য

তপশিলি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালকদের শিক্ষার জন্য ৫টি মধ্য ইংরেজী স্কুল ও ২টি উচ্চ ইংরেজী স্কুলও স্থাপিত দেখা যায়। ইহা ছাড়া কয়েকটি স্কুল ছিল যাহাদের মান মধ্য ইংরেজীর উপর কিন্তু উচ্চ ইংরেজী স্কুলের নিম্নে পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে। ইহাদের সংখ্যা ছিল ১৭।

১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যাবনতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয়ের[১] মতে ইহার কারণ অর্থনৈতিক। তিনি আরও বলেন যে স্কুলে যেসব বালক ভর্তি হয় তাহাদের অধিকাংশই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না এবং এই কারণে প্রাইমারি স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে অপারগ হয়। ইহা হইতে বোঝা যায় যে এই জাতীয় স্কুলে যে সকল বালক প্রবেশ করে তাহাদের এক বিরাট অংশ প্রায় নিরক্ষর পর্যায়েই রহিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ইং ১৯৫০ সালে জিলায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাইমারি শিক্ষার প্রবর্তন হয়।

বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বর্তমান সময়ে জিলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা এইরূপ :

কলেজ		৩	
মেডিকাল কলেজ		১	
উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল		৫৮	৩টি বালিকাদের জন্য
উচ্চ ইংরেজী	„	৫৭	২টি „ „
মধ্য ইংরেজী	„	১১৭	১৫টি „ „
প্রাইমারি	„	২২০৩	২০৪৮টি বালকদের জন্য ২৮টি বালিকাদের জন্য ১২৭টি সাঁওতালদের জন্য

(১) শ্রীঅশোক মিত্র—বাঁকুড়ার সেন্‌সাস্ রিপোর্ট ১৯৫১

নিম্ন বুনিয়াদি	”	৬৭	৯টি বালিকাদের জন্য
উচ্চ বুনিয়াদি	”	২৪	ঐ ঐ
গুরুট্রেনিং	”	৩	
উইভিং বা			
বয়নশিল্পের	”	৪	
ইনডাসট্রিয়াল	”	৩	
ইনজীনিয়ারীং	”	১	
কমার্শিয়াল	”	১	
সঙ্গীত	”	৪	
সঙ্গীত কলেজ	”	১	

তাহা ছাড়া আছে ৪৯টি চতুষ্পাঠী বা টোল ও একটি মাদ্রাসা।

জিলার অধিবাসীদের মধ্যে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৩ জন; ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা শতকরা যথাক্রমে ৩৬ ও ১০ জন। এ বিষয়ে সংলগ্ন বর্ধমান ও হুগলি জিলার সহিত তুলনা করিয়া একটি বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হইল:

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

জিলা	পুরুষ	নারী	গড়
হুগলি	৪৬.১	২১.৮	৩৪ ৭
বর্ধমান	৩৯.৪	১৮.১	২৯.৬
বাঁকুড়া	৩৬.২	৯.৭	২৩.১

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষায় বাঁকুড়ার নিকৃষ্ট স্থান লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ পর্ব

কৃষি ও শিল্প

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।"

—রবীন্দ্রনাথ

কৃষি ও প্রধান শস্য

জিলায় দুই অঞ্চলে প্রকৃতিগত প্রভেদ

প্রাকৃতিক কারণে জিলার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে যে প্রভেদ, কৃষির উপর তাহা প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্ব অঞ্চল বিশেষতঃ বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়র থানা ও সোনামুখী থানার অংশবিশেষ হইতেছে একটি বিশাল সমতল ভূমিখণ্ড, সংলগ্ন হুগলি-বর্ধমানের গাঙ্গেয় অববাহিকারই অনুরূপ। জমি উর্বর, পলি প্রধান। অবশিষ্ট অঞ্চলের বেশী-ভাগই হইতেছে অসমতল, শিলাবহুল; মাটিতে কাঁকরের ভাগ বেশী থাকায় ইহার উর্বরাশক্তি অপেক্ষাকৃত কম। এই অঞ্চলে আছে বনভূমির প্রাচুর্য, আর উন্নত-নত উচ্চভূমি শ্রেণীর অখণ্ড প্রসার। তরঙ্গায়িত ভূমিশ্রেণীর পাদ-দেশ ও দুই শ্রেণী উচ্চভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সমতল স্থানে শস্যের আবাদ হয়। বহু ছোট ছোট জল স্রোত এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে বৃহদাকার নদনদীর প্রবাহে বিলীন হইয়াছে।

আবাদি জমির প্রসার

কৃষিই অধিকাংশ অধিবাসীর মুখ্য অথবা গৌণ জীবিকা আর এই কারণেই কৃষির সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বার্থ ন্যূনাধিক জড়িত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন আবাদি জমির চাহিদা বাড়িয়াছে সেইরূপ আবার খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি, সেচন ও সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি অনাবাদি বা অনুর্বর জমিকে আবাদের উপযোগী করিয়া তুলিতে প্রেরণা দিয়াছে। ইহার ফলে অরণ্যভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, উচ্চভূমি সমতলভূমিতে পরিণত হইয়াছে, ঊষরভূমি শস্যোপযোগী হইয়াছে। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে এই ভাবে আবাদযোগ্য জমির আয়তন কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বৎসর	আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ
ইং ১৯০৮ সাল	৬২৭৪০০ একর
,, ১৯২০ ,,	৭৯৬৯২৬ ,,
,, ১৯৪০ ,,	৮২০০০০ ,,

বৎসর	আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ
,, ১৯৫০ ,,	৮৫৮১০০ ,,
,, ১৯৬০ ,,	৯০৭০০০ ,, (কমবেশী)

প্রধান শস্য

প্রধান শস্য ধান ; আক, আলু, নানাজাতীয় রবিশস্যও এখানে জন্মে। পাটের আবাদও হয়। নিম্নে এই সব বাবদ আবাদি জমির অনুপাত দেওয়া হইল :

ধান	'৮৯
আলু	'০২
আক	'০১
রবিশস্য	'০৬
পাট	'০২
	১০০'০০

প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের আবাদ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার আভাস নিম্নের বিবৃতি হইতে প্রকাশ পাইবে :

খাদ্যশস্য	ইং ১৯০৮ সাল	ইং ১৯২০ সাল	ইং ১৯৪০ সাল	ইং ১৯৫০ সাল	ইং ১৯৬০ সাল
ধান	৫২৯৭০০ একর	৭১৮৩৪২ একর	৭৬৪৭৮২ একর	৮১৭৫০০ একর	৮২০০০০একর (কমবেশী)
আলু ...		২০২২ ,,	২৬২৭ ,,	৪১০০ ,,	৪২০০ ,,
ডাল কলাই ইত্যাদি		৪৪৭৫৯ ,,	৩৯৪৬৫ ,,		৫০০০০ ,,
আক ...		৩০৫১ ,,	২৩৪৫ ,,	৩১০০ ,,	৩৭০০ ,,

ধান চাষের প্রসার বৃদ্ধি লক্ষণীয়। ইহার জন্য প্রধানতঃ অরণ্যভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া আবাদযোগ্য ভূমিতে রূপান্তর করা হইয়াছে ; সাঁওতাল প্রধান অঞ্চলেই রূপান্তর বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। পতিত জমি আবাদ-যোগ্য হইবামাত্র ইহা উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনের উপযোগী হয় না এবং এই কারণে প্রথম কয়েক বৎসর এই জমিতে কোদো প্রভৃতি নিকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করার রীতি আছে। ইহাতে জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পরে তাহাতে ধান প্রভৃতি উন্নত ফসল আবাদ করা যায়।

ধানের মধ্যে আমনের স্থান সকলের উপর। ইহার পর স্থান হইল আউশের,

তারপর বোরোর। জিলায় বহুজাতীয় আমন ধানের চাষ হয়, যেমন রঘুশাল, রামশাল, সীতাশাল, কলমকাটি, নাগরা, মধুমালতি, গোপালভোগ, চন্দনশাল, বেনাফুল, বাদ কলমকাটি, নোনা রামশাল, ঝিঙ্গাশাল, কাশিফুল, নগদিশাল, জটাকলমা, কার্তিক কলমা বাদশাভোগ, খাসকাঁদি, সিন্দুরমুখী, ভাসা কলমা ইত্যাদি। নীচু এঁটেল জমি আমন চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। যেখানে জল বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা করা যায় না বা যেখানে জল সেচনের সুবিধা নাই, এইরূপ জমি আমন চাষের পক্ষে অনুপযোগী। পূর্বাঞ্চলের শালি জমিতে ও পশ্চিম অঞ্চলের বাহাল বা শোল জমিতে আমন জন্মে। পশ্চিম অঞ্চলের কানালি জমিতেও আমনের আবাদ হয়, কিন্তু সফলতা নির্ভর করে জল আবদ্ধোপযোগী সুদৃঢ় বাঁধ বা মোটা আইলের ও জলসেচনের সুবিধার উপর।

আমন ধান

আমন চাষের জন্য নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল বলা যাইতে পারে:

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাল এক পসলা বৃষ্টি; ইহাতে জমি তৈয়ারী ও যথাসময় বীজ ধান বপনের সুবিধা হয়।

আষাঢ়-শ্রাবণে পর্যাপ্ত বৃষ্টি; চারা-ধান রোপণের পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজন।

শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে পরিষ্কার আকাশ; জমি নিড়াইবার পক্ষে ও জমি হইতে অতিরিক্ত জল নিকাশের জন্য ইহা আবশ্যক।

ভাদ্র মাসে ধানের শিস্ বাহির হইবার সময় প্রচুর জল এবং আশ্বিন মাসে মাঝে মাঝে বৃষ্টি।

বর্ষাকালের বৃষ্টির উপর আমন ধানের চাষের সফলতা প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু এই বৃষ্টির পরিমাণ পর্যাপ্ত হইলেও ইহা যদি সময়োচিত না হয় অথবা ইহার বণ্টনে যদি অসামঞ্জস্য থাকে তবে ফসলের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক কারণে জিলার ভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমতল; মাটি বৃষ্টির জল আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, ইহা অতি শীঘ্র বাহির হইয়া যায়। সুতরাং এখানে সময়োপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। যথাসময়ে বৃষ্টির অভাব বা বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও অনাবৃষ্টি এই জিলায় বহুবার তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

আমন জমিতে সার প্রয়োগের রীতি আছে। পুকুরের পাঁক, গোবর,

আবার কখনও বা খইল সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে রাসায়নিক সারের বহুল প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু জমিতে যদি বেশী পরিমাণে জল জমে অথবা যদি অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়, প্রদত্ত সার জলের সহিত বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে—এবং এই কারণে কৃষক কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ এক সময়ের পর জমিতে সার দিবার পক্ষপাতী হয় না।

আউশের সাধারণ প্রকৃতি হইতেছে যে ইহা মোটা ও দুষ্পাচ্য। সাধারণত দরিদ্র শ্রেণীই আউশ চাউল বেশী ব্যবহার করে। আউশ এমন এক সময় জন্মে যখন বাজারে খাদ্যশস্যের আমদানি থাকে কম। আউশের

আউশ ধান

আবাদ হয় সাধারণত উঁচু জমিতে বা নদীসংলগ্ন স্থানে; জমিতে আমন অপেক্ষা কম জলের আবশ্যক হয়। পশ্চিম অঞ্চলের বাইদ বা ডাঙা জমি, পূর্ব অঞ্চলের শুনা জমি, দামোদর, দারকেশ্বর ও শিলাইএর চরভাগ আউশ চাষের পক্ষে উপযুক্ত। আউশ চাষ হয় দুই ভাবে, বীজ ছড়াইয়া ও রোপণ প্রথায়। কয়েকটি অতিরিক্ত মোটা পর্যায়ের আউশের চাষ হয় বীজ ছড়াইয়া, অবার নেয়ালি, কার্তিকশাল, কেলে প্রভৃতির চাষ হয় আমন ধানের ন্যায় রোপণ প্রথায় এবং আমনের ন্যায়ই ইহাদের চাষে একটু বেশী পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়। আউশের ফলনে প্রায় তিন মাস লাগে কিন্তু কোন কোন জাতীয় আউশ দুই মাসেই কাটিবার উপযুক্ত হয়, চলতি কথায় ইহাদের বলা হয় "সেটে"। সেটে আউশ পাকিবার সময় শ্রাবণ মাস, অন্যান্য কয়েকটি মোটা আউশ পাকে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। নেয়ালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম মোটা আউশের পাকিবার সময় কার্তিক-অগ্রহায়ণ। আউশ জমিতেও সার দিবার প্রচলন আছে এবং সাধারণত গোবর, পুকুরের পাঁক, ছাই ও গৃহের অন্যান্য আবর্জনা সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোল আলু কিম্বা আক উঠিয়া যাইবার পর যদি সেই জমিতে আউশের চাষ হয় তবে আর সারের প্রয়োজন হয় না। নদীতীরের জমিতে পলির ভাগ বেশী, সেখানেও সার দেওয়া হয় না।

বোরো ধান মোটা পর্যায়ের, সম্প্রতি ইহার আবাদ প্রসার লাভ করিতেছে। এই ধান চাষের জন্য প্রয়োজন নীচু ও সরস জমি। খাল, সংকীর্ণ নদী স্রোত বা জলবাহী নালা বরাবর বাঁধ দিয়া আবদ্ধ জল সংলগ্ন

বোরো ধান

আবাদোপযোগী জমিতে সঞ্চয় করিয়া এই জমি বোরো চাষের উপযুক্ত করা হয়, আবার নীচু বিলের গর্ভেও বোরো ধানের

আবাদ হয়। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে জমিতে বীজ ধান বপন করা হয় ও চৈত্র বৈশাখে ধান কাটিবার উপযুক্ত হয়।

ধানের ন্যায় আলুর চাষেরও প্রসার হইতেছে। আলুর পক্ষে উপযুক্ত জমি হইতেছে উৎকৃষ্ট দোআঁশলা মাটি। যে মাটিতে বালির ভাগ বেশী অথবা যে মাটি কাঁকর মিশ্রিত বা এঁটেল, তাহাতে আলু জন্মে না ও এই কারণে জিলার পূর্ব অঞ্চলের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানেই আলুর চাষ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। আলু বসাইবার প্রকৃষ্ট সময় হইতেছে ভাদ্র মাসের শেষ ভাগ হইতে আশ্বিনের মধ্যভাগ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তবে বীজ বসাইবার ১০ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে জমিতে জল সেচন আবশ্যক হয়। জলসেচনের সুবিধার জন্য সাধারণতঃ কোন জলাশয়ের নিকটস্থ জমি আলু চাষের জন্য নির্ধারিত হয়। আবদ্ধ জল আলুর পক্ষে ক্ষতিকর সুতরাং যদি মরসুমের প্রথম দিকে বীজ রোপণ করিতে হয়, জমির অবস্থান উচ্চ হওয়া ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। জল পাইবার পর অঙ্কুর বাহির হইতে থাকে। চারা সামান্য বড় হইলেই, ইহার গোড়ায় মাটি দেওয়া হয়; তারপর দুই সপ্তাহ পর পর দুইবার জল সেচন করিয়া আবার মাটি দিতে হয়। জমি যদি শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হয় তবে ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হইতে পারে। বীজ বসাইবার পর প্রায় তিন মাসের মধ্যে আলু উঠিবার উপযুক্ত হয়, এই সময় গাছ ও পাতা শুকাইতে থাকে। অনেক সময় ইহার পূর্বেই আলু তোলা হয় কিন্তু এই অবস্থায় অতি সাবধানে গাছের নীচে গর্ত করিয়া মাত্র যে আলু তুলিবার উপযুক্ত মনে হয় মাত্র সেগুলিই তোলা হয়, তারপর মাটি দিয়া গর্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে অবশিষ্ট যে আলু থাকে তাহাদের বৃদ্ধির কোন বাধা না হয়। এই কাজ কষ্টসাধ্য হইলেও কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়, কারণ, বাজারে আলুর মূল্য-বৃদ্ধি থাকে।

আলু

আলুর জমিতে সাধারণতঃ যে সার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহা হইল রেড়ির খইল সহ হাড়ের গুড়া, পচা গোবর ও রাসায়নিক সার। কৃষকদের অনেকে আবার রেড়ির খইলের পরিবর্তে সরিষার খইল পছন্দ করে। নানা জাতীয় আলু বীজের প্রচলন আছে যেমন দেশী, নৈনিতাল, মাদ্রাজি, পাটনাই। সাধারণ কৃষকের নিকট নৈনিতাল বীজই সমাদৃত।

আকের চাষ জিলার প্রায় সর্বত্রই হয়। পশ্চিম অঞ্চলের বাইদ জমি ও পূর্ব

অঞ্চলের শুনা জমি আক চাষের জন্য প্রশস্ত। দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাই প্রভৃতি নদনদী সংলগ্ন ভূভাগে, খাল বা অন্যান্য জলাশয়ের পার্শ্বস্থ ভূমিতেও আকের আবাদ হয়।

আক

আক চাষের জমি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচিত হইয়া থাকে

জমির নিকট সেচন উপযোগী জলাশয় আছে কি-না ;
জমি বর্ষার প্লাবন-সীমার বাহিরে কি-না ;
জমিতে জল নিকাশের সুবিধা আছে কি-না।

আকের চারা বসাইবার প্রকৃষ্ট সময় হইতেছে মাঘ-ফাল্গুন মাস ; কিন্তু দেখা যায় যে সাধারণতঃ চৈত্র মাসে চারা বসান হইতেছে। পর-বৎসর পৌষ হইতে বৈশাখের মধ্যে আক কাটিবার সময়। চারা বসাইবার পুর্বে জমি লাঙ্গল দিয়া চাষ করা হয় ও পরে মই দিয়া ইহা সমান করা হয়। তখন জমিতে জল সেচনও প্রয়োজন হইতে পারে। চারাগুলি বসান হয় সারিবদ্ধভাবে, দুই পার্শ্বে কাটা হয় অগভীর নালা। চারা বসাইবার পর আবার জলসেচন হয় এবং বর্ষা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত জমিতে প্রয়োজনমত জলসেচন ও সঙ্গে সঙ্গে চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া কৃষকের পক্ষে অবশ্য করণীয়।

আকের জমিতে সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সাধারণত খইল, গোবর, হাড়ের গুড়া ও ফসফেট জাতীয় সার দেওয়া হয় কিন্তু বহু কৃষক মাত্র গোবর ও খইল প্রয়োগের পক্ষপাতী। জমি প্রস্তুতের পুর্বেই ইহাতে গোবর জমা করা হয়, তারপর লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার সময় এই গোবর মাটির সহিত মিশিয়া যায়। খইল প্রয়োগ হয় চারা বসাইবার পুবে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ইহারও পুর্বে খইল দেওয়া হয়। সাধারণ কৃষক রেড়ির খইলই বেশী পছন্দ করে।

জিলায় বিশেষতঃ ইহার পুর্বভাগে নানা প্রকার ডাল জন্মে। খেসারী, ছোলা, অরহর, কলাইএর চাষই বেশী। গম, ভুট্টা, যব, পটল, সরিষা, কফি, ডিংলা ও নানাজাতীয় শাকসবজিও উৎপন্ন হয়। সরিষা চাষের প্রসার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

অন্যান্য ফসল

জিলা সাধারণতঃ এক ফসলি কিন্তু একই জমিতে বৎসরে একাধিক উৎপাদন বিরল নহে। দেখা যায় যে আক কাটা হইবার পর সেই জমি লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া তাহাতে তিল বা ঐরূপ কোন ফসল জন্মান হয়, আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ফসল উঠিয়া গেলে জমিতে আবার লাঙ্গল দিয়া আউশ ধান উৎপন্ন

করা হয়। ভাদ্র মাসে আউশ ধান কাটার পর জমিতে আবার লাঙ্গল দিয়া কলাই কিম্বা সরিষার আবাদ হয়। পৌষ মাসে এই ফসল উঠিয়া গেলে জমি আক চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন কোন জমিতে আবার আকের পরই আউশ ধান বপন হয়; আউশের পর আলু বা কলাই উৎপন্ন করিয়া জমি আবার আক চাষে নিয়োজিত হয়।

শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ও ইহার প্রতিকার

শস্য উৎপাদনে কৃষকের প্রধান সহায় হইতেছে আকাশের জল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনোপযোগী হইলেও, যেখানে ভূপৃষ্ঠ অসমতল সেখানে যে ইহার এক বৃহদংশ অগণিত স্রোতধারা বাহিয়া বাহির হইয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। আবার বৃষ্টিপাত যদি সময়মত বা প্রয়োজন মত না হয় তবে পূর্বাঞ্চলের উর্বর সমভূমিতেও শস্যহানির আশঙ্কা থাকে। যথাসময়ে বৃষ্টির অভাব বা বৃষ্টিপাতে তারতম্য, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপদ জিলায় বহুবার শস্যহানি ঘটাইয়াছে। ইহাদের পরিচয় পুর্বে দেওয়া হইয়াছে। যদিও দামোদর, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি পর্বতজাত নদনদী প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই নিজ নিজ প্লাবনধারাকে সাধারণত প্রবাহ পথেই বহন করিতে সমর্থ হয়, তীর অতিক্রম করিতে দেয় না, তবুও প্লাবনে বহুবার কয়েকটি অঞ্চলের ক্ষতি সাধন হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-জনিত এই জিলার ক্ষয়ক্ষতির চিত্র পুর্বে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন

দামোদর নদ বহুবার সন্নিহিত তটভূমি প্লাবিত করিয়াছে; সর্বপ্রথম দামোদর প্লাবনের পরিচয় পাওয়া যায় ১৮২৩ সালে। তারপর উল্লেখযোগ্য প্লাবন হয় ১৮৪০, ১৮৯৭, ১৯১৩, ১৯৩৫, ১৯৪১, ১৯৪৩ ও ১৯৪৭ সালে। ইহাদের মধ্যে ১৯১৩ ও ১৯৪৩ সালের প্লাবনই বিশেষ ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির। দামোদরের ন্যায় দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতীও কয়েকবার তীরভূমি প্লাবিত করিয়া বন্যার সৃষ্টি করে। উল্লেখযোগ্য হইল ১৮৬৫, ১৯২৮, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৫৬ সালে দ্বারকেশ্বর প্লাবন; ১৯০৫, ১৯৪৪, ১৯৫০, ১৯৫৩, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ও ১৯৫৯-১৯৬০ সালে কংসাবতী বন্যা। কংসাবতীর বন্যা ১৯৫০, ১৯৫৩ ও ১৯৫৯ সালে জিলার এক অংশের বহু দুর্গতির কারণ হয়। ১৯২২ সালে বাঁকুড়া শহরের নিম্নে প্রবাহিত গন্ধেশ্বরী নদী প্লাবন সৃষ্টি করিয়া শহরকে নিমজ্জিত করে।

দামোদর নদকে সুদৃঢ় বাঁধ দিয়া সংযত করিবার প্রয়াস বহুদিন পুর্বের। গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও দামোদরের দুই তীরেই ছিল বাঁধ। বাঁধ দিয়া

দামোদরকে বশে আনয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হয়; অন্যদিকে দক্ষিণ তীরের প্রবল বাঁধ অপর তীরে প্লাবনের আতিশয্য সৃষ্টি করিয়া বর্ধমান শহর ও রেলপথের বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সরকারের সিদ্ধান্ত হয় দক্ষিণ বাঁধের বিলোপ সাধন। তারপর গত শতাব্দীর মধ্যেই দক্ষিণ বাঁধ পরিত্যক্ত হয়। তারপর জিলার অংশবিশেষ কয়েকবার যে প্লাবনের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার পরিচয় উপরে দেওয়া হইয়াছে। দ্বারকেশ্বর বা কংসাবতীর প্লাবন রোধ করার জন্য কোন বাঁধের পরিকল্পনা এই জিলায় হয় নাই। জিলার নদনদীর প্রবাহসমূহকে সংযত করিয়া ইহাদিগকে কল্যাণদায়ক কার্যে পরিচালন করার প্রয়াস রূপ পায় দুইটি পরিকল্পনার মাধ্যমে, একটি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, অন্যটি কংসাবতী পরিকল্পনা। ইহাদের কথা পরে বলা হইয়াছে।

প্রতিকার
পুরাতন দামোদর বাঁধ

জিলার প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শস্য উৎপাদনের পরিপন্থী কারণ সমূহের প্রতিষেধক হিসাবে কয়েকটি ব্যবস্থার প্রচলন প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায়। জমিতে জল রক্ষার জন্য ইহার চারিদিকে মোটা দৃঢ় আইল বা বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা বহু দিনের। যেখানে ভূপৃষ্ঠ উন্নত-নত, আর ইহার মধ্য দিয়া বহু স্রোতধারা প্রবাহিত, সেখানে প্রবাহের নিম্নদিকে মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া ইহাকে স্থায়ী কৃত্রিম জলাশয়ে রূপান্তরিত করার রীতি সুপ্রাচীন। আবার ভূ-পৃষ্ঠ যেখানে ঢালু হইয়া নীচের দিকে প্রসারিত, ঢালুর শেষ প্রান্তের দুই দিক মাটি দিয়া উঁচু করিয়া নিম্নদিক বন্ধ করিয়া কৃত্রিম জলাশয়ে পরিণত করা হইয়াছে, এইরূপ দেখা যায়। বলাবাহুল্য যে এই জাতীয় কৃত্রিম জলাশয় হইতে যদি সময় সময় পঙ্কোদ্ধার না করা যায় তবে ইহারা মজিয়া যায়। জিলায় এইরূপ বহু মজা বাঁধ আছে। যেখানে ভূমি সমতল, সেখানে চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ বাঁধ দিয়া জলাশয় খননের প্রথা ছিল। পূর্ব-অঞ্চলে এই শ্রেণীর বহু প্রাচীন জলাশয় এখনও বিদ্যমান। ইহাদের অধিকাংশ বর্তমানে অব্যবহার্য।

জল সেচনের প্রাচীন প্রথা

উপরোক্ত জলাশয়সমূহ হইতে চতুষ্পার্শ্বের কৃষিযোগ্য জমিতে সময়মত সেচনজল সরবরাহ হইত; আবার পানীয় জলের অভাবও ইহারা মিটাইত। প্রাচীন সেচন-ব্যবস্থার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হইল শুভঙ্কর দাঁড়া। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের নাম হইতে দাঁড়াটি এই নামে পরিচিত হইয়া

আসিয়াছে। ইহা হইতেছে একটি সেচ-খাল, দামোদর নদ ও শালি নদীর মধ্যস্থিত সু-উচ্চ ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়া ইহার গতি।

শুভঙ্কর দাঁড়া

খালটি খনন হইবার পূর্বে আসুরিয়া হইতে রামপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ছিল পতিত, কৃষিকার্যের অযোগ্য। বিষ্ণুপুররাজ এই অঞ্চল হইতে কোন কর আদায় করিতে অপারগ ছিলেন। পরে এই রাজবংশেরই কর্মচারী শুভঙ্কর রায়ের পরামর্শমত ও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে এই খাল খনন করা হয়। খালটির অববাহিকা অঞ্চল সুবিস্তৃত; সিতলা ও কৃষ্ণা বাঁধের জলে ও পাঁচমৌলি জঙ্গলের ঝরনায় ইহা পুষ্ট। দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় কুড়ি মাইল এবং যে ভূ-ভাগ উদ্ধার করার জন্য ইহা খনন করা হয় তাহার বিস্তৃতি ৭৫ বর্গমাইলের কম হইবে না। খনন শেষ হইবার অব্যবহিত পরই ইহার যৌক্তিকতার উপলব্ধি হয় এবং এক খণ্ড পতিত ও অনুর্বর অঞ্চল এইরূপ আবাদযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হয় যে ইহার রাজস্ব নিরূপিত হয় ১২০০০ টাকা। রাজস্বের পরিমাণ অনুসারে অঞ্চলটি পরিচিত হয় বার হাজারি নামে। খালটি দুইভাগে বিভক্ত, উত্তর ভাগ দশ-আনি দাঁড়া আর দক্ষিণভাগ ছয়-আনি দাঁড়া নামে পরিচিত।

কালক্রমে শুভঙ্কর দাঁড়া মজিয়া যায়। ইং ১৮৮৬ সালে ইহার পঙ্কোদ্ধারের এক পরিকল্পনা হয় কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। ইং ১৮৯৭ সালে দুর্ভিক্ষ প্রশমনের কর্মপন্থা হিসাবে পরিকল্পনাটি পুনরায় বিবেচিত হয় কিন্তু অত্যধিক ব্যয়ের প্রশ্নে ইহা আবার পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে ইং ১৯১৩ সালে জমিদার বর্ধমান-রাজ হইতে পরিকল্পনাটি গৃহীত হয় এবং ইং ১৯১৬ সালে সর্বমোট ৩৩০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে দাঁড়ার পঙ্কোদ্ধার হয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এক সময় স্থির হয় যে খালের জলে যে সকল চাষী উপকৃত তাহারা হালপ্রতি বৎসরে এক টাকা করিয়া আদায় দিবে এবং ইহা দ্বারা দাঁড়াটির রক্ষণাবেক্ষণ চলিবে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উপযোগী কোন আইন সে সময় ছিল না; সুতরাং এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয় নাই। ইহার ফলে বহুকাল যাবৎ দাঁড়াটির পঙ্কোদ্ধার বা মেরামত কার্য হয় না এবং সেচন কার্যের জন্য ইহা অনুপযোগী হইয়া থাকে। পরে দাঁড়া দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

শুভঙ্কর দাঁড়া খাল-মাধ্যমে সেচব্যবস্থায় জমির উন্নয়ন ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে খাল-মাধ্যমে

সেচব্যবস্থার জন্য যে সকল পরিকল্পনা এই জিলায় গৃহীত হয় তাহাদের মধ্যে কুলাই খাল ও পলাশবনি খাল খনন অন্যতম। কুলাই খাল খনন করেন সিমলা পালের জমিদার; এই খাল হইতে যে পরিমাণ জমি সেচনযোগ্য হয় তাহা প্রায় ৯৫০ একর। জমিদার প্রজার নিকট হইতে সেচনযোগ্য জমির বিঘাপ্রতি ৪ হইতে ৭ পণ ধান আদায় করিতেন। ইং ১৯৪৯-৫০ সালে সরকার হইতে ১২১৩৩২ টাকা ব্যয়ে খালটির পঙ্কোদ্ধার ও মেরামত হয়। পলাশবনি খাল খনন করা হয় ইং ১৯১৭ সালের অজন্মার বৎসরে। পলাশবনি হইতে অম্বিকা নগরের নীচে কাঁসাই নদী পর্যন্ত খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ মাইল কিন্তু ইহার কোন পঙ্কোদ্ধার হয় না। এই দুইটি ভিন্ন এই সময় অন্য যে সকল সেচ পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাহাদের পরিচয় নিম্নরূপ :

বর্তমান প্রথা—
খাল মাধ্যমে সেচ

রায়পুর থানার যমুনা বাঁধ; সেচনযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় এক হাজার বিঘা।

পাত্রসায়র থানার দামনা দীঘি; সেচনযোগ্য জমির পরিমাণ উক্তরূপ।

জয়পুর থানার হরিণমুড়ি খালের উপর বাঁধ দিয়া প্রায় ৫০০০ হাজার বিঘা জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা।

তালডাংরা থানার আমজোর খালের উপর বাঁধ দিয়া প্রায় ২১০০ বিঘা জমিতে সেচন-ব্যবস্থা।

তালডাংরা থানার রুকনি খালের উপর বাঁধ দিয়া প্রায় ১২০০ বিঘা জমিতে সেচন ব্যবস্থা।

ইং ১৯৪৭ সাল হইতে সরকার কর্তৃক যে সকল সেচ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

কুলাই খাল সংস্কার; ইহার উল্লেখ পুর্বে করা হইয়াছে।

রুকনি খাল সংস্কার; উপকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ৫৫০ একর অর্থাৎ ১৬৫০ বিঘা।

বাঁশখাল ও চামকেরা খাল সংস্কার; সেচনযোগ্য জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১২৫০ ও ৬৫০ একর অর্থাৎ ৩৭৫০ ও ১৯৫০ বিঘা।

ভালুকজোরা সেচ পরিকল্পনা; সেচনযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ১৫০ একর অর্থাৎ ৪৫০ বিঘা।

বিরাই খাল পরিকল্পনা ; সেচনযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৬১৫০ একর অর্থাৎ ১৮৪৫০ বিঘা।

ভোরা খাল পরিকল্পনা ; সেচনযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ২৮০০ একর অর্থাৎ ৮৪০০ বিঘা।

মোল বাঁধ পরিকল্পনা ; সেচনযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ২৫০০ একর অর্থাৎ ৭৫০০ বিঘা।

এগুলি ভিন্ন আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক জল-নিকাশ বা জলসেচনের পরিকল্পনা। বহু বাঁধ ও অন্যান্য জলাশয় সরকারী প্রচেষ্টায় সংস্কার করা হইয়াছে, ইহাদের অধিকাংশের অবস্থান খাতরা, রাণী বাঁধ, সিমলাপাল, তালডাংরা ও রায়পুর অঞ্চলে। গভীর নলকূপের সাহায্যেও সেচ-ব্যবস্থার প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সব ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাহাদের সংখ্যা এইরূপ :

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
গ্রহণ করা হয়	৫১	৩২	৮৬
সমাধা হয়	২৯	১৫	৫৬

তাহা ছাড়া ১৯৬০ হইতে ১৯৬৩ সালের মধ্যে খনন করা হয় মোট ৯টি গভীর নলকূপ।

জিলার সেচন ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য দুইটি সর্বাত্মক পরিকল্পনার সাহায্য ইদানীং গ্রহণ করা হইয়াছে. ইহাদের একটি হইল দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, অন্যটি কংসাবতী পরিকল্পনা। বর্ধমানের দুর্গাপুরের অনতিদূরে দামোদর নদ বরাবর বিশাল বাঁধ বা ব্যারাজ নির্মিত হইয়া দামোদরের প্লাবন জল সঞ্চয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। তারপর এই নদের উভয় পার্শ্বে খনিত সু-পরিকল্পিত ক্যানাল বা খাল শ্রেণীর মাধ্যমে এই জল বর্ধমান, হুগলি ও বাঁকুড়া জিলার অভ্যন্তরে চালিত হইয়াছে দূর দূরান্তে। ফলে এই জিলার বরজোরা, সোনামুখী ও পাত্রসায়র অঞ্চলের বহু কৃষি জমি উপকৃত হইয়াছে। বাঁকুড়া জিলায় দামোদর খাল সমষ্টির প্রধান প্রবাহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪ মাইল। প্রধান প্রবাহ হইতে আবার বাহির হইয়াছে বহু শাখা খাল ও সরবরাহকারী খাল আর ইহাদের দ্বারা প্রবাহিত দামোদরের জলরাশি সর্বমোট প্রায় ৭৮০০০ একর কৃষিজমিকে সেচনযোগ্য করিয়াছে। শাখা-প্রশাখাগুলির মোট দৈর্ঘ্য

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

প্রায় ৭৫ মাইল। সেচনের জল পরিবেশন ছাড়াও দামোদরের খালসমষ্টি প্রাক্তন জলাবৃত অঞ্চলসমূহ হইতে জল নিকাশের সুবিধা করিয়া ইহাদের কৃষিযোগ্য করিয়াছে। পূর্বে যে সব অঞ্চল দামোদরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহাও রক্ষা পাইয়াছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যদিকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবেত প্রচেষ্টার ফল, কিন্তু কংসাবতী পরিকল্পনার কৃতিত্ব মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংযোগ-স্থলে বাঁধ নির্মাণ করিয়া এক বিশাল জলাধার সৃষ্ট করা হইয়াছে ; জলাধারে সঞ্চিত জলরাশি বাঁকুড়া ও মেদিনিপুর জিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিচালনার জন্য বহু খাল ও শাখা খাল কংসাবতীর উভয় দিকে খনন করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভাগের প্রধান খাল জলাধার হইতে বাহির হইয়া রায়পুর থানার মধ্য দিয়া মেদিনিপুর জিলার বীনপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। শাখা খাল সহ ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬ মাইল। বামদিকের খালটি জলাধার হইতে নির্গত হইয়া কিছুদূরে দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হইয়াছে ; একটি ধারা চলিয়াছে খাতরা, ইন্দপুর ও বাঁকুড়া থানার অসমতল ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়া উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের দিকে ; ইহারই এক শাখা আবার বিষ্ণুপুর ও জয়পুর থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে কোতুলপুরের দিকে। অন্য ধারাটি কংসাবতীর সমান্তরাল গতিতে অগ্রর হইয়া খাতরা, সিমলাপাল, রায়পুর থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে মেদিনিপুরের দিকে। ইহা হইতে আবার দুইটি শাখা খাল বাহির হইয়া পূর্বদিকে গিয়াছে। খাল সমূহের সর্বমোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৬ মাইল।

কংসাবতী পরিকল্পনা

কংসাবতী পরিকল্পনায় জিলার যে পরিমাণ কৃষিজমি সেচনযোগ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায় তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

থানা	সেচনযোগ্য কৃষিজমি (একরে)
বাঁকুড়া	২২৮০
ওঁদা	৫৩০৯০
তালডাংরা	৪৫৩৩০
ইন্দপুর	২৪৩০
খাতরা	৫৯৫৩
সিমলাপাল	৫৬৩০৪

থানা	সেচনযোগ্য কৃষিজমি (একরে)
রায়পুর	৬৫৭৫১
বিষ্ণুপুর	৫২৬৩৯
জয়পুর	৩৮৩৮৩
কোতুলপুর	৩৬৩১৯

শস্য উৎপাদনের সমতা রক্ষা, পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

সার প্রয়োগ, উন্নত বীজ সরবরাহ, পোকামাকড় বা ব্যাধি হইতে শস্য রক্ষা, গো-ব্যাধির প্রতিকার ও প্রতিরোধ।

অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা

সার প্রয়োগের উপকারিতা সম্বন্ধে কৃষক বেশ উদ্বুদ্ধ; সারের ব্যবহার ও উপযুক্ত প্রয়োগবিধিও তাহার অজ্ঞাত নাই। জমিতে বহু প্রকারের সার প্রয়োগের রীতি আছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ প্রচলিত:

১। গোবর। গোবর অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান সার। পল্লী অঞ্চলে কৃষকের গৃহে ইহা সযত্নে রক্ষিত থাকে। গৃহাঙ্গনের যে স্থানে ইহা জমা করিয়া রাখা হয় তাহাকে বলা হয় সারকুর বা সারগাদা। গোবরের সার ধান, আক ও আলু চাষে ব্যবহৃত হয়।

২। পুকুরের পাঁক।

ধানের জমির জন্য ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দেখা যায় যে সারিবদ্ধ গোগাড়ী ভর্তি হইয়া এই পাঁক গ্রামপথ ধরিয়া যাইতেছে মাঠের দিকে। সেখানে কৃষি-জমিতে পাঁক ফেলিয়া রাখা হয়, পরে লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার সময় ইহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয় হয়।

৩। খইল।

রাসায়নিক সার প্রচলিত হইবার পূর্বে ইহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। সমাদর এখনও আছে কিন্তু দুই কারণে ইহার ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ খইলের দাম অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই কারণে বহু কৃষক ইহার ব্যবহার লাভজনক মনে করে না। দ্বিতীয়তঃ রাসায়নিক সার অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে, কখনও বা সরকারী সুত্রে ধার হিসাবে পাওয়া যায়; শস্য উৎপাদনে ইহারও কার্যকরী শক্তি থাকায় ইহা কৃষকের নিকট ক্রমশঃ আদরণীয় হইতেছে।

কিন্তু পুরাতনপন্থী কৃষক কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আক ও আলুর চাষে থইলই অধিক পছন্দ করে।

৪। রাসায়নিক সার।

ইহা বহু-জাতীয়। দিন দিন ইহার ব্যবহার বাড়িতেছে। সরকারী কৃষি-দপ্তর উন্নত শ্রেণীর বীজ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে; নানাবিধ ব্যাধি ও কীটপতঙ্গের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষার ব্যবস্থার ও কৃষককে এ বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্যদানের দায়িত্বও এই বিভাগ গ্রহণ করিয়াছে।

গোব্যাধি ও ইহার প্রতিকার

গবাদি পশুর যে সকল ব্যাধি সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পায় যে বহু সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত পশু বাহির হইতে আমদানি হইয়া থাকে এবং ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া সুস্থকায় পশুও পীড়িত হয়। এইভাবে গোব্যাধির প্রসার হয়। আবার দেখা যায় যে সার হিসাবে যে হাড়ের গুড়া সরবরাহ হয় তাহা অনেক সময় অশোধিত অবস্থায় থাকে। এই সার জমিতে প্রয়োগ করার পর যে সকল পশু এখানে বিচরণ করে তাহাদের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। গবাদি পশুর-চিকিৎসা ও গো-ব্যাধি নিবারণের জন্য চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় আছে।

গোজাতির অবস্থা কিন্তু অত্যন্ত হীন; ইহার প্রধান কারণ হইতেছে জলাভাব ও খাদ্যাভাব। জিলায়, বিশেষতঃ পশ্চিম অঞ্চলে জলাশয়ের সংখ্যা নগণ্য; যাহা আছে তাহার অধিকাংশই গ্রীষ্মকালে হয় জলহীন। যেগুলিতে জল থাকে প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা হয় ব্যবহারের অনুপযোগী। তারপর আছে তৃণ ও সবুজ ঘাসের অভাব। পুর্ব অঞ্চলের উন্মুক্ত মাঠ হইতে গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য সময়ে গবাদি পশু খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে বটে কিন্তু গোচর অবলুপ্তির কারণে এই খাদ্য হয় সাময়িক ও অপর্যাপ্ত। বনভূমি অঞ্চলে পূর্বে গবাদি পশু অবাধে বিচরণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত কিন্তু বর্তমানে বনভূমির আয়তন সঙ্কুচিত হইয়াছে আর ইহার সহিত গবাদি পশুর বিচরণ সম্বন্ধে আইনের কঠোরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভাগদারদের কথা

ভাগ-চাষ প্রথা অতি প্রাচীন। মনু-সংহিতায় "আর্ধিকং" কথার উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক সংহিতায়ও "অর্ধ-সিরি" কথার উল্লেখ দেখা যায়। "আর্ধিকং" বা "অর্ধসিরি" এরূপ শ্রেণীর কৃষককে বোঝাইত যাহারা কায়িক পরিশ্রমে ফসল উৎপাদন করিয়া পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ফসলের অর্ধাংশ গ্রহণ করিত। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে যদি কোন ভূমি লোকাভাবে অনাবাদি পড়িয়া থাকে তাহা উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ দিবার ব্যবস্থায় অন্য কাহারও দ্বারা আবাদ করা যাইতে পারে। বলাবাহুল্য যে উপরোক্ত বিধি-সমূহ তৎকালে মাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল, কারণ, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ব্রাহ্মণের স্বহস্তে ভূমিকর্ষণের অন্তরায় ছিল।

ভাগ-প্রথা প্রাচীনকালে

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে ভূমিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। ধর্মশীল রাজা বা সামন্তগণ নিষ্কর ভূমি দান করিয়া ইঁহাদের সমাদর করিতেন, নূতন গ্রাম বা নগর পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করিবার জন্য এই সম্প্রদায়কে বিনা করে ভূমি দান করিতেন। মুকুন্দ রামের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ আছে যে কালকেতু গুজরাট নগরী পত্তন করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন

মধ্যযুগে

"যত বৈসে দ্বিজবর
তার নাহি লব কর
ভূমি জমি বাড়ী দিব দান।"

বিষ্ণুপুর রাজবংশের ব্রহ্মোত্তর দান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ও প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। ইঁহাদের অনুকরণে ছা[illegible]নার রাজগণও বহু ব্রহ্মোত্তর সৃষ্টি করেন। বর্ধিষ্ণু গৃহস্থগণও ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিতেন। এই সম্প্রদায়ের পক্ষে কৃষিকার্য সম্ভবপর না হওয়ায় জমি উৎপন্ন শস্যের অংশ বিনিময়ে অপরের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া চলিল। দেখা যায় যে কোম্পানির আমলে জমিদার যখন ইংরেজ সরকারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আবদ্ধ হইলেন ভাগ প্রথা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যে পরিস্থিতিতে

ভাগ-প্রথার প্রসার

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহার প্রসার হয় তাহা পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে রবার্টসন সাহেব তাঁহার বাঁকুড়া সেটেলমেণ্টের চূড়ান্ত রিপোর্টে (১) যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

"জিলার অধিবাসীগণ দরিদ্র ও অমিতব্যয়ী। অজন্মার বৎসরে তাহাদের এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না যাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। পরিবারের আহারের জন্য ও পর বৎসরের খোরাকীর জন্য তাহাদের ঋণ অনিবার্য হইয়া পড়ে, আর ঋণ বাবদ অর্থ বা খাদ্যশস্য সংগ্রহে একমাত্র নিজ জমিই তাহারা দায়বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু ঋণ বাবদ সুদ পরিশোধ করিতে তাঁহারা হয় অক্ষম এবং সাধারণ ক্ষেত্রে ভূমির উপরিস্থ মালিক হইতে এই ঋণ সংগ্রহ করা হয় বলিয়া ঋণের দায়ে জমি বিক্রয়ে তিনিই হন ক্রেতা। জমি হস্তগত করার পর মালিক ভূতপূর্ব কৃষক প্রজাকে ইহা ভাগ বা সাঁজায় বন্দোবস্ত করেন।"

রবার্টসন সাহেব আরও বর্ণনা দিয়াছেন কি ভাবে মহাজনশ্রেণী জঙ্গলমহল অঞ্চলে প্রথমে ব্যবসায়ীরূপে প্রবেশ করিয়া কৃষক প্রজাকে তাহাদের সাধ্যের অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার দেয় ও পরে পরিশোধের অক্ষমতায় তাহাদের জমি হস্তগত করিয়া পুনরায় তাহাদের সহিতই ভাগ অথবা সাঁজায় বিলি-বন্দোবস্ত করে। এখন পর্যন্তও তালডাংরা, ইন্দপুর, খাতরা, ছাতনা অঞ্চলে ভাগ চাষের প্রাবল্য দেখা যায়।

ভাগ ও অনুরূপ সাঁজা প্রথার প্রসার ও সমাজের এক শ্রেণীর উপর ইহার অকল্যাণকর প্রভাব বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই এই বিষয় লইয়া বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা হয়। সমস্যার সমাধান কল্পে কার সাহেবের (Sir John Carr) পরিচালনায় যে কমিটি গঠিত হয় তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ইং ১৯২৭ সালে। কমিটি যে সব সুপারিশ করেন তাহাদের মধ্যে একটি ছিল কোন বিশেষ শ্রেণীর ভাগদারকে দখলি-স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত বলিয়া স্বীকৃতিদান। কমিটির রিপোর্টের ফলে দেশে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় তাহার ফলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। ইং ১৯৩৮ সালে ভূমি-রাজস্ব কমিশন ভাগদার সমস্যার পুনর্বিবেচনা

ভাগ-প্রথার অকল্যাণকর প্রভাব ও ইহার প্রতিকারে প্রচেষ্টা

---

(১) **F. W. Robertson I. C. S —Final Report of Bankura settlement, 1917-24**

করেন। কমিশন সুপারিশ করেন যে যে-শ্রেণীর ভাগদার নিজস্ব চাষের বলদ, লাঙ্গল প্রভৃতির সাহায্যে চাষ আবাদ করে তাহাদের রায়ত বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত আর ইহাদের নিকট হইতে ভাগ-শস্য আদায় হওয়া উচিত উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। এই সুপারিশ অনুযায়ী কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা হয় নাই। ইং ১৯৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন বিষয়টি আলোচনা করেন। ভাগ-প্রথা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত, ইহার উপযোগিতা বা ত্রুটি বিবেচনা করার পর কমিশন মন্তব্য করেন যে প্রথাটি যে একেবারেই অনুপযোগী ইহা তাঁহারা মনে করেন না। ইং ১৯৫০ সালের বর্গাদার বা ভাগদার আইনের পুর্বে এই শ্রেণী সম্বন্ধে প্রচলিত প্রথার কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই আইনে ভাগদারকে জমির উপর কোনরূপ স্বত্ব দেওয়া হয় নাই কিন্তু জমির মালিক ও ভাগদারের মধ্যে উৎপন্ন শস্য বিভাগ ও ভাগদার উৎখাত সম্বন্ধে কয়েকটি বিধি প্রবর্তিত হয়। ইং ১৯৫৩ সালের জমিদারি দখল আইন ভাগদারকে ভাগ-জমির উপর কোনরূপ স্বত্ব দেয় নাই।

ভাগ-চাষের উপর নির্ভরশীল শ্রেণীর বিন্যাস

জিলার ভূমি সংযুক্ত কৃষিজীবীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চাষ-আবাদ ও ফসল উৎপাদনের জন্য ভাগদারদের উপর নির্ভর করে। যে সকল শ্রেণী ভাগদার মাধ্যমে কৃষিকার্য করিয়া থাকে তাহাদের পরিচয় নিম্নরূপ :

১। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ হইতে নিবৃত্ত করে, সুতরাং এই বর্ণের অধিকাংশেরই ভাগদারের উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশ্য উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য নহে, কারণ, দেখা যায় যে এই শ্রেণীর অনেকে স্বহস্তে হলকর্ষণে দ্বিধা করে না।

২। উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সাধারণ কথায় যাহাদের বলা হয় "ভদ্রলোক"। ইহার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান দুই শ্রেণীই আছে। সামাজিক কারণে ইহারা স্বহস্তে জমি চাষ করে না।

৩। বিধবা বা পিতৃহীন বালক। ইহারা নিজেরা চাষ আবাদ করিতে অক্ষম, আবার উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অপারগ বিধায় কৃষি-মজুর দ্বারা চাষ অপেক্ষা ভাগচাষই বেশী পছন্দ করে।

৪। প্রবাসী কৃষি-জমির মালিক : জমি হইতে দূরে থাকা বিধায় ভাগদার নিয়োগ করিয়া চাষ-আবাদ ইহারা অধিকতর সুবিধাজনক মনে করে।

কোন কোন কৃষিজীবীর নিজ গ্রামের মাঠ হইতে দূরে অন্য মাঠে জমি

থাকে। এই জমি দূরে অবস্থিত থাকায় স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে চাষ আবাদের অসুবিধা হয় ; সুতরাং ভাগদারের শরণাপন্ন হইতে হয়।

৫। বিশেষ কোন কারণে কৃষিজমি সময় সময় এইরূপ শ্রেণীর হস্তগত হয় যাহারা বাস্তবিক কৃষিজীবী নহে। তাহাদের অন্যবিধ-আয়করী বৃত্তি থাকায় কৃষি-কার্যে মনোনিবেশ করা সম্ভবপর হয় না ; অন্যদিকে আবার কৃষি-জমিতে অর্থ-নিয়োগ তাহাদের নিকট অধিকতর নিরাপদ বলিয়া গণ্য হয়। ভাগদারের দ্বারা জমি চাষে তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা মনে করে যে বিনা পরিশ্রমে ও শান্তিতে নিরূপিত ফসল পাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

৬। আবার এইরূপ বহু ক্ষুদ্রায়তন ভূমি-সংযুক্ত চাষী আছে যাহাদের নিকট লাঙ্গল বলদ রাখিয়া জমি চাষ করা লাভজনক মনে হয় না। নিজ জমি ভাগে বিলি করিয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করে, বহু সময় জিলার বাহিরে চলিয়া যায়। যে সকল সাঁওতাল প্রতিবৎসর চাষের মরসুমে বর্ধমান বা হুগলি জিলায় চলিয়া যায় তাহাদের মধ্যে এইরূপ অনেক থাকে।

কোন জমি ভাগ প্রথায় বিলি বন্দোবস্ত করার সময় সাধারণতঃ দেখা হয় যে যাহাকে ভাগদার হিসাবে গ্রহণ করা হইবে তাহার চাষের বলদ ও লাঙ্গল আছে কি-না। ভাবী-ভাগদারের হয় তো নিজস্ব সামান্য কিছু কৃষিযোগ্য জমি থাকিতে পারে ; হয় তো আবার সে অন্য কিছু জমি ভাগেও চাষ করে। মোট জমি যাহা তাহার চাষে আছে তাহা একজোড়া বলদ বা একটি লাঙ্গলের পক্ষে পর্যাপ্ত হইলে সাধারণতঃ এই বলদ ও লাঙ্গল ভাগদারের থাকে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বীজ সরবরাহের জন্য ভাগদারই সম্পূর্ণ দায়ী থাকে, ইহাও দেখা যায় যে সে ও জমির মালিক বীজের জন্য সমভাবে দায়ী থাকে। জমিতে যদি সার দিবার প্রয়োজন হয় ইহার দায়িত্বও ভাগদার ও মালিক সমভাবে বহন করে। এইসব ব্যবস্থায় জমির উৎপন্ন ফসল ভাগদার ও মালিকের মধ্যে সমান সমান ভাগ হয়। কিন্তু যদি জমির মালিককেই লাঙ্গল, বলদ, বীজ, সার সব কিছুরই দায়িত্ব লইতে হয় তবে প্রথামত ভাগদার পায় ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। অবশ্য ভাগদার আইনের আশ্রয় লইতে পারে কিন্তু কতকগুলি কারণে সাধারণতঃ সে তাহা করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ জমিতে যদি নূতন ভাগদার পত্তন করিতে হয়, আর এই ভাগদারের যদি লাঙ্গল,

ভাগ বন্দোবস্তের কয়েকটি মৌলিক প্রথা

বলদ ইত্যাদি না থাকে, জমির মালিক অনেক সময় এইসব ক্রয়ের জন্য ভাগদারকে টাকা অগ্রিম দেয়। এই অগ্রিম ভাগদারের নিকট হইতে ফসল হিসাবে আদায় করা হয়।

কিন্তু জমিতে ভাগদার বসাইবার সহিতই মালিকের দায়িত্ব শেষ হয় না; তাহার আরও কিছু করণীয় থাকে। প্রতিবৎসর কোন বিশেষ সময়ে, যেমন আষাঢ় মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত, যখন ভাগদারের গৃহে অন্নাভাব উপস্থিত হয়, অথবা দেশে যদি অজন্মা হয়, ভাগদারের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব অনেক সময় মালিককে গ্রহণ করিতে হয়। এই দায়িত্ব সে পালন করে ধান্যঋণ দ্বারা, যাহাকে বলা হয় "বাড়ি"। এই "বাড়ি" প্রথা ভাগদার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; এই জাতীয় ঋণ ধান্যেই প্রতিবৎসর পরিশোধ করিতে হয় এবং ইহা বাবদ সুদ বৎসরে প্রতি মণ ধানে দশ সের: ফসল ভাগ হইবার সময় প্রথমেই মালিক সুদ সহ এই ঋণ আদায় করে। ভাগদারের গৃহে সাময়িক অন্নাভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগদারের যৎসামান্য নিজস্ব জমি থাকিলেও সে যে জমি ভাগে চাষ করে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে। জমি হইতে যে ফসল পাওয়া যায় তাহা দ্বারা নিজ পরিবার পোষণ ছাড়াও চাষের বলদ ও লাঙ্গল থাকিলে বলদের খোরাক জোগাইতে হয়, লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি মেরামত করিতে হয়, অন্যান্য অবশ্য করণীয় ব্যয়ও নির্বাহ করিতে হয়। মালিকের সহিত উৎপন্ন ফসল যখন ভাগ হয় প্রথমে উপরোক্ত "বাড়ি" সহ লাঙ্গল বা বলদ ক্রয় বাবদ মালিকের নিকট হইতে যদি কিছু অগ্রিম লওয়া হইয়া থাকে তদ্‌বাবদ প্রাপ্য যাহা থাকে তাহাও ধান হিসাবে আদায় করা হয়। অবশিষ্ট যে ফসল থাকে তাহাই মালিক ও ভাগদারের মধ্যে প্রথামত ভাগ করা হয়। এই ফসলের পরিমাণ কম হওয়ায় দেখা যায় যে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের পর ভাগদারের গৃহে আহার্য কিছু থাকে না, তখন তাহাকে মালিকের নিকট হইতে বাড়ি প্রথায় ধান লইতে বাধ্য হইতে হয়। অজন্মার বৎসর আবার বেশি পরিমাণে এইরূপ ঋণ লইতে হয়। বহুকাল ধরিয়া এই প্রকার ঋণ লইতে লইতে অনেক সময় অনধিক জমিসংযুক্ত ভাগদারের এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে ভাগ ফসলের সাহায্যে সে তিন চার মাসের বেশি চালাইতে পারে না। এই অবস্থায় কেহ আবার বাড়ি লয়, কেহ বা অর্ধাহারে অনাহারে থাকে, আবার কেহ বা কর্মের সন্ধানে বা সরকার

জমির মালিকের কয়েকটি দায়িত্ব

"বাড়ি" প্রথার কুফল

প্রযোজিত টেস্ট রিলিফে কাজের জন্য বাহির হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে ভাগদারের জীবনকে পরমুখাপেক্ষী বলা যাইতে পারে। ইহার অবসানের প্রয়াস বহুবার করা হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই যে সফল হয় নাই এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

৫

বাঁকুড়ার শিল্প

বৃহৎ শিল্প ক্ষেত্রে জিলার কোন স্থান নাই বলিলেই চলে। শালতোড়া ও মেজিয়া অঞ্চলে কয়েকটি কয়লার খনি আছে কিন্তু উৎপন্ন কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হওয়ায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহার সুনাম নাই। জিলার প্রায় সর্বত্র কেওলিন বা চীনা মাটি পাওয়া যায়; খাতরা থানায় খড়িডুংরিতে যে কেওলিন আছে তাহা উচ্চ শ্রেণীর কিন্তু এই আকরিক উত্তোলন করিয়া বাহিরে রপ্তানি করা ব্যয়সাধ্য বিধায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহার স্থান নাই। ছাঁদা পাথর অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য উলফারম পাওয়া যায় কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহার স্থান নগণ্য। কুটীর শিল্পের প্রাধান্য কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই জিলায় বর্তমান। একসময় বিশেষতঃ মল্লরাজগণের শাসনকালে বাঁকুড়ায় বহুশিল্প সুখ্যাতি অর্জন করে।

জিলার ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য

কুটীর শিল্প সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই রেশম ও তাঁত শিল্পের কথা আসিয়া পড়ে। দুইটি শিল্পই বহু প্রাচীন এবং পুর্বে দুইটিই ছিল সতেজ ও প্রাণময়। কোম্পানি যখন জিলার শাসনভার গ্রহণ করে, এই দুই শিল্প স্বভাবতঃই ইহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্প দুইটিকে করায়ত্ত করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ে লাভবান হইতে কোম্পানির বিশেষ সময় লাগে নাই এবং ফলে কোম্পানির বাণিজ্য দপ্তরে বাঁকুড়া এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। সোনামুখীতে কোম্পানির যে কুঠি স্থাপিত হয় তাহার অধীন ছিল ৩১টি আড়ং বা বাজার। বীরভূমের সুরুল ও ইলামবাজারের কুঠি ও পাত্রসায়রের কুঠি ছিল সোনামুখী কুঠির অধীন। সোনামুখী কুঠির বড় সাহেব বা কুঠিয়াল চিপ্ সাহেবের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন যে যাবতীয় শিল্প সংস্থা ছিল তাঁহার তাবেদার মাত্র এবং তিনি যখন এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে যাইতেন, তাঁহাকে অনুসরণ করিত উমেদার অনুচরবর্গের মিছিল; এই মিছিল যখন কোন পল্লীর মধ্য দিয়া যাইত, জননী তাহার সন্তানকে উঁচু করিয়া ধরিত যাহাতে সাহেবের পাল্কি দর্শনে সে ধন্য হয় আর গ্রাম-বৃদ্ধগণ তাহাদের অন্নদাতা ও ভাগ্যবিধাতাকে আভূমি প্রণত হইয়া অভিবাদন করিত।

রেশম ও তাঁতশিল্প

বিষ্ণুপুর, জয়পুর, সোনামুখী ও কোতুলপুর থানায় ছিল রেশম শিল্পের প্রাধান্য। জিলার বহুস্থানে গুটি পোকার চাষ হইত। মল্লরাজগণের গৌরবময় যুগে রেশম শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয় ও ইহার সহিত মুর্শিদাবাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তারপর এই শিল্প ক্রমশঃ ম্লান হইতে থাকে ও বর্তমানে শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদ রেশম বিষ্ণুপুর রেশম হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। ইহা সত্ত্বেও এই শিল্প এখন জিলায় একটি উন্নত ধরনের শিল্প বলিয়া বিবেচিত হয়। রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী হইলেও বাঁকুড়া শহর, রাজগ্রাম, জয়পুর, গোপীনাথপুর, বীরসিংপুর প্রভৃতি স্থানেও ইহার প্রসার দেখা যায়। পূর্বে বিষ্ণুপুরের "ধূপছায়া" শাড়ী সর্ব সমাজে আভিজাত্য অর্জন করিত। বর্তমানকালে শাড়ীর পাড়ের সুষ্ঠু সূচিকাজে ও নানা ধরনের সাধারণ শাড়ী ও তৎসহ আনুষঙ্গিক গাত্রাবরণ প্রস্তুতে বিষ্ণুপুরের সুনাম আছে। বিদেশ হইতে আমদানি কৃত্রিম রেশমের কাজও এখানে হয়। সোনামুখীর রেশম বস্ত্র বিষ্ণুপুরের ন্যায় তত সূক্ষ্ম নহে ; সার্ট বা পোশাকের জন্য ইহা অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। রেশম শিল্পের জন্য কাঁচা মালের অধিকাংশই আসে বাহির হইতে, মাত্র সামান্য পরিমাণই জিলায় জন্মে। এখনও জিলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন স্থানে গুটি পোকার চাষ ও রেশম বোনা হয়। গুটি পোকার চাষ যাহারা করে তাহারা সকলেই মুসলমান।

রেশম শিল্পের পরই স্থান তাঁত শিল্পের। একসময় এই শিল্পের যথেষ্ট সুনাম ছিল ; রাজগ্রাম, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, পাত্রসায়র প্রভৃতি স্থানের তাঁত বস্ত্রের বিশেষ সমাদর ছিল। বর্তমানে তাঁত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে রাজগ্রাম, বাঁকুড়া শহর, কেঁওজাকুড়া, পাঁচমুড়া, রায়পুর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, বীরসিংপুর, মদনমোহনপুর ও পাত্রসায়র। পূর্বে বাঁকুড়ায় যথেষ্ট তুলাচাষ হইত। ইং ১৮৬২ সালে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় তাহাতে বাঁকুড়ার কার্পাস তুলা প্রদর্শিত সামগ্রীর মধ্যে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। দেশীয় কার্পাস বীজ হইতে উৎপন্ন এই তূলার যে কয়টি নমুনা প্রদর্শিত হয় তাহার সবগুলিরই ছিল দীর্ঘ তন্তু, সব নমুনাগুলিই ছিল পরিষ্কার। গত শতাব্দীর শেষভাগে বাহির হইতে আমদানী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় কার্পাস শিল্প অবনতির পথে যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে ইহার উন্নতি সাধনের প্রয়াস চলে। এই সম্বন্ধে দুইটি সমবায় সমিতির উল্লেখ করা যায় ; একটি হইল বাঁকুড়া জিলা সমবায় শিল্প সমিতি, অপরটি বিষ্ণুপুর মহকুমা সমবায়

শিল্প সমিতি। প্রথমটি স্থাপিত হয় ইং ১৯১৮ সালে। যদিও ইং ১৯৪৯ সালে ইহাকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়, পশ্চিম বাংলার ভিতরে ও ইহার বাহিরের বিভিন্ন বাজারে বিছানার চাদর, বিছানার আবরণ, মশারীর কাপড় ও অন্যান্য বস্ত্র সরবরাহ করিয়া ইহা সুনাম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বিষ্ণুপুর মহকুমা সমবায় শিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ইং ১৯৪৭ সালে। নানা ধরনের বস্ত্র উৎপাদনে এই সমিতিও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইং ১৯৫২ সালে জিলায় ১০৫টি তাঁত শিল্প সমিতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু সংখ্যা বাহুল্য সত্ত্বেও মাত্র দুইটি সমিতি উন্নতি লাভ করিয়াছে, রাজগ্রাম সমিতি ও গোপীনাথপুর সমিতি। সমস্ত রাজগ্রামই একরূপ প্রথমোক্ত সমিতিভুক্ত, সভ্যসংখ্যা প্রায় ৩৫০। এই সমিতি একটি রঙের কারখানাও পরিচালনা করে। গোপীনাথপুর সমিতি ইহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, ইহারও একটি নিজস্ব রঙের কারখানা আছে।

জিলার কোন কোন স্থানে তসর শিল্পের প্রসার আছে। তসর গুটি পোকার ডিম সংগ্রহ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে আসান ও শালগাছের পাতায় রাখা হয়। কালে যখন গুটিগুলি উপযুক্ত হয়, গাছের যে ডালে ইহা জন্মে, তাহা কাটা হয়। সাধারণতঃ কোন মহাজন গুটিগুলি ক্রয় করে ও পরে তাঁতির নিকট বিক্রয় করে। তাঁতি প্রথমে সেগুলি জলে সিদ্ধ করে ও ছাই মিশায়। তারপর ইহা জল দিয়া ধুইয়া ঠাণ্ডা করা হয় ও পরে তকলির সাহায্যে ইহা হইতে তসর বাহির করা হয়। দেশীয় গুটি পোকার চাষ কম হওয়ায়, পার্শ্ববর্তী মেদিনিপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে গুটি আমদানী করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে তসর শিল্প আছে।

তসর শিল্প

জিলায় বহু পরিমাণে পিতল কাঁসার বাসনপত্র প্রস্তুত হয়। বিষ্ণুপুর, মদনমোহনপুর, ময়নাগড়, কেঁওজাকুড়া, বাঁকুড়া শহর, অযোধ্যা, শুশুনিয়া প্রভৃতি স্থান এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। বাঁকুড়ার গাড়ু প্রসিদ্ধ। পিতল বাঁধান সুন্দর কাঠের হাড়িও এখানে চাহিদামত প্রস্তুত হয়। বিষ্ণুপুরের বাসনপত্রের মধ্যে থালা, বাটি ও গেলাস উল্লেখযোগ্য। বাসনপত্র প্রস্তুতের জন্য বহু কারখানা আছে, এগুলির কাজ সমবায় সমিতি মাধ্যমে অথবা নিজস্ব পরিচালনায় চলে। জিলার কাঁসার বাসন সর্বত্র সমাদর লাভ করে ও বহু পরিমাণে বাহিরে রপ্তানি হয়।

কাংস্য শিল্প

বর্ধমানের কাঞ্চন নগরের ন্যায় সাসপুর এক সময় ইস্পাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে কালেও সাসপুরে প্রস্তুত ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতির যথেষ্ট সমাদর আছে কিন্তু কর্মকারের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। বরজোরা থানার ঘুটগড়িয়াও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইস্পাত শিল্প

আর একটি শিল্প হইতেছে শঙ্খ শিল্প। পূর্বে বাঁকুড়া শহর, বিষ্ণুপুর ও পাত্রসায়র এই শিল্পের জন্য খ্যাতিলাভ করিত। বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া শহরে এখন বহু পরিমাণে শঙ্খজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। শাঁখারী সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য হেতু বাঁকুড়া শহরের কোন বিশিষ্ট অঞ্চল শাঁখারীপাড়া নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হইতেছে।

শঙ্খ শিল্প

বিষ্ণুপুরের সুগন্ধি তামাক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এক সময় সমগ্র দেশের অভিজাত পরিবারের সমাদর লাভ করে। বর্তমানে হুকা বা গড়গড়ার ব্যবহার লোপ পাইতে চলিয়াছে, এবং ইহার সহিত তামাক শিল্পও ম্লান হইয়াছে। তামাকের স্থান অধিকার করিতেছে সিগারেট ও বিড়ি। বিড়ি শিল্পের প্রাধান্য লক্ষণীয়। বিড়ি প্রস্তুত, বিড়ি ব্যবসায়ের উন্নতি ও ইহাকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে।

তামাক

জিলার আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হইতেছে তালগুড় উৎপাদন। শিল্পটি প্রাচীন হইলেও কালক্রমে ইহার অবনতি ঘটে এবং ফলে জিলার প্রায় দুই লক্ষ তালগাছের অধিকাংশই কোন অর্থকরী কার্যে নিয়োজিত হয় না। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি এই শিল্পের উন্নয়নের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহার ফলে বহু তালগুড় উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রসমূহের অধিকাংশ পূর্বাঞ্চলের তাল প্রধান ভূখণ্ডে অবস্থিত। খেজুর গুড় উৎপাদনও এক বিশিষ্ট শিল্প; সোনামুখী প্রভৃতি অঞ্চলের খেজুর গুড়ের সমাদর আছে।

তালগুড়

বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কারুকার্য প্রাক্তন মৃৎশিল্পের স্মৃতি বহন

করিয়া আসিতেছে। জিলার কয়েকটি অঞ্চল এখনও এই শিল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছে; পাঁচমুড়া প্রভৃতি স্থানের মাটির হাতি, ঘোড়া সর্বজন সমাদৃত; সোনামুখী, পাত্রসায়র, ইন্দাস ও বিষ্ণুপুরের মাটির বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য জনপ্রিয়। মৃৎশিল্প জিলার অন্যতম অর্থকরী উৎপাদন।

মৃৎশিল্প

ঢেকি মাধ্যমে চাউল উৎপাদন পুর্বে জিলার একটি শিল্প ছিল। বহু দরিদ্র, আশ্রয়হীন স্ত্রীলোকের কর্মসংস্থান করিত ঢেকি। বর্তমানে ইহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ও ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে ছোট বড় নানা শ্রেণীর চাউল কল। চাউল কলের বৈশিষ্ট্য হইল যে পরিমিত মূলধন বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইতে ইহা একটি সহায়ক। বৃহৎ চাউল কলগুলির সংখ্যা ২৯; অধিকাংশই অবস্থিত বাঁকুড়া শহর, ঝাঁটিপাহাড়ি, ছাতনা, ওঁদা, বিষ্ণুপুর, সাসপুর অঞ্চলে। বাঁকুড়া শহর ও বিষ্ণুপুরে কয়েকটি তেলকলও আছে।

ঢেঁকি ও চাউল কল

পাহাড় অঞ্চল হইতে বহু পরিমাণে পাথর জিলার বাহিরে রপ্তানী হয়। মেজিয়া অঞ্চলে পাথরের বাসনও তৈয়ারী হয়। রায়পুর ও খাতরা থানায় বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত মাইকার সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহার স্থান নাই। এগুলি ভিন্ন আছে কাঠের নানাবিধ শিল্প। প্রায় প্রতি বর্ধিষ্ণু পল্লীগ্রামেই আছে কামারশাল, স্থানীয় কৃষক ও জনসাধারণের দৈনিক ও সাময়িক প্রয়োজন ইহারাই মিটায়।

পাথর

প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র, হাট বাজার ও মেলা।

জিলার প্রধান উৎপন্ন শস্য হইতেছে ধান। পূর্বাঞ্চলে আলু ও আকও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই অঞ্চলে খেজুর গাছের প্রাচুর্য থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে খেজুর গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া নানা প্রকার ডাল ও অন্যান্য রবিশস্য জিলার উৎপন্ন শস্যের অন্যতম। দামোদর ও কাঁসাই সংলগ্ন জমিতে পাটও আবাদ করা হয়। এই সকলকে কেন্দ্র করিয়া বহু ব্যবসায় কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে যেগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে তাহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

উৎপন্ন ফসলের প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র

১। ধান ও চাউল

বাঁকুড়া সদর মহকুমা	ঝাঁটি-পাহাড়ি
	ছাতনা
	বাঁকুড়া
	গঙ্গাজলঘাটি
	ওঁদা
	রামসাগর
	বেলিয়াতোর
	আস্থরিয়া
	বরজোড়া
	মালিয়ারা
	পোখন্না
	মেজিয়া
	রায়পুর
	সারেঙ্গা
বিষ্ণুপুর মহকুমা	বিষ্ণুপুর
	কোতুলপুর
	সোনামুখী
	পাত্রসায়র

কৃষ্ণনগর
বালসি
ইন্দাস

এই সকল কেন্দ্রে যে ধান আমদানি হয় তাহার প্রধান ক্রেতা হইল চাউল কল। আমদানি চাউলের ক্রেতাগণের মধ্যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই প্রধান। সন্নিহিত দুর্গাপুর ও অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রের অভাব মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে চাউল জিলার বাহিরে চলিয়া যায়। ঢেঁকি ছাটা চাউল যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়।

২। আলু ও আক

জিলার প্রায় সর্বত্রই ইহাদের চাষ কমবেশী হইলেও সাধারণতঃ পুর্বাঞ্চলেই প্রাধান্য দেখা যায়। স্থানীয় অভাব পুরণের পর বহু আলু ও আকের গুড় বাহিরে রপ্তানি হয়। আলু ও আকের গুড়ের বিশিষ্ট ব্যবসায় কেন্দ্রসমূহের অধিকাংশই অবস্থিত বিষ্ণুপুর মহকুমায়। ইহাদের মধ্যে সোনামুখী, পাত্রসায়র, ইন্দাস, কোতুলপুর উল্লেখযোগ্য।

৩। খেজুর গুড়

প্রায় সমগ্র বিষ্ণুপুর মহকুমায়ই খেজুর গুড়ের আমদানি লক্ষিত হইলেও এতৎসংক্রান্ত বিশিষ্ট ব্যবসায় কেন্দ্রের মধ্যে সোনামুখী, ইন্দাস ও পাত্রসায়রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৪। ডাল ও অন্যান্য রবিশস্য

নিম্নলিখিত কেন্দ্রে ইহাদের বিশেষ আমদানি দেখা যায়

সদর মহকুমা	বরজোড়া
	মালিয়ারা
	খাতরা
	রায়পুর
বিষ্ণুপুর মহকুমা	বিষ্ণুপুর
	সোনামুখী
	পাত্রসায়র
	ইন্দাস

৫। পাট

জিলায় পাটের চাষ নগণ্য বলা যাইতে পারে। সোনামুখী, রায়পুর ও সারেঙ্গা অঞ্চলেই সাধারণতঃ উৎপন্ন পাট আমদানি হইয়া থাকে।

গৃহ-শিল্পসংস্থার জন্য বহু ব্যবসায়কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল

গৃহ-শিল্পের ব্যবসায়কেন্দ্র

রেশম শিল্প	বিষ্ণুপুর
	বাঁকুড়া
	রাজগ্রাম
	জয়পুর
	গোপীনাথপুর
	সোনামুখী
বয়ন শিল্প	বাঁকুড়া
	রাজগ্রাম
	কেঁওজাকুড়া
	পাঁচমুড়া
	রায়পুর
	বিষ্ণুপুর
	সোনামুখী
	পাত্রসায়র
	মদনমোহনপুর
	বীরসিংপুর
কাংস্য শিল্প	বাঁকুড়া
	বিষ্ণুপুর
	সোনামুখী
	পাত্রসায়র
ইস্পাত-শিল্প	শাসপুর
শঙ্খ শিল্প	বাঁকুড়া
	বিষ্ণুপুর

মৃৎশিল্প সোনামুখী
পাত্রসায়র
ইন্দাস
বিষ্ণুপুর

জনসাধারণের সুবিধার জন্য জিলায় বহু হাট ও বাজার আছে। ইহাদের পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

মেলা

জিলায় যে সকল মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের সংখ্যা দুই শতেরও উপর। মেলার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ ধর্ম বিশ্বাস বা কোন প্রাচীন কাহিনী উপলক্ষ করিয়াই মেলার সৃষ্টি। পরিশিষ্টে প্রচলিত মেলা সমূহের তালিকা দেওয়া হইল। দেখা যায় যে মেলা সমষ্টির মধ্যে শিব বা ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া গাজনের সংখ্যাই প্রধান। উত্তর-মল্লরাজগণের প্রবল বৈষ্ণব প্রীতি এই দুইটি দেবতার গৌরব ম্লান করিতে পারে নাই। গাজন অনুষ্ঠানের তুলনায় বৈষ্ণব অনুষ্ঠানের স্থান নগণ্য। মল্লরাজগণের প্রত্যক্ষ শাসন গণ্ডি বিষ্ণুপুর মহকুমার মোট ৬৬টি মেলার মধ্যে বৈষ্ণব অনুষ্ঠান সংক্রান্ত মেলার সংখ্যা মাত্র ১৬টির বেশী হইবে না। বিষ্ণুপুর শহর ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে যে ১৭টি মেলা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব মেলার সংখ্যা মাত্র ৬টি, শাক্ত কালী বা দুর্গাদেবীকে উপলক্ষ করিয়া মেলা ৫টি।

পল্লী-জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে মেলার এক বিশিষ্ট স্থান আছে। অনেক সময় মেলা অনুষ্ঠানের সহিত প্রধান শস্য অর্থাৎ ধান কাটার সময়ের সামঞ্জস্য থাকে; তখন কৃষকের অবস্থা থাকে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। সুতরাং বৎসরের উপযোগী গার্হস্থ্য-জীবনের বা কৃষি কার্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার কোন অসুবিধা থাকে না। মেলায় এই জাতীয় দ্রব্যের আমদানি হয় বেশী। মেলার অন্য একদিক হইতেছে পল্লীবাসীর চিরন্তন জীবনের কিছু পরিমাণে ব্যতিক্রম ঘটে মেলার সময়। তখন দেখা যায় যে কৃষক পরিবার কোথায়ও বা গোযানে আবার কোথায় ও বা পদব্রজে চলিতেছে মেলার দিকে, নিজ নিজ গতানুগতিক জীবনকে পিছনে ফেলিয়া।

পরিশিষ্ট (১)

প্রত্নতত্ত্ব-পরিচয়

ক। মন্দির।

ইহা সত্যই বলা হইয়াছে যে বাঙ্গালীর স্থাপত্য-ভাস্কর্যের গৌরব, মুষ্টিমেয় কয়েকটি পুরাকীর্তিতেই সীমাবদ্ধ; সেগুলির মধ্যে আবার কি ইমারতগুলির সজীবতায়, কি স্থাপত্য-ভাস্কর্যের কারু-কৌশলে, বাঁকুড়ার মন্দিরগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। জিলায় প্রস্তর তৈয়ারী মন্দিরের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; অবশিষ্ট সবগুলিরই নির্মাণে স্থপতিদের নির্ভর করিতে হইয়াছে পোড়ামাটির ইটের উপর অথবা কঙ্কর বা ঘুটিং-এর উপর। জিলায় ঘুটিং-এর প্রাচুর্য আছে।

অবস্থান অনুসারে মন্দিরগুলির পরিচয় এইরূপ:

১। বিষ্ণুপুর মহকুমা

(১) বিষ্ণুপুর থানা

(ক) বিষ্ণুপুর শহর।

মল্লেশ্বর মন্দির, মদনমোহন, মুরলীমোহন ও মদন গোপালের মন্দির ছাড়াও পুরাতন কেল্লার মধ্যে আছে শ্যাম রায়, লালজি, রাধাশ্যামের মন্দির ও জোড় বাংলা। লালবাঁধের চারিদিকে আছে কালাচাঁদ, রাধা গোবিন্দ, রাধা মাধব ও নন্দলালের মন্দির। পুরাতন রাজপ্রাসাদের নিকট আর একটি জোড় বাংলা ও কয়েকটি ছোট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়; মদন মোহনের নিকটেও আর একটি ভগ্ন মন্দির আছে। কেল্লার বাহিরে আছে রাসমঞ্চ।

প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির নির্মাণ-কাল ও অন্যান্য পরিচয় যাহা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ:

মন্দির	মল্লাব্দ	ইংরেজী সাল	নির্মাতা
মল্লেশ্বর	৯২৮	১৬২২	বীর হাম্বীর
শ্যামরায়	৯৪৯	১৬৪৩	রঘুনাথ সিং
জোড় বাংলা	৯৬১	১৬৫৫	ঐ
কালাচাঁদ	৯৬২	১৬৫৬	ঐ
লালজি	৯৬৪	১৬৫৮	বীর সিং
মদনগোপাল	৯৭১	১৬৬৫	রাজমাতা শিরোমণি বা চূড়ামণি
মুরলী মোহন	ঐ	ঐ	ঐ

	মল্লাব্দ	ইংরেজী সাল	নির্মাতা
মদনমোহন	১০০০	১৬৯৪	দুর্জন সিং
জোড় মন্দির	১০৩২	১৭২৬	গোপাল সিং
রাধা গোবিন্দ	১০৩৪	১৭২৯	গোপাল সিং-এর পুত্র কৃষ্ণসিং
রাধামাধব	১০৪৩	১৭৩৭	রাজমহিষী চূড়ামণি
রাধাশ্যাম	১০৬৪	১৭৫৮	চৈতন্য সিং

মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহারা প্রাচীন বাংলা ভাস্কর্যের একত্র সন্নিবেশিত নিদর্শন। পশ্চিম বাংলার বহু স্থানে এই ভাস্কর্যের নিদর্শন এখনও ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। যে উপাদানে ইহারা গঠিত তাহা হইল পোড়া ইট বা কঙ্কর। ইটের মন্দিরগুলির গাত্রে দেখা যায় নানা প্রকার কারুকার্যের বিচিত্র সমারোহ। ঘুটিং-এর মন্দির গাত্রেও ইহা আছে বটে কিন্তু তাহা এখন সিমেণ্ট ও চুনকামে আবৃত। কারুকার্যের অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের। ইহাতে যে সব কাহিনী উৎকর্ণ আছে তাহা হয় রামায়ণ-মহাভারত অথবা কৃষ্ণচরিত্র হইতে গৃহীত। অধিকাংশ মন্দিরই শ্রীকৃষ্ণ বা রাধায় উৎসর্গিত।

মন্দিরগুলি চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণী হইল মল্লেশ্বর পদ্ধতির, মাত্র একটি চতুষ্কোণ গম্বুজ সংযুক্ত। মদনমোহন, লালজি রাধাশ্যাম বা অনুরূপ মন্দির হইল দ্বিতীয় শ্রেণী, চতুষ্কোণাকৃতি ইমারতের উপর একটি মাত্র গম্বুজ ; মন্দিরের ছাদ বাংলা দোচালা ধরনের। তৃতীয় শ্রেণী হইল শ্যাম রায়, মদনগোপাল ও তদ্রূপ পঞ্চরত্ন ধরনের মন্দির, একই ইমারত কিন্তু পাঁচটি গম্বুজ। চতুর্থ হইল জোড় বাংলা পদ্ধতির মন্দির, বাংলা দেশের খড়ের কুটিরের আকৃতি বিশিষ্ট দুইটি ইমারত পরস্পর সংলগ্ন, উপরে ছোট একটি গম্বুজ।

মল্লেশ্বর শৈব মন্দির মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অন্যগুলি বৈষ্ণব মন্দির ; মল্লরাজগণের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর নির্মিত। মদন-গোপাল মন্দিরের বিশেষত্ব ঘুটিং-এ নির্মিত পঞ্চরত্ন ধরনের ইহাই একমাত্র নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে জোড় বাংলা ধরনের মন্দির বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। পোড়া ইটের উপর কারুকার্যের চমৎকার নিদর্শন দেখা যায় শ্যাম রায়ের মন্দিরে, উৎকীর্ণ চিত্রে মন্দির গাত্র ঢাকা। মদনমোহন মন্দিরটিও সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী।

রাসমঞ্চ যে কোন্ সময় নির্মিত হয় তাহার কোন নিদর্শন ইহার গাত্রে নাই। তবে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে ইহার নির্মাতা রাজা বীর হাম্বীর। ইমারতটি অদ্ভুত ধরনের, ভিত্তি বেশ উঁচু, উপরিভাগ অনেকটা পিরামিড্ আকৃতির। এখানে আছে একটি সুবৃহৎ চতুষ্কোণাকৃতির ঘর, ইহার প্রত্যেক পার্শ্বে তিনটি করিয়া দীর্ঘ আবৃত বারান্দা, বারান্দার প্রবেশমুখে যথাক্রমে ১০টি, ৫টি ও ৩টি দরজা। পূর্বে রাস উৎসবের সময় রাধাকৃষ্ণের বহু মূর্তির সমাবেশ হইত এখানে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইমারতটি বর্তমানে জীর্ণ দশায়।

(খ) ধরাপাট

স্থানটির অবস্থান বিষ্ণুপুরের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে, বিষ্ণুপুর—পানাগড় রাস্তার চতুর্থ মাইলের কিছু পশ্চিমে। স্থানটি এক সময় জৈন ধর্মের একটি উপাসনা কেন্দ্র ছিল বলিয়া বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :

"ধরাপাটের সুপ্রাচীন জৈন উপাসনা কেন্দ্রটি পর্যায়ক্রমে জৈন, বিষ্ণু (বাসুদেব) ও চৈতন্য প্রবর্তিত কৃষ্ণপুজা স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্মিত ধরাপাটের পরিচ্ছন্ন রেখ-দেউল ছাড়া প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় যে-দেউলটির ভগ্নাবশেষ অদূরেই অবস্থিত সেটির নির্মাণকাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় এটি ডিহরের ষাঁড়েশ্বর বা শৈলেশ্বর মন্দিরের সম-সাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। ধরাপাটের অধুনা বিদ্যমান মন্দিরটির গাত্রে দুটি জৈন তীর্থঙ্করের ও একটি বিষ্ণু (বাসুদেব) মূর্তি নিবদ্ধ থাকায় ও নিকটেই বিষ্ণু-বিগ্রহে রূপান্তরিত আর একটি জৈন-মূর্তির অবস্থিতির জন্য প্রাচীনকালে ধরাপাট যে পর্যায়ক্রমে জৈন ও বিষ্ণুপুজাস্থল রূপে ব্যবহৃত হয়েছে প্রমাণিত হয়। ধরাপাটের সর্বশেষ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কাল পণ্ডিতেরা ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ অথবা ১৬২৬ শকাব্দ বলে নির্ণয় করেছেন। ......দেবালয় বিগ্রহ শ্যামচাঁদ। .. ...রতন কবিরাজের মদন মোহন বন্দনা থেকে জানা যায় যে ধরাপাটের অদ্বেষ-রাজা বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের সামন্ত শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পক্ষে দীক্ষিত বৈষ্ণব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মন্দিরটি তাঁর দ্বারা তাঁরই সময় কৃষ্ণপুজার জন্য স্থাপিত। মন্দির গাত্রে পূর্বতন কালের দুটি জৈন তীর্থঙ্কর ও একটি বিষ্ণু (বাসুদেব) বিগ্রহের অবস্থান শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমের ঔদার্য প্রণোদিত মনে করাই সঙ্গত।"

(গ) ডিহর।

বিষ্ণুপুর হইতে প্রায় চার মাইল উত্তর-পুর্বে ডিহর। এখানে প্রাচীন রেখ-দেউল পদ্ধতির যে দুইটি অধুনা-ভগ্ন মন্দির দেখা যায়, পুরাতত্ত্ববিদগণের নিকট তাহা তাৎপর্যপুর্ণ। মন্দির দুইটি শৈব মন্দির, নাম ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর বা শম্বেশ্বর। মন্দির-স্থাপত্যকলায় এই দুইটি বহুলাড়া ও এক্তেশ্বর মন্দিরের সহিত একই পর্যায়ের বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে মন্দির নির্মাণ করেন রাজা পৃথ্বীমল্ল (ইং ১২৯৫-১৩১৯)।

কিন্তু বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মন্দিরগুলি নির্মিত হয় খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে। প্রাক্তন একজন প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ স্পুনার সাহেব (O. P. Spooner) তাঁহার ইং ১৯১০-১১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে তৎকালে বাৎসরিক গাজন মেলায় অন্ততঃ ২০,০০০ লোক এই স্থানে সববেত হইত।

(২) জয়পুর থানা।

সলদা গ্রামের গোকুল চাঁদের মন্দির।

অনেকে মনে করেন যে এই মন্দিরটিই সম্ভবত বাঁকুড়া জিলার প্রাচীনতম "বাংলা মন্দির"। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, ল্যাটারাইট্ নির্মিত। মন্দির নির্মাণ করেন রাজা চন্দ্রমল্ল (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক)। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

(৩) সোনামুখী থানা

সোনমুখীর গিরি-গোবর্ধন মন্দিরটি স্থাপত্য ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য মনোহরদাসের নামে উৎসর্গিত একটি মনোরম মন্দিরও এখানে আছে।

২। বাঁকুড়া সদর মহকুমা।

(১) বাঁকুড়া থানা

(ক) বাঁকুড়া শহরের সর্বপ্রাচীন মন্দির হইতেছে রামপুর এলাকার রঘুনাথ মন্দির। ইহার নির্মাণকাল, ১৫৬১ শকাব্দ অর্থাৎ ইং ১৬৪০ সাল বলিয়া কথিত হয়।

(খ) একতেশ্বর

বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পুর্বে দ্বারকেশ্বর নদের উপর একতেশ্বর শিবমন্দির। স্বর্গতঃ যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে একতেশ্বর

"একপাদেশ্বর" কথার সংক্ষিপ্ত, বেদে "একপাদেশ্বরের" উল্লেখ আছে। মন্দিরটির নির্মাণ সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে বহুকাল পুর্বে মল্লভূম ও সামন্তভূমের রাজাদের মধ্যে রাজ্য-সীমা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের মীমাংসা করেন স্বয়ং শিব; তাঁহারই সিদ্ধান্ত অনুসারে দুই রাজ্যের মধ্যে যে সীমারেখা নির্ধারিত হয় সেই সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় এই মন্দির। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক বেগলার সাহেব এই মন্দির সম্বন্ধে বলেন:

"স্থাপত্য-কলার দিক দিয়া একতেশ্বর মন্দির এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। ভিত্তির গঠন প্রণালী সহজ ধরনের হইলেও আমার দেখা এই জাতীয় অন্যান্য ইমারতের গঠনের তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও সুদৃঢ়। মন্দির নির্মিত হয় ল্যাটেরাইট-এ, পরে চুন, বালি ইট যোগ হইয়াছে। মন্দিরটিতে যে তিনবার মেরামত ও পুনরুদ্ধারের কাজ হইয়াছে তাহার চিহ্ন আছে।......ভিতরে যে লিঙ্গমূর্তি আছে তাহাই উপাস্য দেবতা। লিঙ্গটি স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হয়।"

(২) ওঁদা থানা

(ক) বহুলাড়া

ওঁদাগ্রাম রেল স্টেশনের প্রায় তিন মাইল উত্তর-পুর্বে দ্বারকেশ্বর নদের অনতিদূরে বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিব-মন্দির—জিলার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির-স্থাপত্য-কীর্তি। বেগলার সাহেবের মতে ইটের তৈয়ারী এইরূপ উৎকৃষ্ট ধরনের মন্দির তিনি বাঁকুড়া জিলার অন্যত্র বা বাংলাদেশের কোথায়ও দেখেন নাই, যদিও ইহা অপেক্ষা বৃহদায়তনের মন্দির থাকিতে পারে। মন্দিরটি রেখদেউল পদ্ধতির এক বিচিত্র নিদর্শন। ইহার নির্মাণকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা নির্মিত হয় খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকে, আবার কেহ কেহ নির্মাণকাল নিরূপণ করেন দশম শতকে। মন্দিরের গর্ভগৃহের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত আছেন সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ; পশ্চাতে গণেশ ও দশভূজার প্রস্তরমূর্তি আর ইহাদের মধ্যস্থলে প্রায় চার ফুট উচ্চ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রস্তর মূর্তি। এই জৈনমূর্তি ও মন্দির সংলগ্ন জৈন কুষ্টির ধ্বংসাবশেষগুলির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে আদিতে বহুলাড়া ছিল জৈনধর্মের একটি কেন্দ্র; বর্তমান মন্দিরটি সম্ভবত জৈন-যুগে নির্মিত; পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে শিব যখন নিজকে প্রতিষ্ঠা করেন শিবঠাকুরের জন্য পৃথক মন্দির নির্মিত হয় নাই।

(খ) সোনাতোপল

বাঁকুড়া শহর হইতে বিষ্ণুপুরগামী রাস্তা যেখানে দ্বারকেশ্বর নদ অতিক্রম করিয়াছে, সেই স্থান হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পূর্বে ভেদুয়াশোল রেল স্টেশনের অদূরে বালিয়াড়া গ্রামের উপকণ্ঠে সোনাতোপলের মন্দির। মন্দিরটি দেউল স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন ও অনেকের মতে সর্বভারতীয় স্থাপত্য-ক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্য। বেগলার সাহেব মন্দিরটিকে অতিশয় দৃঢ় গড়নের ও মন্দির গাত্র অসম্ভব রকমের স্থূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সংস্কার অভাবে ইহার জীর্ণ-দশা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বেগলার সাহেবের সময়েই ইহা আকৃতিহীন স্তূপে পরিণত হইতেছিল। স্থানীয় কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিয়া বেগলার সাহেব মন্দিরটিকে রাজা শালিবাহনের মন্দির ও অদূর-বর্তী দ্বারকেশ্বর তীরের কয়েকটি প্রাচীন মৃত্তিকাস্তূপকে শালিবাহনের গড় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই শালিবাহন রাজা কে ছিলেন জানা যায় না। স্বর্গত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতক। কেহ-কেহ বলেন যে আদিতে ইহা ছিল এক জৈন মন্দির। বর্তমানে মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই।

(গ) ছিনপুর

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর শড়কের উপর অবস্থিত রামসাগরের নিকটেই ছিনপুর, বিষ্ণুপুরের প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এখানে পোড়ামাটির ইটে তৈয়ারী এক জীর্ণ মন্দির শ্যামসুন্দরের মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। মন্দিরটি মল্লরাজগণ নির্মাণ করেন বলিয়া বিশ্বাস।

(৩) ছাতনা থানা

ছাতনার মন্দির

বেগলার সাহেব বলেন "ছাতনার প্রধান দ্রষ্টব্য হইল কয়েকটি মন্দির ও ইটের দেয়াল ঘেরা ধ্বংসস্তূপ। ইটের মন্দির ও চারিপাশের দেয়াল বহুকাল পূর্বেই স্তূপে পরিণত হইয়াছে কিন্তু পোড়ামাটির ইটে তৈয়ারী মন্দির এখনও বর্তমান। মন্দির নির্মাণে যে ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাদের প্রায় সবগুলিতেই লিপি খোদিত আছে; লিপি হইতে যে নাম পাওয়া যায় তাহা আমার মতে 'কোনাহ উত্তর-রাজ' কিন্তু পণ্ডিতগণ পাঠ করেন 'হামীর উত্তর-রাজ'। শেষের দিকে যে সময় উল্লেখ আছে তাহা সবগুলিতেই একরূপ—১৪৭৬ শকাব্দ।"

(৪) তালডাংরা থানা

(ক) সাবরাকোণ

বিষ্ণুপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সাত মাইল মণ্ডি, মণ্ডি হইতে সাবরাকোণ তিন মাইল। এখানে যে রামকৃষ্ণ মন্দির আছে ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মল্লরাজগণ। মন্দিরের বিগ্রহ কৃষ্ণপাথরের, কিন্তু মনোহর।

(খ) হারমাসরা

বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। এখানে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরটি আবিষ্কার করেন পুরাতত্ত্ব বিশারদ দীক্ষিত মহাশয় (K. N. Dikshit)। একটি বৃহদায়তন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিও এখানে আবিষ্কৃত হয়। অনেকের অভিমত যে এইস্থানে পশ্চিম হইতে আগত জৈন ধর্ম প্রচারকগণ একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৫) রাণীবাঁধ থানা

পরেশ নাথ। স্থানটি অম্বিকা নগরের অদূরে কুমারী নদীর উপরে। প্রাচীন জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া গিয়াছে; আর পাওয়া গিয়াছে জৈন তীর্থঙ্করের বহু পাথরে খোদাই মূর্তি। পার্শ্বনাথের প্রায় ছয় ফুট উচ্চ বৃহদায়তন প্রস্তর মূর্তি এখনও এইস্থানে রক্ষিত আছে। স্থানটি যে একসময় জৈন ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল তাহা ইহার নামই প্রকাশ করে।

খ। অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয়

১। বিষ্ণুপুর মহকুমা

(১) বিষ্ণুপুর গড়

গড় বা কেল্লার চারিদিকে মাটির উঁচু দেয়াল; ইহা ঘিরিয়া আছে প্রশস্ত পরিখা। ল্যাটেরাইটে নির্মিত এক বিরাট ফটক কেল্লার প্রবেশদ্বার, নাম পাথর দরজা। প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বের প্রাচীর গাত্রে ছোট ছোট ফাঁক, এইগুলি করা হইয়াছিল তীরন্দাজ বা গোলন্দাজ সৈন্যদের শত্রু আক্রমণ প্রতি-রোধের জন্য। প্রধান পথটির দুই পার্শ্বে ছিল দীর্ঘ আবৃত স্থান, দ্বিতল। উপর-তলা মেরামত-অভাবে জীর্ণ। কেল্লার পশ্চিম প্রাকার ঘেঁষিয়া একটি প্রবেশ-দ্বারশূন্য প্রাচীন ইমারত; উপরিভাগ মাত্র উন্মুক্ত, কোন গবাক্ষ বা পথ নাই। ইহা হইল "গুমঘর।" মল্লরাজগণের সময় অপরাধীগণকে উপর হইতে ইহার

মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত। তলদেশে ও পার্শ্বের প্রাচীরে লৌহ-শলাকা প্রোথিত থাকায় ইহারা বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিত।

(২) দলমাদল ও অন্যান্য কামান, বিষ্ণুপুর

ইতস্ততঃ যে কয়টি কামান পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে দলমাদলের ভাস্কর্য-নৈপুণ্য বিস্ময়কর। যদিও বহুকাল উন্মুক্তস্থানে পড়িয়া আছে, কালপ্রবাহ ইহার সৌন্দর্য বা ভাস্কর্য-নৈপুণ্যকে ম্লান করিতে পারে নাই। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ ফুট; মুখের দিকে ইহার পরিধি ১১½ ইঞ্চি, অবশিষ্টাংশে ১১¾ ইঞ্চি। বহির্ভাগ মসৃন, কৃষ্ণবর্ণ। কেল্লায় প্রবেশ পথের বাহিরে উচ্চ-ভূমিখণ্ডের উপর আছে চারটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কামান; দুইটি ফাটিয়া গিয়াছে, অন্য দুইটি হইতে এখনও বৎসরে মাত্র একবার তোপধ্বনি করিয়া মল্লভূমবাসীদের সন্ধিপুজার সময় জানাইয়া দেওয়া হয়।

(৩) বাঁধ, বিষ্ণুপুর

পুরাতন দুর্গ প্রাকারের ভিতর ও শহরের উপকণ্ঠে আছে সাতটি বিশাল জলাশয় বা বাঁধ; ইহাদের পরিচয় লাল বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, গাঁতাত বাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী-বাঁধ, শ্যাম-বাঁধ, পোকা-বাঁধ। লাল-বাঁধের জলরাশি বেষ্টন করিয়া ছিল মল্লরাজগণের সুপরিকল্পিত উদ্যান ও প্রমোদভবন। জলাশয়গুলি হইতে মাত্র যে বিষ্ণুপুর নগরী ও দুর্গে সুপেয় জল সরবরাহ করা হইত তাহা নহে; বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইহাদের জলে দুর্গ-পরিখা পরিপুর্ণ করিতে বিলম্ব হইত না। বাঁধগুলি সংস্কারাভাবে মজিয়া গিয়াছে; কোনটির বেশীর ভাগই ধানক্ষেতে পরিণত হইয়াছে।

(৪) পীর ইসমাইল গাজী—লোকপুর, জয়পুর থানা

বিষ্ণুপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে কোতুলপুর শড়কের নিকটেই লোকপুর। এখানে আছে পীর ইসমাইল গাজীর দরগা। ইসমাইল গাজী ছিলেন মুসলমান ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট নেতা। গড় মান্দারণের হিন্দু রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় বলিয়া কিংবদন্তি আছে। গড় মান্দারণে পীর সাহেবের সমাধি আছে। এই পীর মুসলমান, অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। খৃষ্টীয় যোড়শ-শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে পীর সাহেবের বন্দনা গাহিয়াছেন:

"মান্দারণ গড়ে বন্দিব পীর ইসমাইলি।
পীর ইসমাইলি সঙরিয়া পথ চলি যায়।
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়।"

(৫) ময়নাপুর

ময়নাপুরের সহিত ধর্ম-মঙ্গলোক্ত ময়না-নগর বা ময়নাগড়ের অভিন্নতার উল্লেখ গ্রন্থের মূল অংশে করা হইয়াছে। ধর্ম-মঙ্গলের রামাই পণ্ডিতের বংশধর পরিচয়ে এক শ্রেণী এখানে বসবাস করেন। ময়নাপুরে হাকন্দ দীঘি বা হাকন্দ পুখর নামে যে জলাশয় আছে, তাহার জল অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। স্থানটি এক সময় ধর্মপূজা প্রবর্তনের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল; বিভিন্ন পরিচয়ে বহু ধর্ম-ঠাকুর এখনও এখানে পুজিত হন। ময়নাপুর অতীতে তন্ত্র উপাসনারও একটি কেন্দ্র ছিল; বিশিষ্ট তান্ত্রিক কালি প্রসাদ বিগত অষ্টাদশ শতকে এখানে বাস করিতেন।

(৬) শ্যামসুন্দর গড়

কোতুলপুরের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই প্রাচীন গড়টির চিহ্ন দেখা যায়।

২। সদর মহকুমা

(১) নতুনগ্রাম

বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠস্থিত রাজগ্রাম হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে নতুন-গ্রাম। প্রাচীন গড়ের চিহ্ন ও একটি উচ্চ ঢিবি প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধান অপেক্ষায় আছে।

(৩) ছাতনা—বোল পুখরিয়া

ছাতনায় বোলপুখরিয়া নামে একটি নাতিবৃহৎ সুগভীর জলাশয় আছে। সাধারণের বিশ্বাস যে এই জলাশয়ে কখনও জলাভাব হয় না। বোলপুখরিয়া সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ছাতনার রাজগণ ছিলেন পরাক্রান্ত। বাসলি দেবী ছিলেন তাঁহাদের উপাস্য দেবী। সেই সময় একদিন কোন এক শাঁখারী শাঁখা বিক্রয়ের জন্য জলাশয়টির নিকট দিয়া যাইতেছিল। জলাশয়ের নিকট অষ্টম বর্ষীয়া এক কুমারী তাহার নিকট শাঁখা পড়িতে চায়। শাঁখারী যখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল যে শাঁখার দাম কে দিবে, সে তাহাকে বলিল যে বাসলি দেবীর দেঘরিয়া বা পুরোহিত তাহার পিতা, তিনিই দাম দিবেন,

আর এই বাবদ অর্থ ঘরের দেয়ালের কুলুঙ্গীতে গচ্ছিত আছে। বালিকাকে শাঁখা পড়াইয়া শাঁখারী পুরোহিতের নিকট দামের জন্য উপস্থিত হইলে তিনি বিস্মিত হইলেন, কারণ তাঁহার কোন কন্যা ছিল না। শাঁখারীর নির্দেশমত দেয়ালের কুলুঙ্গী খুঁজিয়া যাহা পাইলেন তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন, শাঁখার যাহা দাম সেই পরিমাণ অর্থ সেখানে আছে। পুরোহিত তখন শাঁখারীকে সঙ্গে করিয়া বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন কিন্তু বোলপুখরের তীরে কোন স্থানেই তাহাকে পাইলেন না। দৈবী মায়া বুঝিতে পারিয়া পুরোহিত অভিভূত হইয়া পড়িলেন আর সেই সময়েই জলের উপর ভাসিয়া উঠিল শঙ্খ-বলয়িত দুইখানি হাত, পরক্ষণেই আবার তাহা জলে মিশিয়া গেল।

এই কাহিনীর সহিত বর্ধমান জিলার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা-কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।

(৩) শুশুনিয়া শিলা-লেখ

শুশুনিয়ার অবস্থান ছাতনার প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে। এখানে পাহাড় গাত্রে রাজা চন্দ্রবর্মার যে শিলা-লেখ উৎকীর্ণ আছে, পণ্ডিতগণের মতে তাহা পশ্চিম বঙ্গে এ-যাবৎ প্রাপ্ত যাবতীয় শিলা লেখ সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। এই চন্দ্রবর্মা ছিলেন পুষ্করণের অধিপতি। পুষ্করণ বর্তমান পোখরনা। রাজা চন্দ্রবর্মা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থে বলা হইয়াছে।

(৪) শিখর গড়, রায়পুর

রায়পুরের নিকট কাঁসাই নদীর তীরে শিখর গড়। একটি প্রাচীন গড়ের চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়; নাম শিখর গড়। গড়ের মধ্যে আছে প্রাচীন জলাশয়, শিখর সায়র। ইহার পশ্চিম তীরে আছে একটি প্রাচীন সমাধিস্থান, কিংবদন্তি অনুসারে এই সমাধিস্থান হইল শিখররাজের সেনাপতি মীরণ শাহের। শিখর-রাজা সম্বন্ধে গ্রন্থের মূলভাগে বলা হইয়াছে।

রায়পুরের নিকট শাঁখারিয়া নামে একটি জলাশয় আছে; ইহার তীরে মহামায়ার মন্দির। শাঁখারিয়া সম্বন্ধে ছাতনার বোলপুখুরিয়ার অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে।

(৫) অসুর গড়

পুর্বে সাবরাকোণের রামকৃষ্ণ মন্দিরের উল্লেখ করা হইয়াছে। সাবরাকোণের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে একটি প্রাচীন গড়ের নিদর্শন পাওয়া যায়; ইহা অসুরগড় নামে পরিচিত।

(৬) পাথাইমা, বরজোড়া

পাথাইমার অবস্থান দামোদর তীরে। এখানে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসা-বশেষ আছে।

(৭) অম্বিকা নগর

রাণীবাঁধ থানার অম্বিকানগরে আছে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

পরিশিষ্ট (২)

বাঁকুড়ার কয়েকজন প্রখ্যাত মনীষী

বহু খ্যাতনামা মনীষী জিলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহাদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইয়াছে তাঁহাদের কথা নিম্নে দেওয়া হইল :

১। রামাই পণ্ডিত।

ধর্ম মঙ্গল কাব্যে রামাই পণ্ডিত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। অনেকের মতে রামাই পণ্ডিতই ধর্ম-ঠাকুরের পুজার প্রবর্তক। তাঁহার রচিত ধর্ম-পুজা বিধান "শূন্য-পুরাণ" নামে পরিচিত। রামাই পণ্ডিতের বাসভূমি লইয়া মতভেদ আছে। প্রাচীন ধর্ম কাব্যের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলেন যে বর্ধমান জিলায় বল্লুকা নদীর তীরেই আবির্ভূত হইয়া তিনি ধর্মপুজার প্রচলন করেন। আবার বহু পণ্ডিতের মতে বাঁকুড়া সলদা-ময়নাপুরই ছিল তাঁহার বাসভূমি ; এখানে তাঁহার বংশধরগণ এখনও বাস করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ধর্মপুরাণে রাণী রঞ্জাবতীর পুত্রসন্তান লাভের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহা হইতে মনে হয় যে সেই সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতকেই এই অঞ্চল ধর্মপুজার এক বিশেষ কেন্দ্র হইয়া ওঠে ও ইহার মূলে ছিলেন রামাই পণ্ডিত। ধর্মপুজার প্রথম প্রচলন যে এই অঞ্চলেই হয় ইহার উল্লেখ পুর্বে করা হইয়াছে। পুজা প্রচলনের সহিত ইহার প্রসার হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বল্লুকার তীরে একটি কেন্দ্রের আবির্ভাব অযৌক্তিক নহে।

২। বড়ু চণ্ডিদাস।

"শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" পুঁথি রচয়িতা বড়ু চণ্ডিদাস যে ছাতনায় বাসলি দেবীর সেবক ছিলেন তাহা একরূপ স্বীকৃত। বড়ু চণ্ডিদাসের আবির্ভাব সময় খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে, অর্থাৎ চৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে। কথিত আছে যে চৈতন্য "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" পুঁথির বিশেষ সমাদর করিতেন। কাহিনী প্রচলিত আছে যে ছাতনার অনতিদূরে শালতোড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ছাতনার রাজা হামীর উত্তর রায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া চণ্ডিদাসের অগ্রজ দেবিদাসকে বাসলি দেবীর পুজারী ও চণ্ডিদাসকে পুজোপহার সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। চণ্ডিদাস এই ছাতনায়ই "নান্নুর মাঠে" পত্রের কুটীরে ভজন করিতেন ও তাঁহার সুললিত পদাবলী রচনা করেন।

৩। শ্রীনিবাস আচার্য

মল্লরাজ বীর হাম্বীরের দীক্ষাগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম হয় বর্ধমান জিলার চাকুন্দি গ্রামে এক বৈষ্ণব পরিবারে। তিনি ঠাকুর নরহরি সরকারের সান্নিধ্য লাভ করেন ও সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে বহু মূল্যবান বৈষ্ণব গ্রন্থাদি সহ তিনি বাংলাদেশে যাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে মল্লভূমে রাজা বীর হাম্বীরের অনুচরগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হন। লুণ্ঠিত পুঁথিগুলির শোকে মুহ্যমান শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ইহাদের অনুসরণ করেন এবং এখানে রাজসভায় ভাগবত পাঠে রাজাকে এইরূপ মুগ্ধ করেন যে রাজা সপরিবারে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। বিষ্ণুপুর রাজ তাঁহার বসবাসের জন্য বহু ভূমি ও গৃহাদি দান করেন। পরজীবনে ইনি সংসার ধর্ম গ্রহণ করেন।

৪। মাণিকরাম গাঙ্গুলী

ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়া মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস ছিল বেলডিহা। কেহ কেহ মনে করেন যে ইং ১৬৯৪ হইতে ১৭৪৮ সালের মধ্যে তিনি তাঁহার পুঁথি রচনা করেন কিন্তু ডঃ সহিদুল্লার মতে ইহা রচিত হয় ইং ১৬৫৪ সালে।

৫। সীতারাম।

অন্য একজন ধর্ম মঙ্গল রচয়িতা ছিলেন সীতারাম, ইন্দাসের অধিবাসী। তাঁহার রচনার সময় ইং ১৫৯৭ সাল। সীতারামের রচনা সরল, কবিত্ব বর্জিত "সীতারাম গায় গান ধর্মের কারণে"।

৬। প্রভুরাম।

ইনিও ধর্মমঙ্গল পুঁথি রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। পুঁথিতে নিজ পরিচয় দিয়াছেন ঃ

"মল্লভূমে বাটি ফুল্যার মুখটি
শ্রীযুত জানকীরাম
তস্য সুত গায় সখা ক্ষুদিরায়
সেবকে পুরহ কাম।"

প্রভুরাম ক্ষুদিরায় নামীয় ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন। পুঁথি রচনার সময় ইং ১৬৬৬ সাল।

৭। গোবিন্দ রাম

মল্লভূমের আর একজন ধর্মমঙ্গল প্রণেতা ছিলেন গোবিন্দরাম। স্বর্গতঃ

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহার পুঁথিতে যে ১০৭১ সালের উল্লেখ করা হইয়াছে অনেকের মতে তাহা মল্লাব্দ অর্থাৎ ইং ১৭৬৫ সাল।

৮। শঙ্কর কবিচন্দ্র

তিনি রাজা বীরসিং-এর সম-সাময়িক একজন কবি (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ)। জন্মস্থান ছিল বিষ্ণুপুরের নিকট পান্নুয়া। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ ছাড়াও তিনি শিবমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল নামে দুইখানি কাব্য ও একখানি পাঁচালি রচনা করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সার সঙ্কলন করিয়া তিনি যে অনুবাদ কাব্য রচনা করেন তাহা এক সময় বৈষ্ণব-সমাজে শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইত।

৯। শুভঙ্কর রায়

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর ছিলেন মল্লরাজগণের একজন পদস্থ কর্মচারী। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে আসুরিয়া হইতে রামপুর পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ খাল খনিত হইয়া এক বিস্তীর্ণ উষর অঞ্চলকে কৃষির উপযোগী করে, ইহা এখনও "শুভঙ্কর দাঁড়া" নামে পরিচিত। শুভঙ্করের আর্যার সহায়তায় ইদানীং পর্যন্ত বাংলাদেশের যাবতীয় বৈষয়িক হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হইত।

১০। কাশীনাথ বাচস্পতি

রাজা গোপাল সিং-এর সভার একটি উজ্জ্বল-রত্ন ছিলেন কাশীনাথ বাচস্পতি। তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন ও স্মার্ত রঘুনন্দনের টীকা ভিন্নও অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

১১। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমেই সঙ্গীতাচার্য হিসাবে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রাচীনকালের গুরুগৃহের আদর্শে শিষ্যদের নিজ গৃহে রাখিয়া নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে ছিলেন স্বনাম-খ্যাত যদুভট্ট।

১২। যদু ভট্ট।

ইঁহার প্রকৃত নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য যন্ত্রসঙ্গীতে বিষ্ণুপুরে সুনাম অর্জন করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের উপর যদুনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সঙ্গীতবিশারদ রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন; তখন যদু বালক মাত্র আর রামশঙ্করের বয়স

প্রায় ৯০। পরে কলিকাতার বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ও বর্ধমান, ত্রিপুরা ও পঞ্চকোটের রাজসভায় গান করিয়া তিনি অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দেন। বাংলাদেশে ধ্রুপদ গানের চর্চার প্রসার ও প্রচারে যদু ভট্টের বিশেষ অবদান আছে।

১৩। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরের অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গোপেশ্বর অনন্তলালের পুত্র। পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতিতে কৃতবিদ্য হন ও পরে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে শিক্ষালাভ করেন। গোপেশ্বর ছিলেন একজন অদ্বিতীয় সঙ্গীত পরিবেশক। সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন তিনি। সঙ্গীতানুশীলন ও সর্বসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত প্রচারকে তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সঙ্গীত পদ্ধতিতে তাঁহার কৃতিত্ব থাকিলেও ধ্রুপদ সঙ্গীতেই তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৪। বিষ্ণুপুরের অন্যান্য বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্যের মধ্যে সুপরিচিত হইতেছেন

(১) দীনবন্ধু গোস্বামী। বিগত শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত সঙ্গীত-বিশারদ।

(২) গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী। ইনি ময়মনসিংহের রাজ-সভা অলঙ্কৃত করিতেন।

(৩) রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীতে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন; পরে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সঙ্গীতাচার্য হন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ জ্ঞান গোস্বামী ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

(৪) ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিক্ষাগুরু।

(৫) রামকেশব ভট্টাচার্য। ইনি প্রথমে কুচবিহারের রাজসভায়, পরে কলিকাতার রামদুলাল দের গৃহে সঙ্গীতাচার্য নিযুক্ত হন।

(৬) কেশবলাল চক্রবর্তী। কলিকাতায় বিশিষ্ট ধনী তারকলাল প্রামাণিকের সঙ্গীতাচার্য ছিলেন।

১৫। রামশরণ শর্মা। ইঁহার যাত্রাদল বিগত শতাব্দীতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৬। ব্রজনাথ রজক। অন্য একজন জনপ্রিয় যাত্রাকার।

১৭। গৌরী ন্যায়ালঙ্কার। ইনি ছিলেন ইন্দাসের অধিবাসী ও একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে "ইঁদেসের গৌরী পণ্ডিত" নামে অমর হইয়া আছেন।

১৮। গদাধর শিরোমণি। পুরান-কথকতার প্রবর্তক হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইঁহার নিবাস ছিল সোনামুখী।

১৯। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন।

২০। অক্ষয়কুমার সেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সমাজে জনপ্রিয় "শ্রীরামকৃষ্ণ" পুঁথি রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের নিবাস ছিল ময়নাপুর।

২১। যামিনীরঞ্জন রায়। শিল্প-কলাজগতে সুপরিচিত যামিনীরঞ্জনের পিতৃভূমি হইতেছে বেলিয়াতোড়।

২২। বসন্তরঞ্জন রায়।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ মহাশয় একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনিও বেলিয়াতোড়ের অধিবাসী।

২৩। যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যাবিনোদ।

আদি বাসভূমি হুগলি জিলার আরামবাগ হইলেও ইনি বাঁকুড়া শহরেই বসবাস করেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ইঁহার নাম সুদূর বিস্তৃত হয়। সংস্কৃত ছাড়াও ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত লেখক ; বৈদিক সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থগুলি তাঁহার বিশেষ অবদান। পুরাতত্ত্ব বিষয়েও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং ইহাতে তিনি যে প্রেরণার সৃষ্টি করেন তাহারই স্মৃতি চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুরের মিউজিয়ামের নামকরণ হইয়াছে "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন"।

২৪। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ও জাতীয় সংস্কৃতির পতাকাবাহী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া শহরে পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতৃপুরুষদের প্রায় সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন, কাহারও কাহারও নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল। রামানন্দ ছিলেন একাধারে সুদক্ষ লেখক, সমাজ-সংস্কারক এবং রাজনীতিজ্ঞ।

২৫। সত্যকিঙ্কর সাহানা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও সাহিত্য-সেবী সত্যকিঙ্কর সাহানার জন্মস্থান ইন্দাস থানার শুঁড়িপুকুর। শুঁড়িপুকুরের সাহানা পরিবার প্রাচীন ও সুখ্যাত। কর্মজীবনে বাঁকুড়া শহরেই বসবাস করিতেন। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিতও জড়িত ছিলেন।

পরিশিষ্ট (৩)

জিলার কয়েকটি বিশিষ্ট হাট ও বাজার

থানা	স্থান	বসিবার দিন	আমদানি দ্রব্যাদি
বাঁকুড়া	বড়বাজার	দৈনিক	ডাল-কলাই, সবজি, মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মসলাপাতি, ফল ইত্যাদি
"	নূতনগঞ্জ	"	ঐ
"	রাজগ্রাম	"	ঐ
"	কেওজাকুঁড়া	"	ঐ
ছাতনা	ছাতনা	"	ধান, ডাল-কলাই, সবজি, মাছ
"	ঝাঁটিপাহাড়ি	"	ঐ ও চাউল
গঙ্গাজলঘাটি	গঙ্গাজলঘাটি	মঙ্গলবার শনিবার	ঐ
ওঁদা	ওঁদাহাট	ঐ	চাউল, মাছ
"	রামসাগর	দৈনিক	চাউল, ধান, মসলাপাতি, সবজি
বরজোরা	বেলিয়াতোর হাট	সোম, বৃহস্পতি শুক্র, শনিবার	ঐ ও মাছ
"	আস্থরিয়া	রবি, বৃহস্পতি	ঐ
"	বরজোরা	দৈনিক	চাউল, ডাল-কলাই, সবজি
"	মালিয়ারা	রবি, বৃহস্পতি	ঐ
"	পোথন্না	শনি, মঙ্গলবার	চাউল, মাছ, সবজি
মেজিয়া	মেজিয়া	দৈনিক	ডালকলাই, চাউল, সবজি, দুধ, মাছ, মসলাপাতি
শালতোরা	তিলুরি	ঐ	ঐ
খাতরা	খাতরা	বুধবার	সবজি, ডালকলাই
"	মালিয়ান	রবিবার	ঐ
রাণীবাঁধ	ক্ষীরখান	ঐ	ঐ

থানা	স্থান	বসিবার দিন	আমদানি দ্রব্যাদি
রাণীবাঁধ	হলুদকাঁদি	শনিবার	সবজি, ডালকলাই
”	রুদ্রা	বুধবার	ঐ
”	অম্বিকানগর	বৃহস্পতিবার	ঐ
বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর	দৈনিক	ডালকলাই, চাউল, ধান, সবজি, মাছ, দুধ, ডিম, ফল, মসলাপাতি ইত্যাদি
কোতুলপুর	কোতুলপুর	বুধবার	ঐ
সোনামুখী	সোনামুখী	দৈনিক	ঐ
পাত্রসায়র	পাত্রসায়র	ঐ	ঐ
”	কৃষ্ণনগর	শনি, মঙ্গলবার	ঐ
”	বালসি	শনিবার, বৃহস্পতিবার	ঐ
”	জামকুরি	বুধ, শুক্রবার	ঐ
”	বীরসিঙ্গা	দৈনিক	ঐ
”	শেওরাবনি	সোম, বৃহস্পতিবার	ঐ

পরিশিষ্ট (৪)

কয়েকটি বিশিষ্ট মেলার পরিচয়

থানা	স্থান	পরিচয়	আনুমানিক জনসমাগম
বিষ্ণুপুর	অযোধ্যা	দশহরা মেলা	৫০০০
,,	বিষ্ণুপুর	রথযাত্রা ,,	১৫০০০
জয়পুর	ব্রজশোল	গাজন ,,	৪০০০
,,	ময়নাপুর	হাকন্দ বারুণি মেলা	৩০০০
,,	বেতিয়া	গাজন ,,	৪০০০
,,	বৈতাল	,, ,,	৩০০০
,,	কুচিয়া কোল	,, ,,	৪০০০
,,	মোহনপুর	রথযাত্রা ,,	৬০০০
,,	গোকুল নগর	রক্ষাকালী পুজা ,,	৫০০০
,,	গেলিয়া	রথযাত্রা ,,	৮০০০
কোতুলপুর	সাপুরা	পৌষ সংক্রান্তি ,,	১০০০০
সোনামুখী	সোনামুখী	মনোহর দাসের মেলা	
,,	পঞ্চাল	গাজন মেলা	৮০০০
খাতরা	দেউলি	২৪ প্রহর ,,	৫০০০
,,	খাতরা	ইন্দ পরব ,,	৩০০০
রায়পুর	মঠগোদা	ধর্ম ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসব মেলা	২০,০০০
বাঁকুড়া	একতেশ্বর	গাজন মেলা	১০,০০০
,,	কেঁওজা কুঁড়া	,, ,,	,,
,,	জামবেদিয়া	,, ,,	৫০০০
,,	মান কানালি	,, ,,	,,
,,	সুমুক পাহাড়ি	,, ,,	,,
,,	বালসি	,, ,,	,,
,,	কালপাথার	শ্রীপঞ্চমী ,,	,,
বরজোরা	জগন্নাথপুর	গাজন ,,	,,

থানা	স্থান	পরিচয়	আনুমানিক জনসমাগম
বরজোড়া	বেলিয়াতোর	গাজন মেলা	৫০০০
গুঁদা	গুঁদা	,, ,,	,,
,,	বহুলাড়া	,, ,,	,,
,,	তপোবন	দুর্গা ও লক্ষ্মী পূজার মেলা	,,
,,	তেলিবেড়িয়া	গাজন মেলা	৪০০০
,,	ভুলনপুর	,, ,,	৫০০০
রাণী বাঁধ	বুধখিলা	তুষু উৎসব মেলা	,,

পরিশিষ্ট (৩)

বাঁকুড়া—ভ্রমণ বিলাসীর দৃষ্টিতে।

পুর্বে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি পরিবেশ এই অঞ্চলের যে রূপ দিয়াছে তাহা যে কোন পর্যটককে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। কিন্তু মাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই বাঁকুড়ার একমাত্র আকর্ষণ নহে। যে সকল ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জিলায় ছড়াইয়া আছে ইহারাও কম আকর্ষণীয় নহে। ইহাদের পরিচয় পুর্বে দেওয়া হইয়াছে। এইসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিদর্শন মাত্র বাঁকুড়ার নহে, সারা পশ্চিম বাংলার গৌরব।

দর্শনার্থীর পক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতেই বাঁকুড়াকে পরিদর্শনের সুবিধা। কোন্ কোন্ কেন্দ্র হইতে বিশিষ্ট স্থানগুলির পরিদর্শন সমীচীন মনে হয় তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১। প্রথম কেন্দ্র বাঁকুড়া শহর

(১) বাঁকুড়া শহর

বাঁকুড়া শহরে প্রাচীন মন্দির বেশি নাই। যেগুলি আছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামপুরের রঘুনাথ মন্দির, নির্মাণ কাল ১৫৬১ শকাব্দ বা ইং ১৬৪০ সাল। বাঁকুড়ার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইল খৃষ্টান মিশনরীগণের কর্ম-তৎপরতা যাহার অভিব্যক্তিস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, দুইটি উচ্চ মাধ্যমিক ও আরও কয়েকটি বিদ্যালয় আর কয়েকটি কুষ্ঠ সেবাশ্রম। মিশনরীদের কর্মতৎপরতা ইং ১৮৪১ সাল হইতেই লক্ষ্য করা যায় এবং বর্তমানে যাহার নাম জিলা স্কুল তাহার প্রতিষ্ঠা হয় ইং ১৮৪৬ সালে। বাঁকুড়ার নিকটেই সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত সুবৃহৎ গৌরীপুর কুষ্ঠাশ্রম এক সুপরিসর ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত।

(২) একতেশ্বর

বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পুর্বে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে একতেশ্বর শিব মন্দির। মন্দিরটি অতি প্রাচীন। প্রতিবৎসর চড়ক পুজার সময় একতেশ্বর অগণিত নরনারীর সমাবেশে মুখরিত হইয়া উঠে। চড়কের উৎসব আরম্ভ হয় চৈত্র মাসের মাঝামাঝি। তাহার পর হইতে গাজন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত মন্দিরের চতুপার্শ্বের বিস্তৃত অঞ্চল থাকে

নানা শ্রেণীর দোকানপাটে আচ্ছন্ন, আর সহস্র সহস্র কণ্ঠের কল কোলাহলে উচ্ছ্বসিত। পূর্বে গাজনে দর্শনীয় ছিল শলাকাবিদ্ধ ভক্ত সন্ন্যাসীদের চড়কে পরিভ্রমণ। এখন এই প্রথা লোপ পাইয়াছে।

(৩) বহুলাড়া

বাঁকুড়া শহর হইতে ওঁদা বেশি দূর নহে। ওঁদাগ্রাম রেলস্টেশনের প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বে দ্বারকেশ্বরের নিকটেই বহুলাড়ার শিব মন্দির। দেবতার নাম সিদ্ধেশ্বর শিব। মন্দিরটি স্থাপত্য ভাস্কর্যে অতুলনীয়। নির্মাণকাল খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। বহু পণ্ডিতের বিশ্বাস যে আদিতে বহুলাড়া ছিল জৈন ধর্মের একটি প্রাণ কেন্দ্র।

(৪) সোনাতোপল

বাঁকুড়া শহরের কিছু উত্তর-পূর্বে ভেতুয়াশোল রেল স্টেশন। ইহার নিকটেই বালিয়ারা গ্রামের উপকণ্ঠে সোনাতোপলের মন্দির প্রাচীন দেউল স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। মন্দিরটির নির্মাণকাল খৃষ্টীয় দশম—একাদশ শতক বলিয়া অনুমান করা হয়। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে আদিতে ইহাও ছিল জৈন মন্দির।

(৫) ছাতনা

বাঁকুড়া শহর হইতে কিছুদূর পশ্চিমে ছাতনা। এখানে আছে বাসলি দেবীর প্রাচীন মন্দির ও আরও কয়েকটি মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ। কয়েকটি মন্দির নির্মিত হয় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে সামন্তভূমের রাজা হামীর উত্তর রায়ের সময়। পঞ্চকোটের রাজাও একটি মন্দির নির্মাণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(৬) অমর কানন

বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনে জিলায় যে কর্মতৎপরতা ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় তাহার প্রাণকেন্দ্র ছিল অমর কানন আশ্রম। বাঁকুড়া—রাণীগঞ্জ শড়ক বরাবর আট মাইল অমর কানন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে দেশে যে সকল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অমর কাননের দেশবন্ধু বিদ্যালয় তাহাদের অন্যতম। অমর কানন আশ্রমের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও সেবক ছিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার নামানুসারেই আশ্রমের নামকরণ। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে অমর কানন এক বিশিষ্ট ভূমিকা

গ্রহণ করে। বর্তমানেও সমাজ উন্নয়ন, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি উন্নতিমূলক কার্যে অমর কানন এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

(৭) শালতোড়া

শালতোড়ার অবস্থান জিলার উত্তর-পশ্চিমাংশে। বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় ২৮ মাইল দূরে। বাঁকুড়া শহরের সহিত শালতোড়া আধুনিক পর্যায়ের সুরক্ষিত শড়কের দ্বারা সংযুক্ত। চণ্ডিদাস প্রসঙ্গে শালতোড়ার পরিচয়—

"শালতোড়া গ্রাম অতি পিঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা
ডাকিনী-বাসলি নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা।"

তখন শালতোড়া ছিল তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্র। বর্তমান শালতোড়া গণ্ডগ্রাম হইলেও স্বাস্থ্যকর স্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। উত্তর-পশ্চিমে তরঙ্গায়িত শৈলমালার সমারোহ, কবির ভাষায়

"অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে"।

শৈলশ্রেণীর মধ্যে বিশিষ্ট হইতেছে বিহারীনাথ। বিহারীনাথের সানুদেশ এক সময় জৈন ভাবধারার কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ শুশুনিয়া পাহাড। দূর দিগন্তে দেখা যায় পঞ্চকোট শৈলচুড়া একখণ্ড নীলাভ মেঘের ন্যায়। এই মনোরম প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত শালতোড়া হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ভাব জাগ্রত করে।

(৮) শুশুনিয়া পাহাড়

শুশুনিয়া পাহাড় ও ইহার সানুদেশ বহুকাল যাবৎ প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। এখানেই আবিষ্কৃত হয় রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপি, পশ্চিমবঙ্গে এতাবৎ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রথম শিলালিপি। আবার এখানেই পাওয়া গিয়াছে নরকঙ্কাল যাহার সময় পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়ে।

২। দ্বিতীয় কেন্দ্র রাণীবাঁধ

(১) রাণীবাঁধ

বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে কাঁসাই নদীর অপর দিকে রাণীবাঁধ। সুরক্ষিত পাকা সড়ক রাণী-বাঁধকে যুক্ত করিয়াছে বাঁকুড়ার সহিত।

রাণীবাঁধ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পাহাড় ও বনরাজি পরিবৃত রাণীবাঁধ, মাঝে মাঝে কৃষিপল্লী। দক্ষিণে এই পাহাড় ও বনরাজি ভেদ করিয়া শড়ক চলিয়াছে অত্যন্ত কুটীল গতিতে। পথের শোভাই বা কি মনোহর! দুই পার্শ্বে নানাজাতীয় বৃক্ষগুল্ম, ইহাদের মধ্যে মহুয়া গাছের সংখ্যাই বেশী। শড়ক ক্রমেই উপরে উঠিয়াছে; বনানীর আবরণ ভেদ করিয়া কখনও প্রকাশ পায় দূরের নীল শৈলমালা, কখনও বা নিম্নের পল্লী অঞ্চলের ছবি। অপুর্ব এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে ঝিলিমিলির দিকে। পুর্বাংশ বেশির ভাগই অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে মঠগোদার দিকে। কোথায়ও বা অরণ্য নিবিড়, আবার কোথায়ও বা ক্ষীণ। মাঝে মাঝে স্বল্পস্রোতা জলধারা আর লোকবসতি।

(২) ঝিলিমিলি

রাণীবাঁধ হইতে যে পথ ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া পাহাড় শ্রেণী ও বনানী পার্শ্বে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তাহার শেষ প্রান্তে ঝিলিমিলি। উৎকল ব্রাহ্মণগণের এক কেন্দ্র এই ঝিলিমিলি। বহু পুরুষ পুর্বে তাঁহারা পুরীর মন্দিরের মূর্তির অনুরূপ যে দেব বিগ্রহ লইয়া এখানে আসেন, সেই মূর্তি এখনও পুজিত হয়। অপুর্ব এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঝিলিমিলি। আবার বহু দিক দিয়া স্থানটির অগ্রসর লক্ষিত হয়। এখানে আছে আদর্শ-পল্লী গঠনের সহায়ক কল্যাণ নিকেতন। আর আছে বুনিয়াদি বিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষণের জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় আর ভারত সরকার প্রযোজিত বিজ্ঞান মন্দির। একটি সমাজ-উন্নয়নের কেন্দ্রও এখানে আছে।

(৩) কংসাবতী জলাধার

রাণীবাঁধ হইতে প্রায় ৯ মাইল উত্তরে বাঁকুড়া রাণীবাঁধ শড়কের উপর খাতরা। খাতরা হইতে একটি শড়ক বাহির হইয়া গিয়াছে দক্ষিণ-পশ্চিম গতিতে গোরাবাড়ী—মুকুট মণিপুর। অদূরে কুমারী ও কংসাবতী নদীতে বাঁধ দিয়া যে জলাধার সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এখানে। জলাধারটির অবস্থান মনোরম প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে। দিগন্তে নীল পাহাড়ের শ্রেণী। তাহাদের শোভা বিশাল জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যে কোন দর্শকের নিকট উপভোগ্য না হইয়া যায় না। এই জলাধার কংসাবতী পরিকল্পনার উৎস। ইহারই জল খাল মাধ্যমে বাহিত হইয়া বাঁকুড়া ও মেদিনিপুর জিলার এক বিশাল অংশকে শস্যশ্যামলা করিয়াছে।

(৪) অম্বিকানগর

রাণীবাঁধ হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাঁসাই নদীর তীরে অম্বিকানগর। অনেকের মতে, বহুপূর্বে অদূরস্থ পরেশনাথের ন্যায় অম্বিকানগর জৈন ধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে অম্বিকানগর ও সুপুর লইয়া গঠিত ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য—ধলভূম। জগন্নাথ দেব নামে একজন রাজপুত এই রাজ্য জয় করেন। কালক্রমে ধলভূম রাজ্য সুপুর ও অম্বিকানগর এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অম্বিকানগরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে আছে পুরাতন রাজপ্রাসাদ ও জীর্ণ মন্দির। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের তৎপরতার সহিত অম্বিকানগর রাজপরিবারের যোগাযোগ ছিল।

(৫) পরেশনাথ

অম্বিকানগরের অদূরে পরেশনাথ কুমারী নদীর অপর তীরে। স্থানটি যে এক সময় জৈন ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কেন্দ্র ছিল তাহার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। পূর্বে বহু জৈন মূর্তি, ইহার মধ্যে অধিকাংশই তীর্থঙ্করের মূর্তি, পরেশনাথ ও ইহার চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ছিল। বহু মূর্তিই অপহৃত বা অপসৃত হইয়াছে।

৩। তৃতীয় কেন্দ্র বিষ্ণুপুর

(১) বিষ্ণুপুর

সমগ্র বিষ্ণুপুর মহকুমাকে "প্রত্নতত্ত্ববিদের স্বর্গভূমি" বলিয়া অভিহিত করিলেও বিষ্ণুপুর শহর সম্বন্ধেই এই কথা যথাযথভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে পুরাকীর্তির বিশাল সমারোহ ও একত্র সমাবেশ অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষ্ণুপুর গড় ও বিশালকায় বাঁধ সমষ্টি। ইহাদের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। গড়ের ভিতরে ও বাহিরে যে সকল পুরাতন মন্দির ও অন্যান্য কীর্তি এখনও বর্তমান আছে, তাহাদের পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি যে-কোন পর্যটকের নিকট আকর্ষণীয় না হইয়া যায় না।

(২) ধরাপাট

বিষ্ণুপুরের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে বিষ্ণুপুর-পানাগড় শড়কের সংলগ্ন ধরাপাট। স্থানটি এক সময় জৈনধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল বলিয়া বিশ্বাস। এখানে আছে দুইটি মন্দির, একটি প্রাচীন ও ভগ্নাবশেষ অবস্থায় পরিণত, অন্যটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের। প্রথমটির নির্মাণকাল পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতক। দ্বিতীয়টি বিষ্ণু মন্দির হইলেও পূর্বতন কালের দুইটি

জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ইহার গাত্রে নিবদ্ধ আছে। ইহার নির্মাণকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক। মন্দিরটি গ্যাংটা ঠাকুরের মন্দির বলিয়া পরিচিত। ইহার কারণ মনে হয় উল্লিখিত দুইটি জৈন মূর্তি।

(৩) ডিহর

বিষ্ণুপুর হইতে চার মাইল উত্তর-পুর্বে ডিহর, দ্বারকেশ্বর নদের তীরে। এখানে আছে দুইটি শৈব মন্দির, ষাড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর বা শম্ভেশ্বর। দুইটিই ভগ্ন অবস্থায়। নির্মাণকাল কাহারও মতে খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতক, কাহারও মতে ত্রয়োদশ শতক।

(৪) সলদা

বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর শড়কের উপর জয়পুর। তাহার অদূরেই সলদা। এখানে পঞ্চরত্ন ধরনের যে মন্দিরটি আছে, অনেকের মতে ইহাই জিলার প্রাচীনতম "বাংলা মন্দির"। নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই।

(৫) ময়নাপুর

জয়পুর হইতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পুর্বে ময়নাপুর। এই ময়নাপুরই যে ধর্ম-মঙ্গলের ময়নানগর বা ময়নাগড় এ সম্বন্ধে অনেকেই একমত। ধর্মঠাকুরের পুজা প্রবর্তনে ময়না এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। ধর্ম পুজার প্রবর্তক ছিলেন রামাই পণ্ডিত। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ময়নাপুরে বসবাস করেন। ময়নাপুরের "হাকন্দ পুখর" অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। এখানে লাউসেন নিজ দেহ খণ্ড করিয়া ধর্মঠাকুরকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(৬) লোকপুর

জয়পুর থানার লোকপুরের অবস্থান বিষ্ণুপুর-কোতলপুর শড়ক হইতে বেশী দূর নহে। এখানে আছে ইসলাম ধর্ম প্রচারক ইসমাইল গাজীর দরগা। এই ইসমাইল গাজীর সহিতই গড় মান্দারণের রাজার যুদ্ধ হয়। গড় মান্দারণ হুগলী ও বাঁকুড়া জিলার সীমারেখায়, এখানে ইসমাইল গাজীর সমাধি আছে। লোকপুরের দরগা হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান।

(৭) জয়রামবাটী

বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর শড়ক হুগলী জিলার আরামবাগ পর্যন্ত প্রসারিত। কোতুলপুর হইতে আর একটি শড়ক বাহির হইয়া গিয়াছে কামারপুকুরের

দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর হুগলী জিলায়। এই শড়কের উপরই অপরূপ পল্লীশ্রীমণ্ডিত জয়রামবাটী, শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর সাধিকা ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জননী শ্রীমায়ের পদস্পর্শে পবিত্র। এখানে আছে শ্রীমায়ের মন্দির, অধুনা নির্মিত অতিথিশালা ও একটি বিশাল সরোবর—"মায়ের দীঘি"—জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য খনিত। একটি প্রাচীন মন্দিরও (সিংহবাহিনীর মাড়ো) আছে—শ্রীশ্রীসারদা দেবীর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত।